পুরাণ পুরুষ

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী

—তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

প্রস্তাবনা

মহামহোপাধ্যায় ৺গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবং আরো অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে আমি আমার পিতামহ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখি। সকলের আগ্রহ এই কারণে যে আমার কাছে পিতামহের স্বহস্ত-লিখিত ২৬ খানি ডায়েরি আছে এবং আমি বরাবর আমার পিতার নিকট ছিলাম ও স্নেহের পাত্র ছিলাম।

পৌরাণিক যুগে যে সব মুনি-ঋষি ছিলেন; তাঁরা অধিকাংশ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁরা গৃহে থেকে সাধনা করে যে সব প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করেছিলেন; ইদানীং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তা দেখা যায় না। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় গৃহস্থ আশ্রমে সমস্ত জীবন কাটিয়ে, সরকারী চাকরী করে, পেনশন্ প্রাপ্ত হয়ে এবং শেষে প্রাইভেট চাকরী করেও তারই মাঝে সাধন করে যে সব প্রত্যক্ষ অনুভূতি, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান করেছেন; সেরূপ এযুগে আর কেহ করেছেন কিনা সন্দেহ। যোগমার্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন সাধক এযুগে মহাত্মা কবীরদাসের পর একমাত্র লাহিড়ী মহাশয়ই হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনেকের ধারণা ছিল, বিশেষ করে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যদের মধ্যে যে কবীরদাসই ইহ জন্মে উত্তম ব্রাহ্মণকুলে শ্যামাচরণ নামে জন্মগ্রহণ করেছেন। অবশ্য ইহার কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নেই। তবে কবীরদাসের বাণী এবং লাহিড়ী মহাশয়ের অনুভূতির লেখা যাহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত ডায়েরিতে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় ইহাই ঠিক ধারণা। কবীরদাস শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত গৃহী ছিলেন, লাহিড়ী মহাশয়ও তাই ছিলেন। কবীরদাস বলেছেন—"রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি চাদরিয়া বিনি রে।" তিনি জোলার ঘরে প্রতিপালিত হয়ে তাঁতের কাজ করতেন, কিন্তু সদাই সাধনার পরাবস্থায় থাকতেন। লাহিড়ী মহাশয়েরও এই অবস্থা ছিল। তিনি সদা ক্রিয়ার পরাবস্থায় থেকে সব কাজ করতেন। এ বড় আশ্চর্য্য অবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই শ্রীভগবান্ বলেছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জ্জুন।" "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদি। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন, তাঁর চরণ আশ্রয় করেছেন; এমন বহু ব্যক্তির নিকট তাঁর এই অবস্থার কথা শুনেছি। যদিও আমি তাঁর সাক্ষাৎ পৌত্র এবং এই পরম পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু তাঁকে দর্শন করবার

সৌভাগ্যলাভ করি নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের নয় বছর পর আমার জন্ম হয়। জানিনা অতীত জন্মেও তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা। তবে মনে হয় একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল। যাঁকে দেখি নি, কোন দিন সঙ্গলাভ করি নি, যাঁর সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় নি, তাঁর প্রতি এত অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি কেন তা অন্তর্যামীই জানেন। তিনিই আমার জীবনের জীবন, তিনিই আমার আরাধ্য দেব, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব।

সকলে বারবার তাগাদা দিচ্ছেন যে আমাকে লাহিড়ী মহাশয়ের পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত লিখতেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সাহিত্যিক নই; কি ভাবে লিখতে হয় তাও জানি না। ইতিপূর্ব্বে অনেকে তাঁর জীবনী লিখেছেন, অনেক মাসিক পত্রিকাতেও মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। কিন্তু সে সব প্রায় কিংবদন্তীর মত। তবে আমার ভরসা তাঁরই শ্রীচরণ।

বিশ্ব করিছে পূজা, তবু মোর মনে হয়;
আমি না করিলে পূজা, পূজা তব নাহি হয়।
আমার ঈশ্বর তুমি, প্রভু তুমি, দাস আমি;
আমি না করিলে পূজা, পূজা তব রহে বাকি।

তাঁর মূর্তির সামনে যদি প্রতিদিন গীতা পাঠ না করি; মনে হয় যেন তিনি রাগ করেছেন। ঈশ্বর এমনই সম্বন্ধটি করে দিয়েছেন যে তিনি যেমন আমার আদরের, আমিও তাঁর তেমনি আদরের নাতি। তাই তাঁর বিষয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে অনধিকার হবে না এবং দুটো কথা না বললেও চলছে না। আমার আশা নিশ্চয়ই তিনি তাঁর আদরের নাতিকে ক্ষমা করবেন।

আমি দেখলাম যে আমার দ্বারা পিতামহের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা সম্ভব হবে না। কারণ প্রথমতঃ আমার লেখার অভ্যাস নেই, তারপর মোটেই সময় পাই না। কিছু সময় আধ্যাত্মিক সাধনায় যায়, বৈকালে তিন ঘণ্টা পাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতিতে যায়। প্রতিদিন কিছু চিঠির উত্তর দিতে হয়। লোকজনের যাতায়াত, দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা, আলোচনা প্রভৃতি করতে হয়। পরমহংস যোগানন্দের Autobiography of a yogi (যোগিকথামৃত) এবং শ্রীশঙ্কর নাথ রায়ের 'ভারতের সাধকের' মধ্যে পিতামহের জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের পর হতে সারা বিশ্বের মানুষ আসেন এবং নানা প্রকার আলোচনা করেন।

১৯৭৯ খৃঃ নভেম্বর মাসে পিতামহের জীবনী লেখার বিষয়ে তৎপর হয়ে কলিকাতায় যাই এবং বরাহনগরে শান্তিনীড়ে শ্রীঅশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচতলার বাসায় ১৮ দিন অজ্ঞাতবাস করি। কাশী থেকে পিতামহের স্বহস্ত লিখিত সমস্ত ডায়েরিগুলি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক যা যা ছিল নিয়ে যাই। শ্রীমান্ অশোককে পিতামহের জীবনী লিখতে বলি। এই বৃদ্ধ বয়সে দিবারাত্র পরিশ্রম করে শ্রীমান্ অশোককে সমস্ত তথ্য যোগাড় দিই এবং মৌখিক অনেক বিষয় যা যা আমার জানা ছিল তাও সংক্ষিপ্তাকারে লিখাইয়া দিই। পিতামহী, পিতা, মাতা, দুই পিসিমা এবং পিতামহের বহু পুরাতন শিষ্যদের মুখে যা যা শুনেছি এবং সেগুলি যতদূর সম্ভব মনে আছে তাও সংক্ষেপে লিখাইয়া দিই। শ্রীমান্ অশোক সেসব গুছিয়ে জীবনীর আকারে বহু পরিশ্রম করে লিখেছে। তারপর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী গ্রন্থখানি যথাসাধ্য সংশোধন করে দিয়েছে। উভয়েই আমার স্নেহভাজন, কাজেই অতি নিষ্ঠার সহিত সব কাজ করেছে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

পিতামহ তাঁর গুরুদেবের নিকট হতে যে অমূল্য যোগসাধন পেয়ে এবং তাঁরই আদেশানুসারে জগতকে যা দিয়েছেন; সে সব প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়, অনুমানের বিষয় নয়। এখানে পাণ্ডিত্যের কোন অবকাশ নেই। যদি কেউ মূক ও বধিরও হয় সেও আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বর-তত্ত্বের সবকিছু দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারে, এতে কোন সন্দেহ নেই। হাজার হাজার বছর আগে আর্য্য ঋষিরা যে সাধনপথ দেখিয়েছিলেন কালক্রমে তা লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। কিছু কিছু সাধনের প্রণালী বীজ মন্ত্ররূপে রক্ষা করা আছে, কিন্তু কালক্রমে সাধনের সেই ক্রিয়াগুলি লুপ্ত হয়ে গেল। কেবল বীজ মন্ত্রগুলি রয়ে গেল। সাধনের ক্রিয়াগুলি লুপ্ত হওয়ায় বীজ মন্ত্রগুলি মৃতবৎ নিষ্ক্রিয় হল, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকল না। সেই ক্রিয়াহীন বীজ মন্ত্রগুলি বর্তমানে গুরুগণ শিষ্যের কানে দেন, তাহলেই দীক্ষা হয়ে গেল। ক্রিয়া বা প্রক্রিয়াগুলির পরিচয় না থাকায়, না হয় শিষ্যের উপকার, না হয় গুরুর উপকার। এইভাবে মন্ত্রগুলি জানা থাকলেই বংশ-পরম্পরায় গুরুগিরি করা চলে বা মঠের মোহন্ত হওয়া যায়। কারণ সাধারণ সরলপ্রাণ মানুষকে সহজেই বোকা বানান যায়। ধর্ম্মকে নিয়ে এই যে ছিনিমিনি ও ব্যবসাদারী,

আমাদের দেশের এই অবস্থা দেখে মহাত্মা কবীর বড় দুঃখের সঙ্গে বলেছেন—

কান ফুকনে কা গুরু আউর হ্যায়,
বেহদ কা গুরু আউর ;
বেহ: কা গুরু যো মিলে,
.. পঁহুচা দেওয়ে ঠৌর।

ঠৌর মানে ধাম। গীতাতে এই ধামের কথাই শ্রীভগবান্ বলেছেন— "যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" অর্থাৎ যেখানে গেলে আর পুনরাবর্তন হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। "মম", "ধাম" এইসব শব্দগুলির নিগূঢ় অর্থ যা লাহিড়ী মহাশয় বুঝিয়েছেন ; তা প্রত্যক্ষদর্শী সাধক ছাড়া কে বুঝাইতে পারে? মহাভারতের যুদ্ধ আঠার দিনে শেষ হয়েছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই পক্ষের যুদ্ধ অনন্তকাল ধরে চলছে, জন্মজন্মান্তরেও শেষ হবার নয়। তাহলে এর নিষ্পত্তি হবার উপায় কি? সেই উপায়ের জন্য যে সাধনপথ অর্থাৎ যে কর্ম্মযোগ অবলম্বন করলে উহার নিষ্পত্তি হতে পারে তা লাহিড়ী মহাশয় তাঁর গুরুর নিকট থেকে জেনে জগতকে দিয়েছেন। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পক্ষের যুদ্ধ সবার ভেতরে চলছে। যদি প্রবৃত্তিপক্ষ জয়ী হয় তাহলে মহামূল্যবান মনুষ্য জীবন বিফল হল ; আর যদি নিবৃত্তিপক্ষ জয়ী হয় তাহলে মনুষ্য জীবন সফল হল। প্রবৃত্তিপক্ষ মানে অনেক কিছু চাহিদা, আর নিবৃত্তিপক্ষ মানে যেটুকু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিম্নতম প্রয়োজন অর্থাৎ অল্পেই সন্তুষ্টি। তাই দেখা যায় দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও দেবে না, কিন্তু অপরপক্ষে যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাইয়ের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রাম পেলেই খুসী। অর্থাৎ একপক্ষ আসক্তিতে ভরপুর, অপরপক্ষ অনাসক্ত।

সর্ব্ব বিষয়ে এই রকম অনাসক্ত না হতে পারলে সাধনায় জয়ী হওয়া যায় না। 'আমি অনাসক্ত' একথা মুখে বললেই ত আর অনাসক্ত হওয়া যায় না। অনাসক্ত হবে কি করে? তাহলে প্রথমে বুঝতে হবে আসক্তি আসে কোথা থেকে? তার উৎপত্তিস্থল কোথায়? প্রত্যেক জীবদেহে প্রাণ স্থিররূপে বর্তমান। সেই স্থির প্রাণ চঞ্চল হলে হয় মনের উৎপত্তি, যাকে বলা হয় জীবের চঞ্চল মন। এই চঞ্চল মনকেই জীব মন বলে জানে। সেই চঞ্চল মন থেকেই আসক্তির উৎপত্তি। তাহলে আসক্তিশূন্য হতে হলে বর্ত্তমান চঞ্চল মনকে নির্ম্মনা করতে হবে অর্থাৎ মনঃশূন্য করতে হবে। কি উপায়ে মনঃশূন্য করা যায় অর্থাৎ মনের মননত্ব নাশ করা যায়

তার উপায় বা সাধন কৌশল গীতাতে এবং পাতঞ্জল যোগদর্শনে পরিষ্কার-ভাবে লেখা আছে। কিন্তু বর্তমানকালে সে সাধনকৌশল দেখাবার মত লোকের বড় অভাব। এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা বা টীকা অনেক বড় বড় বিদ্বান্ বা পণ্ডিতগণ করেছেন। দার্শনিক ব্যাখ্যা, বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা প্রভৃতি অনেক আছে, কিন্তু সাধনের দ্বারায় প্রত্যক্ষ অনুভবগত বা উপলব্ধিগত ব্যাখ্যা প্রায় কেউ করেননি। যে সমস্ত মহাযোগিগণ বা মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব বা উপলব্ধি করেছেন তাঁরা হয়ত জেনেশুনেই কিছুই আভাস দেন নি, কারণ তাঁরা জানতেন যা সাধন-সাপেক্ষ এবং অনুভবগম্য তা মুখে বলে বা লিখে বোঝালে কে বুঝবে? যেমন নিজে চিনি না খেয়ে অপরের কথা শুনে কি চিনি খাওয়ার স্বাদ বোঝা যায়? যাইহোক কালক্রমে এই বিজ্ঞান-সম্মত সাধন-কৌশল লুপ্ত হবার উপক্রম হল। লাহিড়ী মহাশয়ের গুরুদেব (যাঁকে তিনি 'বাবাজী' বলতেন এবং তাঁর স্বহস্ত লেখা দিনলিপিতে কেবল 'বাবাজী' এই মাত্র লেখা আছে, এর বেশী কোন পরিচয় আমরা পাই না) তাঁকে কৌশলে রাণীক্ষেতে নিয়ে যান এবং দীক্ষাদান করেন। পূর্ব্বজন্ম হতেই তাঁর সহিত গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল তা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। দীক্ষা পাওয়ার পর লাহিড়ী মহাশয় যখন কাশীতে ছিলেন তখন তাঁর গুরুদেবের সহিত আধ্যাত্মিকভাবে কথাবার্তা হত; তা তাঁর ডায়েরি থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। লাহিড়ী মহাশয় তাঁর গুরু বাবাজীর নিকট থেকে সেই বিজ্ঞানসম্মত সাধন-কৌশল যা প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল; তা তিনি পুনরায় পেয়ে জগতকে দিলেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় বেশীরভাগ লোক হঠযোগ অভ্যাস করে। আসনাদি করেই মনে করে যোগাভ্যাস করছে। এগুলি করলে শারীরিক উপকার নিশ্চয় হয়, কিন্তু এই উপায়ে শরীরস্থ আত্মার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং মনও স্থির হয় না। আবার মন স্থির না হলে সাধনরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। এরজন্য রাজযোগের প্রয়োজন। কেবল মন স্থির হলেও হবে না, অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা অনেকটা কমে গেলেও হবে না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার না হচ্ছে, ব্রাহ্মীস্থিতিলাভ না হচ্ছে, ভ্রূমধ্যস্থলে কূটস্থচৈতন্যের দর্শনলাভ না হচ্ছে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য জীবন সফল হল না।

ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্।
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

এরজন্য চাই রাজযোগ, হঠযোগ এবং লয়যোগের একত্র সমাবেশ। রাজযোগের দ্বারা মন স্থির হবে, লয়যোগের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হবে এবং এইসব সাধন করার জন্য শরীরে যে ক্লান্তি উপস্থিত হয় তা দূর করবার জন্য হঠযোগের আবশ্যক। একাসনে বহুক্ষণ বসে থাকায় শরীরে যে আড়ষ্টতা আসে হঠযোগের দ্বারা তা দূর হয়।

ঈশ্বরকে আমরা বৈকুণ্ঠে খুঁজি, ক্ষীরোদসাগরে খুঁজি, তীর্থে, মন্দিরে, মসজিদে খুঁজি, কিন্তু নিজের শরীরের মধ্যে ভ্রূমধ্যস্থলে যে তিনি সদা বিরাজমান তার সন্ধান জানি না। সন্ধান করবার আগ্রহও জাগে না। এই দেহপুরে ভ্রূমধ্যস্থলে সেই প্রত্যক্ষ দেবাত্মা বিরাজমান, তাঁকে দর্শন করবার কথা সকল ঋষিরা একবাক্যে বলেছেন এবং তার সাধন পথ বা কৌশলও দেখিয়েছেন। কিন্তু কালক্রমে তা লুপ্ত হল, তার প্রধান কারণ উহা সাধন সাপেক্ষ। এই সাধন করতে কিছু সময় ও ধৈর্য্য লাগে, তা কেউ করতে চায় না। তার প্রধান কারণ বর্তমানে এমনই একটা যুগ চলেছে যে বহু গুরু এমনভাবে প্রচার করেন যে মাথায় হাত দিলেই সমাধি হয়, মন স্থির হয় এবং অনেক কিছুই হয়। কাজেই কে আর সময় নষ্ট করে? কিন্তু একটু চিন্তা করলে সকলেই বুঝতে পারে যে যাঁকে পেতে গেলে পৃথিবীর সকল সত্ত্বা ত্যাগের প্রয়োজন তাঁকে অত সহজে পাওয়া যায় কি করে? এ কথা সকলকেই মানতে হবে যে এই দেহমন্দিরে এমন একটি দেবতা আছেন যিনি চিৎস্বরূপে জীবাত্মা নামে ভ্রূমধ্যস্থলে বিরাজমান। এমন একটি সত্য বস্তুর সন্ধান না করে আমরা কোথায় না দৌড়াই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার কথা আমরা শুনে আসছি, কিন্তু এঁদেরও যিনি পর্দার আড়ালে থেকে নাচান তিনি কোন দিনই বাইরে আসেন না, আসবেনও না। তবু তাঁর খোঁজ করা অর্থাৎ সেই সত্য বস্তুর খোঁজ করা এটাই ত জীবনের আনন্দ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতাকে আমরা ভারতবাসী আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীরা মান্য করে থাকি। কিন্তু পৃথিবীর অন্য ব্যক্তিরা এই সব দেবতাদের নাম পর্য্যন্ত জানে না। অথচ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এবং সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণগুলিকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ এই গুণত্রয় কোথায় নেই? এই গুণগুলির যে যে কাজ তার অনুরূপ সাকার মূর্ত্তির কল্পনা দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা করেছি। কোন প্রকারে মন স্থির হলে এই রূপগুলির দর্শন হয়, ইহা মন স্থিরের একটা অবস্থা বটে, কিছু আভাসও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহা মায়িক। কারণ যদি এই রূপগুলি

সত্য ও নিত্য হত তাহলে যে কোন দেশবাসীর বা ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের মন স্থির হলেই এই রূপগুলি তাদেরও দর্শন হত। কিন্তু তা ত হয় না। তাদের যে সব বিষয়ে বোধ বা ধারণা আছে তারই দর্শন হয়। কিন্তু ভ্রূমধ্যস্থলে মন স্থির হলে যে জীবাত্মা বা কূটস্থ ব্রহ্মের দর্শন হয় তা সকলেরই হবে, পৃথিবীর সকল সাধকেরই হবে। সেখানে ভিন্নতা নেই। পরমাত্মা নাগালের বাইরে, কিন্তু জীবাত্মা বা কূটস্থব্রহ্ম নাগালের মধ্যে। ইনিই 'ঘট ঘট বিরাজে রাম।' এত বড় একটা সত্য বস্তু তার সন্ধান পাই না কেন? কারণ মনের চঞ্চলতা। মন চঞ্চল হয় কেন? প্রাণ চঞ্চল হয় সেজন্য মনও চঞ্চল হয়, প্রাণের চঞ্চল গতির নামই মন। কোন প্রকারে প্রাণকে যদি স্থির করা যায় মনও স্থির হয়। আবার কোন উপায়ে যদি মনকে স্থির করা যায় তাহলে প্রাণও স্থির হয়। মনের চেয়ে প্রাণ কিছু স্থূল। আমরা ইচ্ছা করলে প্রাণকে কিছুক্ষণ অবরোধ করতে পারি, কিন্তু মনকে অবরোধ করা বড়ই কঠিন। তাই প্রাণকে স্থির করবার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রাণায়াম। যত নদী আছে তার মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, যত মন্ত্র আছে তার মধ্যে যেমন গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ, যত বীজমন্ত্র আছে তার মধ্যে যেমন প্রণব শ্রেষ্ঠ, যত তীর্থ আছে তার মধ্যে যেমন কাশী শ্রেষ্ঠ, তেমনি যতপ্রকার সাধন আছে তার মধ্যে প্রণায়াম শ্রেষ্ঠ। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। প্রাণায়াম অনেক প্রকার আছে, তার মধ্যে সুষুম্না অন্তর্গত যে প্রাণায়াম তা শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণই মুখ্য প্রাণ-বায়ুরূপে এই দেহে রমণ করেন। শরীরে পাঁচ স্থানে অবস্থান বশতঃ পাঁচটি নাম হয়েছে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। এই পাঁচটি বায়ু যদি শরীরে সমভাবে অবস্থান করে তাহলে মন স্থির থাকে। যদি কোন কারণে বিকার ঘটে তাহলে চঞ্চল হয়ে যায়। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি যদি সমভাবে থাকে তাহলে শরীরে কোন রোগ থাকে না। যদি কোন কারণ বশতঃ বিকার ঘটে তাহলে সেই কারণ জনিত রোগ ঘটে, যেমন ঠাণ্ডা লাগলে কফ আশ্রয় করে ইত্যাদি। যাতে এই পঞ্চবায়ু স্থির থাকে তারই সাধন লাহিড়ী মহাশয় আমাদের দিয়েছেন। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ু স্থির হয়। নাভিক্রিয়া দ্বারা সমান বায়ু স্থির হয়। মহামুদ্রা দ্বারা উদান এবং ব্যান বায়ু স্থির হয়। এই প্রকারে পঞ্চ বায়ু স্থির হলেই মন স্থির হয় এবং মন স্থির হলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। যোনিমুদ্রার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার বলপূর্ব্বক রুদ্ধ করে, মনকে চারিদিক থেকে গুটিয়ে এনে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করে গুরু নির্দিষ্ট পথে অভ্যাস

করতে করতে সেই অবিজ্ঞেয় আত্মাকে দর্শন করে সাধক কৃত-কৃতার্থ হন। "রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" এই শরীররূপ রথে সেই বামনদেবকে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে দর্শন করে জন্ম সফল করেন। এই পুরুষকে যিনি দর্শন করেন তাঁর আর পুনজন্ম হয় না, চিরতরে খালাস হয়ে যান। পুরুষোত্তম যোগের ইনিই সেই পুরুষ, যাঁর দর্শন পেয়ে সাধক কৃতকৃত্য হন। কবীরদাস বড় সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ—

মরতে মরতে জগ মরা, মরনা না জানা কোয়।
এায়সা মরনা কোই ন মরা, জো ফির না মরনা হোয় ॥
মরনা হ্যায় দুই ভাঁতি কা, জো মরনা জানা কোয়।
রামদুয়ারে জো মরে ফিরনা মরনা হোয় ॥

অর্থাৎ এই জগতে প্রত্যহই লোক মরছে, কিন্তু হায় হায় এমন মরা কেউ মরল না যে পুনরায় আর মরতে হয়। জগতে মৃত্যু দুই প্রকার। একটি হল সাধারণ মৃত্যু যা নিত্যই ঘটছে। আর একটি হল অসাধারণ মৃত্যু যার নাম রামদুয়ার অর্থাৎ রামের দরজায়। সাধারণ লোক ভাবে কোন রাম-মন্দিরের সামনে। এই রামদুয়ার কি তা লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন। এই রামদুয়ারে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যস্থলে, কূটস্থে প্রাণকে ও মনকে স্থাপন করে যিনি সেই পরম পুরুষকে দর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করেন তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এ সব অতি বাস্তব সাধনা, কথার কথা নয়। সারা জীবন ধরে যিনি অভ্যাস রাখতে পারেন তাঁর পক্ষেই সম্ভব। ইহাই ত ক্রিয়াযোগ সাধনের উদ্দেশ্য ও ফল। এই রকম মৃত্যু চোখে দেখেছি সেইজন্য এত দৃঢ়ভাবে বলতে সমর্থ হচ্ছি। কথার কথা নয়, শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। কি অদ্ভুত মৃত্যু। আমার পিতার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখলাম, আরও কত লোক দেখলেন। সমস্ত প্রাণবায়ুকে সম্যকপ্রকারে ভ্রূমধ্যস্থলে আকর্ষণ করে, মনকে সেখানে সংস্থাপন করে দেহত্যাগ করলেন। ঐ সময় ভ্রূমধ্যস্থলটি এত কম্পিত হচ্ছিল যে বর্ণনা করা যায় না। মনে হচ্ছিল যেন একটা গুলি ভেতর থেকে ঠেলে বেরুচ্ছিল। প্রশান্ত মূর্ত্তি, সুস্নিগ্ধ দেহ, সমস্ত শরীরটা যেন টাটকা গোলাপ ফুলের মত রঞ্জিত হয়ে গেল।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। যেন সাক্ষাৎ মহাদেব শুয়ে আছেন। ভ্রূমধ্যস্থল

থরথর করে কাঁপছে। সেই সময় আমার পিতামহের এক শিষ্য বংশীধর ক্ষত্রী আমাকে বললেন—"দেখুন সত্যবাবু, গীতার অষ্টম অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিন, ইহাই রামদুয়ার, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি।" ইহা এক দিনের চেষ্টায় লাভ করা যায় না, এই স্থিতি লাভ করবার জন্য চাই সারাজীবনের যোগসাধন। তাই গীতা বলেছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।" স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম অর্থাৎ এই আত্মধর্ম্মরূপ ক্রিয়াযোগের অনুশীলন করতে করতে যদি মৃত্যু হয় তাও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম অর্থাৎ দেহের ধর্ম্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম ভয়াবহ, কারণ তাতে জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য।

লাহিড়ী মহাশয় অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করবার পথ যেভাবে দেখিয়েছেন ইদানীংকালে আর কেহ তেমনভাবে দেখাননি।

তাঁর গুরুদেব বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু কাল্পনিক কথা সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় নিজেদের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যই এইসব কল্পনার সৃষ্টি। পিতামহের জীবিতকালে কয়েকজন তাঁরই নিকট বাবাজী মহারাজকে দর্শন করবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারমধ্যে পিতামহের শ্যালকপুত্র তারকনাথ সান্যালও একজন। তারকনাথবাবুর মুখেই শুনেছি যে লাহিড়ী মহাশয় বলেছিলেন বাবাজী মহারাজ দেখা দেবেন না, তবে তিনি চেষ্টা করবেন। চেষ্টা করেও ছিলেন, কিন্তু দেখা দেন নি। তারকনাথবাবু খুব নিষ্ঠাবান্ ও উন্নত ক্রিয়াবান্ ছিলেন।

রামপদারথ নামে আর একজন ভক্তিমান্ উন্নত ক্রিয়াবান্ ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি আমার পিতা একাসনে চৌদ্দঘণ্টা ক্রিয়াযোগ সাধন করবার পর তাঁকে বাবাজী মহারাজ দর্শনদান করেন। তখন পিতামহ জীবিত ছিলেন। পিতামহ হঠাৎ বাবাজী মহারাজকে সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন করে অবাক হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি এ সময়ে হঠাৎ কেন?"

বাবাজী মহারাজ উত্তর দিলেন—"তিনকড়ি খুব স্মরণ করছিল।"

এরপর পিতামহ পিতাকে নিষেধ করেছিলেন এভাবে যেন বাবাজীকে কষ্ট না দেওয়া হয়। এইসব কথাগুলি আমি যখন রামপদারথের নিকট শুনি তখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন। আমি তাঁকে একথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—"কে বলেছে?" আমি রামপদারথের নাম বলায় তিনি কোন উত্তর দিলেন না বরং বিরক্ত হলেন। পিতা অত্যন্ত গম্ভীর ও রাশভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং নিজেকে এত লুকিয়ে রাখতেন যে তুলনা হয় না। বর্ত্তমানে আমি চারজন বাবাজীর খবর জানি,

তাছাড়া আরও কতজন বাবাজী আছেন বলতে পারব না। অনেকে বলেন—"এই ত বাবাজীর সঙ্গে দেখা করে এলাম।" আবার তাঁরাই আমার কাছে ক্রিয়াযোগসাধন নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তাঁদের উত্তর দিই—"যখন স্বয়ং বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হল তখন তাঁর কাছ থেকে ক্রিয়াসাধন না নিয়ে আমার কাছে কেন ?" এইভাবে কিছু লোক নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেই কৃষ্ণসদৃশ মহাপুরুষ বাবাজী মহারাজকে ছোট করছে।

যে অমর বিজ্ঞান সম্মত সহজ যোগ-সাধন লাহিড়ী মহাশয় আমাদের দিয়েছেন তার অল্পস্বল্পও কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে করে তাতে তার মহান্ কল্যাণ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইহা ভগবদ্ বাক্যও বটে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক দুঃখ থেকে ত্রাণ পায়। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ইহাই প্রধানতম বিষয় যে তিনি ঐ অপূর্ব্ব সাধন পেয়ে কেবল নিজেই ধন্য হন নি, তাঁর প্রসাদে আরও বহু মানুষ ধন্য হয়েছেন, পরম শান্তি লাভ করেছেন, পরমগতি লাভ করেছেন, নিজের চোখে তা দেখেছি। লাহিড়ী মহাশয় কোন প্রকার কৃপণতা না করে সেই মহান্ যোগসাধন পরবর্ত্তী মানুষকে দিয়ে গেলেন। বিজ্ঞান সম্মত এই 'ক্রিয়াযোগসাধন' যা তিনি জগতকে দান করেছেন তা যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিতং', সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এর তুলনাও নেই। প্রত্যক্ষ অনুভব, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যা যা তিনি করেছেন কোন প্রকার কৃপণতা না করে, তাই তিনি আমাদের দিয়েছেন ; যাকে কবীরদাসের ভাষায় বলা হয়—

লিখালিখিকা বাত নহি,
দেখাদেখি কি বাত।
দুলহা দুলহিন্ মিল গয়ে,
ফিকি পড়ি বরাত ॥

অর্থাৎ লেখালেখির কথা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন বিবাহ করতে যাবার সময় কত বরযাত্রী, বাজনা, আলো সঙ্গে যায়, কিন্তু যখনই বর-কনের মিলন হয় তখন সব নিজ নিজ স্থানে ফিরে যায় অর্থাৎ সাধক যখন প্রকৃতি ও পুরুষ বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহিত মিলিত হতে সমর্থ হন তখনই ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌছান। এই অবস্থা নিজ বোধগম্য। গীতার বহু ব্যাখ্যা হয়েছে। দেখা যায় সবই বিদ্যাগত, বুদ্ধিগত বা দার্শনিক তত্ত্বগত, কিন্তু অনুভবগত ব্যাখ্যা একমাত্র লাহিড়ী মহাশয়ই

করেছেন বা তাঁরই আশ্রিত সাধকরা করেছেন। মূলে তিনিই। গীতার 'শ্রীভগবানুবাচ' ইহার অর্থ তিনি করেছেন 'কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে।' কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মহাভারতের ১৮ দিনের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রথের উপর সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু এই দেহরথের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যুদ্ধ ১৮ জন্মেও শেষ হবার নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে কৃষ্ণ তিনি ত এখনও প্রতি দেহ-রথে বর্ত্তমান আছেন এবং চিরকাল থাকবেন, কারণ তিনি অবিনাশী। তিনি আছেন বলেই আমরা সবকিছু অনুভব করি, তিনিই এই দেহরথে বসে উপদেশ করছেন। তিনিই আবার বলে গেলেন— "হে অর্জ্জুন, আমিও থাকব না, তুমিও থাকবে না।" তবে থাকবে কি? "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে জগতবাসী, সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাঁর প্রসাদেই পরমশান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হবে। কি করে সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রয়েছেন তাঁর শরণাগত হওয়া যায়, কি প্রকারে মনকে তৈরী করা যায়; তারই বিজ্ঞান সম্মত সাধন লাহিড়ী মহাশয় আমাদের দেখিয়েছেন। ইহাই লাহিড়ী মহাশয়ের জগতকে দান। তিনি সারা জীবন গৃহস্থ আশ্রমে বাস করে, আদর্শ গৃহী হয়ে সাধনার যে উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন এমন আদর্শ হাজার হাজার বছরের মধ্যে দেখা যায় না। কত দণ্ডী, কত সন্ন্যাসী, কত ত্যাগী, কত গৃহী যে তাঁকে আশ্রয় করে ধন্য হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন তাঁদের অনেকের মুখেই শুনেছি যে কোন অপরিচিত ব্যক্তিরও তাঁকে দর্শনমাত্রে মাথা নত হয়ে পড়ত। একটি মাত্র শ্লোকে তাঁর জীবনীর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, ইহাই তাঁর স্বরূপ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

এটাই তাঁর জীবন্ত ও দীপ্যমান জীবন। তাঁর সার উপদেশ— "ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক।" বাহ্যবেশ পরিবর্ত্তন, কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বর, গোষ্ঠী বা দল গঠন, এসব তিনি পছন্দ করতেন না, বরং বলতেন পচাপুকুরেই দল হয়।

দেখা যায় ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টির সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ প্রকার প্রাণীও

সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সকল জীবকেই তিনি সাঁতার শিখিয়ে পাঠালেন। যে কোন জীব-জন্তু জলে পড়ে গেলে দিব্বি সাঁতার কেটে উঠে আসে। তাদের সকলের প্রতি ঈশ্বর সদয় হলেন, কিন্তু তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৃষ্টি যে মানুষ তার প্রতি তিনি নির্দ্দয় হলেন, তাকে তিনি সাঁতার শেখালেন না। কিন্তু কেন ? এর একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। সেটা হল তিনি মানুষকে বললেন তোমাকে সাঁতার শিখে তবে পার হতে হবে। কারণ তোমাকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছি। যেমন মা কত কষ্ট করে রান্না করলেন, সন্তানকে খাবার বেড়ে দিলেন, সাজিয়ে দিলেন। সন্তানের যদি নিজের হাতে খাবার তুলে খাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে মা সন্তানের মুখে তুলেও দিলেন, কিন্তু সন্তানকে নিজে গলাধঃকরণ করতে হবে। সে কর্ম্মটি অপরে করে দিতে পারবে না, ওটা নিজেকেই করতে হবে। যেমন একজন ভাত খেলে অপরের পেট ভরে না, তেমনি প্রাণকর্ম্মরূপ ঈশ্বর সাধন নিজেকেই করতে হবে, অপরে করলে হবে না।

কেবলমাত্র ভাষা জ্ঞান বা লেখার অভ্যাস থাকলেই এই জাতীয় গ্রন্থ লেখা যায় না। এরজন্য চাই সাধনলব্ধ অনুভূতি। যদিও শ্রীমান্ অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখক নয়, তথাপি তাকে এই গ্রন্থ লিখতে বলেছি ; তার কারণ সে উন্নত ক্রিয়াবান্ হওয়ায় সমগ্র বিষয়গুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। অন্যতম ক্রিয়াবান্ ডঃ শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী গ্রন্থখানি সংশোধন করে দিয়েছে। অন্তে সমগ্র গ্রন্থখানি আমি নিজে দেখে খুশী হয়েছি। বর্দ্ধিষ্ণু ক্রিয়াবান্ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর কুমার দত্ত স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে এবং শ্রীঅশোক কুমার সেন নানাভাবে সক্রিয় সাহায্য করেছে ; আমার এই সকল স্নেহভাজন ক্রিয়াবানদের অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাই। এই সাতাত্তর বছর বয়সে আমার দ্বারা এই মহৎ কাজ করা সম্ভব হোত না ; তাঁর দয়াতেই সম্ভব হল।

—শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী।

‘সত্যলোক’
ডি ২২/৩, চৌষট্টিঘাট, বারাণসী।
ইউ, পি, ২২১০০১

ভূমিকা

রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতা। কত শত রত্নসার মহাযোগিপুরুষ এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সত্যানুসন্ধানের পথ দেখাইয়া ধন্য করিয়াছেন। সেই সকল মহাত্মাদের জীবন কথা আজও কান পাতিলে শুনা যায়। তাঁহাদের মহামূল্যবান্ জীবন চরিত মাতৃভূমির সাহিত্য ও জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। মহাত্মাগণ অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, আগামী দিনেও থাকিবেন। যখন সমাজ জীবন যেমন ভাবে চলে, মহাত্মাগণও সেইভাবে মানুষকে আলোকের পথ দেখান। তেমনি ভাবে যুগোপযোগী পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন ভারতমাতার আর এক কৃতী সন্তান যোগিরাজ মহাত্মা শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। বহু মহাপুরুষের জীবনগাথা রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই মহাত্মার জীবনী রচনার প্রয়োজন আছে কি? এই মহাপুরুষ সাধারণ মানবের মত অনাড়ম্বর গৃহী জীবন যাপন করিয়া, অর্থাৎ পুর্ণ গৃহী বলিতে যাহা কিছু বোঝায় তেমন জীবন যাপন করিয়া, গৃহীর সকল কর্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন পূর্ব্বক অধ্যাত্ম জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া এমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মানব সমাজের কাছে রাখিয়াছেন যেজন্য মানব সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই এই মহাত্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনা করেন নাই। তাই এই মহান্ গৃহিযোগীর অন্যতম পৌত্র পূজ্যপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আদেশে এই মহাপুরুষের জীবন-চরিত রচনায় সাহসী হইয়াছি। কিন্তু তিনি বারংবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যেন এই জীবন চরিতে সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব সকল সন্নিবেশিত হয়; কদাচ যেন ভুল তথ্য বা তত্ত্ব এবং লেখকের কল্পনাপ্রসূত অমূলক কাহিনী না থাকে, যাহা পূর্ব্বে অনেক গ্রন্থেই দেখা গিয়াছে।

বহু জ্ঞানীগুণী ও ক্রিয়াবান্ পূজ্যপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে বহুদিন ধরিয়াই অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন যে তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে যোগিরাজ শ্যামাচরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যনির্ভর জীবনী রচনা করেন, অন্যথা তাঁহার অবর্তমানে সঠিক তথ্য সকল বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্য ও সময়াভাব বশতঃ উহা করিতে পারেন নাই। তাই তিনি তাঁহার সন্তানতুল্য এই লেখককে আদেশ করিলেন লিখিবার জন্য।

আমি তাঁহার নিকট নিবেদন করিলাম এই মহাযোগীর জীবনী রচনা করা

আমার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে ? বামন হইয়া চাঁদে হাত ! ক্ষুদ্র দূর্ব্বাঘাস যেমন বিশাল বটবৃক্ষের পরিমাপ করিতে পারে না, আমার পক্ষেও তদ্রূপ এই মহাযোগীর সঠিক ও প্রামাণিক জীবনী লেখা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় অভয় দিয়া এক অপূর্ব্ব কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি ভাবছ কেন, কাজ শুরু করিয়া দাও, তাহা হইলেই যাঁহার জীবনী তিনিই রচনা করিয়া লইবেন। 'আমি করছি' এই ভাবটাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই দেখিবে তাঁহার কাজ তিনিই করিয়া লইবেন।"

তাই তাঁহার অভয় বাণীকে স্মরণ করিয়া মনে বল পাইলাম ও লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম, ভরসা কেবল সেই মহাযোগীর শ্রীপাদপদ্ম। শ্রীমাধবের কৃপায় পঙ্গুও যেমন সুউচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তদ্রূপ এই মহাযোগীর কৃপায় তাঁহারই জীবনকথা আলোচনা করিতে সাহসী হইলাম। অনেক সময় কলম ধরিয়া বসিয়া থাকি কিছুই লিখিতে পারি না, আবার তাঁহাকে স্মরণমাত্র কলম চলিতে থাকে। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পার হইয়া চৌদ্দ মাস অতিক্রান্ত হইল।

কোন রাজনীতিবিদ্‌, সমাজনীতিবিদ্‌, কবি, লেখক বা অপরাপর বিরাট ব্যক্তিদের জীবনী লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ তাঁহাদের জীবনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বহিঃপ্রকাশ থাকে। কিন্তু অধ্যাত্মজগতের যোগিপুরুষদের জীবন ঠিক তাহার বিপরীত; সেখানে বহিঃপ্রকাশ প্রায় নাই বললেই চলে। পূর্ব্বোক্তদের জীবনী তথ্য নির্ভর, কিন্তু মহাযোগীদের জীবনী অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নির্ভর। তাই তাঁহাদের জীবনী লেখা বড়ই কঠিন। যোগিপুরুষগণ প্রয়োজনবোধে যে সব অলৌকিক ঘটনা সকল দেখাইয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা তাঁহারা যে আদর্শ স্থাপন করিয়া যান বা মুক্তি পথের সন্ধানের জন্য মানবের সম্মুখে যে সাধন পথ দেখাইয়া যান, যাহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, যে পথে চলিলে মানুষ তাহার চরম ও পরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে, তাঁহাদের জীবন কাহিনীতে সেই দিকটাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ তাঁহারা চলিয়া গেলেও তাঁহাদের স্থাপিত আদর্শ বা সাধনপথ বহু শতাব্দী যাবৎ প্রবহমান থাকে। তাই এই গ্রন্থে বিশেষভাবে যোগিরাজ প্রদর্শিত যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত সাধন-তত্ত্ব ও আদর্শের প্রতি সাধ্যমত আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সাধারণ মানুষের ধারণা যে যোগী যত বেশী ও বড় বড় অলৌকিক ঘটনা

দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি তত মহান্। কিন্তু আমাদের ধারণা সকল যোগীই বহু বহু অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে সক্ষম। সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে যোগিপুরুষদের ছোট করিয়া দেখা হয়। তত্ত্বজ্ঞ যোগিপুরুষদের বুঝিবার উহা যথার্থ মানদণ্ড নহে। বরং যে যোগিপুরুষ কোন কিছু ত্যাগ না করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে সহজ সরল যোগসাধনা করিয়া সাধনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন; তিনিই যথার্থ আদর্শ যোগিপুরুষ। তাঁহার আদর্শই মানব সমাজের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

মানুষ সমাজশৃঙ্খলে আবদ্ধ জীব, সংসার তাহার বড় প্রিয়। শাস্ত্র-দৃষ্টিতেও চতুরাশ্রমের মধ্যে সংসারাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। তাই সে সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বর সাধনা করিতে চায়। ইহা তাহার স্বভাব জাত বলিয়া সহজ পথ। যে মহাত্মাগণ সেই সকল সংসারী মানুষের মত জীবন যাপন করিয়া, সংসারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের আলোকে তাহাদের পথ দেখাইয়া থাকেন; সংসারী মানুষ তাঁহার আদর্শকেই জীবনের পাথেয় বলিয়া নিরূপণ করে। সেইদিক দিয়া এই মহাযোগীর আদর্শ সকল গৃহী মানুষের নিকট আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য। পুরাকালে ঋষিগণও তাহাই করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় যোগিরাজের স্বহস্ত লিখিত ছাব্বিশখানি ডায়েরী হইতে তথ্য সকল পরিবেশন করিয়া, তাঁহাদের পারিবারিক অনেক তথ্য এবং যোগিরাজের জীবনের সঠিক ঘটনাবলী প্রদান করিয়া এই গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার সক্রিয় সাহায্য ছাড়া যোগিরাজের জীবনের সঠিক তথ্য সকল পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাঁহার এই অবদানের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি।

এই গ্রন্থে যাহাতে মহাযোগীর জীবনের ঘটনাবলী, আদর্শাবলী ও সাধন-তত্ত্ব সঠিক ও নির্ভুল হয়, সেইজন্য প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে যোগিরাজ কৃত বহু শাস্ত্র গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য ব্যাখ্যা সকল সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত ছাব্বিশখানি ডায়েরিকে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা ও ভিত্তি করিয়া, বিভিন্ন ভক্তের সহিত তাঁহার যে সমস্ত পত্রালাপ হইয়াছিল তেমন বহু পত্র সংগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বে বিক্ষিপ্তভাবে বহু ভক্তের দ্বারা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত মহাযোগীর জীবনের বহু ঘটনাবলী, উপদেশাবলী ও সাধনতত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া এবং

যোগিরাজ পৌত্র পূজ্যপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত ও আদর্শ সকল সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেইজন্য ঐ সকল পূর্ব্বসূরি এবং যাঁহারা পুরাতন পত্র সকল সরবরাহ ও প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ডঃ শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী, শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর কুমার দত্ত, শ্রীঅশোক কুমার সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ যাঁহারা এই গ্রন্থের জন্য নানাভাবে সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। মহাযোগির শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই এই সকল উপকারী ও ভক্ত মানবদের পার্থিব ও পারমার্থিক উভয়দিকে মঙ্গল করুন।

যোগিরাজের লেখা ডায়েরি ও বিভিন্ন পত্র হইতে যে সব বক্তব্যগুলি সরাসরি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকলভাবে উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতর বড় অক্ষরে রাখা হইয়াছে, যাহাতে সেই সব বক্তব্যগুলির কোন প্রকার গুরুত্ব কমিয়া না যায় এবং কথাগুলির যাহাতে ভবিষ্যতে কোন প্রকার বিকৃতি না ঘটে। প্রায়শঃ মহাযোগীদের সরাসরি উক্তিগুলি ভবিষ্যৎ সাধকরা খুব কমই পাইয়া থাকেন, কারণ কালপ্রভাবে সেইগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করে। আশা করি ইহাতে ভক্তসাধকদের উপকারই সাধিত হইবে।

গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে যে সকল বচনগুলি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার যে সকল ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহা সবই যোগিরাজ কৃত ব্যাখ্যা অথবা তাঁহারই মতাদর্শ অনুসারে কৃত ব্যাখ্যা।

অনেক সময় অনেক কথা একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ মহাযোগীদের অনুভূতি ও সাধনতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া ইহা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। সেজন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্।"

—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনীড় এস্টেট,
ব্লক—এক্স, ফ্ল্যাট—১৮,
গোপাললাল ঠাকুর রোড,
কলিকাতা-৭০০০৩৬

পরিশিষ্ট (খ)

যোগিরাজের বংশতালিকা

পরিশিষ্ট (গ)

কাশীমণি দেবীর বংশতালিকা

(যতদূর পাওয়া গেল দেওয়া হল।)

পুরাণ পুরুষ

যো

গি

রা

জ

শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
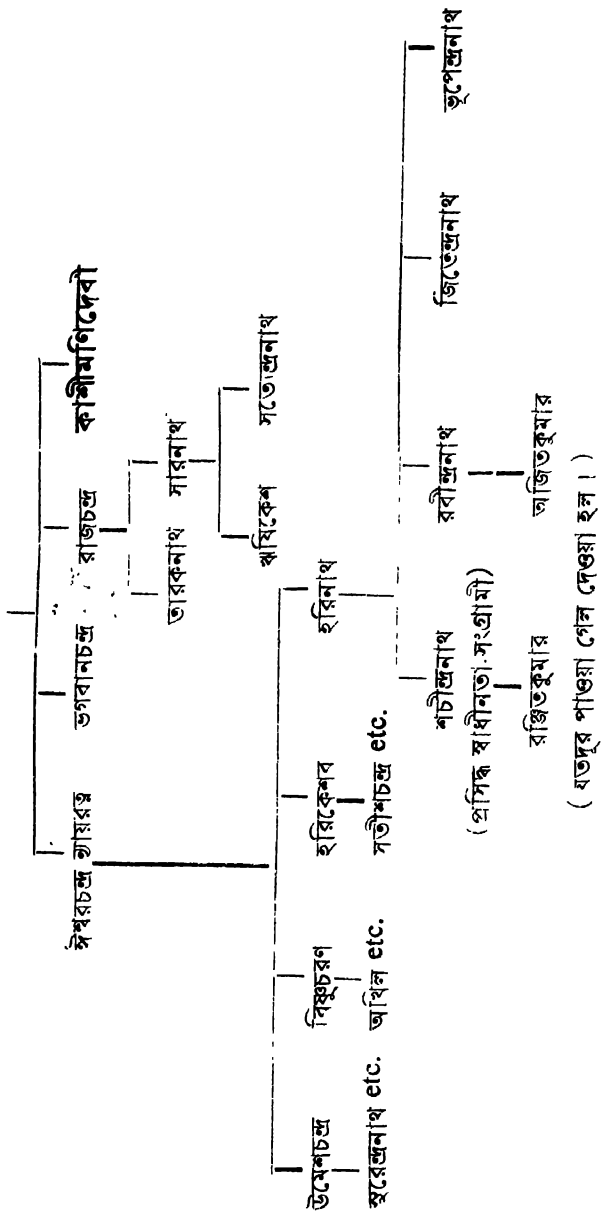
দ্বিতীয় সংস্করণের উপক্রমণিকা।

এই মহান্ পবিত্র গ্রন্থখানি প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং তাঁহার প্রদর্শিত বিজ্ঞান-সম্মত অমর যোগসাধন সম্বন্ধে দেশবাসীর জানবার প্রবল আগ্রহ। বহু সুধী এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পত্র দ্বারা বা মৌখিকভাবে পূজ্যপাদ যোগিরাজপৌত্র, লেখক ও প্রকাশিকার কাছে আন্তরীক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে সাধুবাদ জানাই। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে কিছু দেরী হল, তার কারণ ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত দিনলিপি থেকে আরও যেসব মহামূল্যবান্ তথ্য পাওয়া গেল সেগুলিও এই সংস্করণে সন্নিবেশ করে সম্পূর্ণ করা হল। আশা করি এতে অধ্যাত্মপিপাসু মানবের উপকার সাধিত হবে। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের কিছুটা অসুবিধা হবে ঠিকই কিন্তু এছাড়া কোন উপায় হল না। যাঁরা বাঙলা ভাষা জানেন না তাঁরা এই পবিত্র গ্রন্থখানি অনুবাদের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন; তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে এবং আশা করা যায় কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে। এই প্রচণ্ড দুর্মূল্যের বাজারে যতটা সম্ভব, স্বল্পমূল্যে দেশবাসীর হাতে এই মহান্ পবিত্র গ্রন্থখানি পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হল। 'বড়বাবার' ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

—প্রকাশিকা।

সূচীপত্র

শ্রী শ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণঃ

পুণ্যশ্লোকা কাশীমণি দেবী

পুরাণ পুরুষ

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব

"শ্যামাচরণ, ইধার আও।"

পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসে সেই ডাক শ্যামাচরণের কর্ণকুহরে। শ্যামাচরণ বিস্মিত হন!

এই অরণ্যবেষ্টিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে নাম ধরিয়া কে ডাকে! নামই বা জানিল কি করিয়া!! শ্যামাচরণ দেখিলেন পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াইয়া আছেন এক সৌম্য সন্ন্যাসী, নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন তাঁহাকে।

একি কাকতালীয়? সন্দেহের দোলায় দুলিতে দুলিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে চলেন শ্যামাচরণ। পর্ব্বত শিখরে পৌঁছিয়া দেখেন স্মিতহাস্যে তাঁহাকে আহ্বান জানাইতেছেন এক মহামুনি। চোখে তাঁহার পিতৃস্নেহ। দীর্ঘদিন পরবাসে থাকার পর সন্তান ফিরিয়া আসিলে পিতার যেরূপ আনন্দ হয়, তেমনই আনন্দিত মহামুনি স্বাগত জানাইতেছেন শ্যামাচরণকে।

"সে কি শ্যামাচরণ, তুমি আমায় চিনতে পারলে না? এই জায়গায় তুমি আগে কখনও এসেছ বলে মনে পড়ে? এই বাঘছাল, কমণ্ডলু এগুলিকেও কি তুমি চিনতে পারছ না? সবই ভুলে গেলে?"

শ্যামাচরণ কিছুই চিনিতে পারেন না, বলিলেন—"আমি ত আগে কখনও এখানে আসি নি।"

"শোন শ্যামাচরণ, এ সবই মহামায়ার খেলা। তিনিই তোমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছেন।" মুনিবর ধীরে স্পর্শ করেন শ্যামাচরণকে। শ্যামাচরণের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হইয়া যায়। মনে পড়িয়া যায় তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কথা।

অশ্রুসজল নেত্রে শ্যামাচরণ লুটাইয়া পড়েন মুনিবরের চরণতলে। ফিরিয়া পান তাঁহার জন্মজন্মান্তরের আপনজনকে।

যুগ যুগ ধরিয়া তাপিত গৃহী মানুষ তাহাদের অন্তর্দেবতার নিকট প্রার্থনা জানায়, বলে ; হে মহান্, তুমি এমন পথ দেখাও যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়া তোমার সাধনা করিতে পারে। সংসারকে বাদ দিয়া ত তাহারা সাধনা করিতে পারে না। হে মহান্, তুমি এমন পথপ্রদর্শক পাঠাও, যিনি নিজে সংসারী হইয়া সংসারী মানুষদের প্রকৃত পথ দেখাইতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে মানুষ অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। তাহারা দেখিয়াছে, যাঁহারাই তাহাদের পথ দেখাইতে আসেন, হয় তাঁহারা সংসার ত্যাগী, না হয় তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও পরনির্ভরশীল হইয়া জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাহাদের মত হইয়া পথ দেখাইতে পারেন, তাহাদের মাঝে থাকিয়া পথ দেখাইতে পারেন, তাহাদের ত্যাগ না করিয়া যিনি পথ দেখাইতে পারেন এমন পথপ্রদর্শকের এ যুগে বড়ই অভাব। হয়ত এতদিনে অন্তর্দেবতা তাহাদের কথা শুনিয়াছেন। তাই আজ গৃহী মানুষের মহাআনন্দ। পুরনারীগণ উলুধ্বনি দ্বারা এবং পুরুষগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে আবাহন করিয়া স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনে সেই মহাজ্যোতিকে, যিনি কৃষ্ণনগরের পাশে ঘুরণী গ্রামে এক দেবশিশুর রূপ পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। সেই দেবশিশু শপথ লইলেন, বলিলেন—আমি তোমাদের মাঝে থাকিব, তোমাদের মত হইয়া থাকিব। যাঁহারা তোমাদের ছাড়িয়া গিয়া অবার ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের পথ দেখান আমি তাঁহাদের মত পথ তোমাদের দেখাইব না। তোমরা সংসারে যেমন দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র, শোক, তাপ সহ্য করিয়া অবস্থান কর আমিও তাহাই করিব। ঈশ্বর সকলকেই হাত পা বুদ্ধি দিয়াছেন, তাই দিয়া তোমরা যেমন স্বকীয় রোজগারে জীবন নির্ব্বাহ কর আমিও তাহাই করিব। অর্থাৎ সংসারে তোমরা যে যেমন ভাবে আছ তেমনি ভাবে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বর সাধনা করিতে পার সেই পথ তোমাদের দেখাইব।

বঙ্গাব্দ ১২৩৫, ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার, অপরপক্ষীয় সপ্তমী তিথি ৭ দণ্ড ৩০ পল সময়ে তুলা লগ্নে (ইংরাজী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৮) এই দেবশিশু জন্মগ্রহণ করেন ঘুরণী গ্রামের গৌরমোহন লাহিড়ী (সরকার) মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তকেশী দেবীর গর্ভে। গৌরমোহনের প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র চন্দ্রকান্ত ও সারদাপ্রসাদ এবং এক কন্যা স্বর্ণময়ী জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নী তীর্থ যাত্রাকালে পথিমধ্যে পরলোক গমন করেন। তারপর গৌরমোহন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে মুক্তকেশীর

সুলক্ষণা নামে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং গৌরমোহনের মোট তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল।

'শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।' ভগবৎ সাধনার বন্যায় নদীয়া নিজেও ভাসে অপরকেও ভাসায়। তাই নদীয়ার এই পবিত্র মাটিতে আর এক দেবশিশু আসিয়াছেন তাপিত, পীড়িত, সংসার জ্বালায় জর্জ্জরিত গৃহী মানুষদের পথ দেখাইতে। বহু মহাত্মার পদধূলিপূত, বহু পণ্ডিতের স্মৃতিধন্য নদীয়া তাহার কোলে স্থান দিল আর এক মহামানবকে। তাই নদীয়ার আকাশ বাতাস হাসিতেছে, মৃত্তিকা হইতে ধূলিকণা উর্দ্ধে উঠিয়া, বৃক্ষগণ মাথা দোলাইয়া, পক্ষিকুল মধুর গান গাহিয়া, ভ্রমরগণ এক ফুল হইতে অপর ফুলে নাচিয়া নাচিয়া অভিনন্দন জানাইতে লাগিল সেই দেবশিশুকে। গৌরবর্ণ ও সুন্দরকান্তি ঐ দেবশিশুকে দেখিবার জন্য পাড়ার সকল পুরনারীগণ লাহিড়ী গৃহে আসিতে লাগিল। আনন্দের হাট বসিয়া গেল ঘুরণী গ্রামে। গৌরমোহন সকলকে মিষ্টিমুখ করাইলেন। নবজাতকের মঙ্গলের জন্য সকলের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

সদাচারী, নিষ্ঠাবান্, ধার্মিক গৌরমোহন প্রতিদিন পূজাপাঠ, ধর্ম্ম আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। তিনি যোগপথের সাধনপরায়ণ ছিলেন। সৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি পরিচিত ছিলেন। সকল শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। সকল দেব-দেবীর প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ছিল। মুক্তকেশী দেবীও পরম নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন গৃহদেবতা শিবের পূজা করিতেন। শিব পূজা না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না। কোন ভিক্ষুক আসিলে যাহা থাকিত তাহাই তিনি দিয়া দিতেন। মুক্তকেশী দেবী অতীব দয়াবতী, দানশীলা ও সুশীলা রমণী ছিলেন, সেজন্য পাড়ার সকল পুরনারীগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। এমন পিতা-মাতার কোলেই দেবশিশুর আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবানও তাহাই বলিয়াছেন—

> **শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥**
> **অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।**
> **এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥[১]**

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শুচি ও শ্রীমানদিগের গৃহে অথবা জ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ যে জন্ম তাহা জগতে দুর্লভতর।

এক একটা সময় আসে যখন ফুলে ফলে দেশ ভরিয়া যায়। ঊনবিংশ

---

(১) গীতা ৬।৪১-৪২

শতাব্দী ছিল ভারতের তেমনি একটা সময়। ভারত-রবি তখন মধ্য গগনে বিচরণ করিতেছেন। সে সময় অধ্যাত্মপথে যেমন বহু মহাত্মার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তেমনি রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ভারত পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিল। অর্থের প্রতি তখনকার মানুষও ছুটিত ঠিকই, কিন্তু বর্ত্তমানকালের মত ধর্ম্মনীতিকে বিসর্জন দিয়া নয়। তখনকার মানুষ সকলেই ধর্ম্ম মানিত, ধর্ম্মের অনুশাসনও মানিত। দীর্ঘদিন মুসলমান শাসন ও পরে ইংরাজ শাসনে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম কিছুটা বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলকে প্রলোভনে ফেলিয়া বহু সনাতন ধর্ম্মীয় মানুষকে প্রায় জোর করিয়া মুসলমান বা খৃষ্ট ধর্ম্মে টানিয়া লওয়া হইত। এমন সময়ে সকল দিক হইতে মহাত্মাদের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। তাই দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রায় সকল প্রান্তে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বহু মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মজগতে নদীয়া ও কাশীর অবদান অপরিসীম।

মুক্তকেশী দেবীর আদরের সন্তান ধীরে ধীরে বড় হইতে লাগিল। সকলে আদর করিয়া নাম রাখিলেন শ্যামাচরণ। তখনকার দিনে অনেকে দেব-দেবীর নামে পুত্র-কন্যার নামকরণ করিতেন। ইহাতে তাঁহারা বলিতেন পুত্র-কন্যাকেও ডাকা হইবে আর সেই সাথে ভগবানের নামও হইবে। মুক্তকেশী দেবী কখনও গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়া শিশুকে ঘুম পাড়ান, কখনও শিব মন্দিরে লইয়া গিয়া পাশে বসাইয়া রাখিয়া তন্ময় হইয়া পূজা করেন। শিশুও চোখ দুইটি বুজিয়া শিবঠাকুর হইয়া বসিয়া থাকে। আবার কখনও বা নদী তীরে গিয়া বালুর উপর শিশুকে বসাইয়া রাখিয়া নিজের কাজ সারেন। শিশুও সারা অঙ্গে বালু মাখিয়া শিবঠাকুর সাজিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। শিশু সুলভ চপলতা ঐ দেবশিশুর মধ্যে খুব কমই দেখা যাইত। বরং দেখা যাইত উদাস নয়নে যেন কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছে, সে যেন অসীমের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিতে চায়। শিশুর ভাব-ভঙ্গী আচার আচরণ দেখিয়া অনেকেই আন্দাজ করিয়াছিলেন এ শিশু সাধারণ শিশু নয়।

লাহিড়ী পরিবারে গৃহদেবতা ছিলেন শিবঠাকুর। বাড়ি সংলগ্ন বাহিরের দিকে ছিল গৃহদেবতার মন্দির। একদিন মুক্তকেশী দেবী শিশুকে পাশে বসাইয়া রাখিয়া তন্ময় হইয়া আছেন শিবঠাকুরের ধ্যানে। শিশুও পাশে বসিয়া আছে চোখ বুজিয়া মায়ের অনুকরণে। অকস্মাৎ জটাজুটধারী,

সৌম্য ও বিশালকায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন মন্দিরের সামনে, 'মা' বলিয়া ডাকিলেন মুক্তকেশী দেবীকে। মুক্তকেশী দেবী হঠাৎ ভয় পাইয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ভয় পেয়ো না মা, আমি সন্ন্যাসী, আমাকে দেখে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।"

মুক্তকেশী দেবী তবুও ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তোমার ঐ পুত্র সাধারণ মানব শিশু নয়। আমিই ওকে পাঠিয়েছি সহস্র সহস্র তাপিত, সংসার জ্বালায় জর্জ্জরিত গৃহস্থ মানুষকে নিভৃত সাধনার পথ দেখাতে। এই শিশু নিজে গৃহে থেকে সকলকে আকৃষ্ট করবে যোগ সাধনার দিকে। তোমার কোন ভয় নেই মা, আমি ছায়ার মত সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখব এই শিশুকে"। এরপর সন্ন্যাসী ধীর পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ।

গৌরমোহনের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালের মত তখন তীর্থ ভ্রমণ সহজ ছিল না। তখন ভারতবর্ষে রেলগাড়ী হয় নাই। হাঁটাপথে অথবা জলপথে তীর্থ ভ্রমণ করিতে হইত। সেকারণে দস্যুদের ভয়ও ছিল। জানা যায় গৌরমোহনের পিতাও তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে একাধিকবার কাশী গিয়াছিলেন। ফলে কাশী গৌরমোহনের নিকট বেশ পরিচিত ছিল। গৌরমোহনের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না। ঘুরণী অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী থাকা সত্ত্বেও তিনি ঠিক করিলেন সপরিবারে কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। কেন তিনি কাশীতে গিয়া বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহার কারণ সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে মোটামুটি কয়েকটি কারণে হয়ত তিনি কাশী বাস করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। প্রথম কারণ, যতদূর জানা যায় যখন শ্যামাচরণের বয়স পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তকেশী দেবী পরলোক গমন করেন। সেই কারণে সংসারের প্রতি হয়ত তাঁহার বৈরাগ্য উদয় হইয়াছিল; কারণ মুক্তকেশী দেবী ঘুরণী অথবা কাশী কোথায় পরলোক গমন করেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল থাকায় এবং পূর্ব্ব হইতে কাশী তাঁহার পরিচিত হওয়ায় তিনি ঠিক করিয়াছিলেন কাশী গিয়া বাস করিবেন। তৃতীয় আর একটি কারণ যতদূর জানা যায় তাহা হইল ঐ সময় লাহিড়ী পরিবারে এক ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। খড়ে নদীর তীরে তাঁহাদের বাসভবন থাকায় এক প্রবল বন্যায় বাসভবন সহ বহু ভূসম্পত্তি নষ্ট হয়। অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে গৌরমোহন ভাগ্যান্বেষণে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কারণটি হয়ত ঠিক নহে। কারণ এই প্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সাধারণতঃ কেহ পূর্ব্বপুরুষগণের ভিটা ত্যাগ করেন না। বিশেষ করিয়া গৌরমোহনের জমিদারী থাকায় তাঁহার পক্ষে ইহা সাজে না। এ অবস্থায় তিনি পুনরায় বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারিতেন। অতএব ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রথমোক্ত দুটি কারণের যে কোন একটি কারণে তাঁহার

ধর্ম্মভাব প্রবল হয় এবং কাশী তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত হওয়ায় তিনি কাশীবাসী হইয়াছিলেন। যে কারণেই হোক তিনি পুত্র-কন্যাদের লইয়া দীর্ঘ জলপথে কাশী গেলেন। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকান্ত মদনপুরার সিমন্‌চৌহাট্টায় একটি বাড়ি কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে সেই বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

উক্ত বন্যায় গৌরমোহনের ভূসম্পত্তির সহিত তাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরটিও নদীগর্ভে বিলীন হয়। সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কোন এক ভক্ত নদীগর্ভ হইতে উক্ত শিবঠাকুরকে উদ্ধার করিয়া নূতন মন্দিরে স্থাপন করেন। জল হইতে উদ্ধার করা হয় বলিয়া উহাকে জলেশ্বর বলা হয়। এখন ঐ স্থানটি ঘুরণীর শিবতলা বলিয়া খ্যাত। উহা এখন জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ কাশীবাসী হওয়ায় তদারকির অভাবে জমিদারী হস্তচ্যুত হইতে লাগিল।

শ্যামাচরণের বয়স পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে গৌরমোহন পুত্রের লেখাপড়ার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান্ ছিলেন, তাই তিনি বিদ্যার মূল্য বুঝিতেন। তখনকার দিনে গোঁড়া হিন্দু পরিবারে অনেকেই ইংরাজী শিক্ষা পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল ইংরাজী ভাষা ম্লেচ্ছ ভাষা। সম্ভবতঃ গৌরমোহন মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার জমিদারীর অবক্ষীয়মান অবস্থায় পুত্রের পক্ষে উপার্জনমুখী শিক্ষাই অধিকতর প্রশস্ত। সে যুগে ইংরাজী শিক্ষিত লোকের কর্ম্মসংস্থান অত্যন্ত সুগম ছিল। অথবা তাঁহার ভাষার প্রতি কোন গোঁড়ামি ছিল না। যে কোন কারণেই হোক যুগোপযোগী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি পুত্রকে গরুড়েশ্বর পল্লীতে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্থাপিত জয়নারায়ণ ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।[১] অতঃপর তিনি বার বৎসর বয়সে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করেন। পরে ঐ সরকারী ইংরাজী স্কুলটি কলেজে পরিণত হয় এবং তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসর ঐ কলেজে পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহার

(১) এই স্কুলটিই সম্ভবতঃ বারাণসীর প্রাচীনতম স্কুল। বর্ত্তমানে ঐ স্কুলটি রামাপুরা ও মৈত্রী তলাবের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বড় রাস্তার উপর সদানন্দ বাজারে অবস্থিত।

বয়স কুড়ি বৎসর হইবে। তিনি ঠিক কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষায়তনের বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা না গেলেও তিনি যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ পরবর্ত্তিকালে তিনি বহু ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোঝা যায় তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্দু, হিন্দী ভাষা ছাড়াও ফারসী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি নাগভট্ট নামক এক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা সহ বেদ উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কলেজে অধ্যয়নকালে আঠার বৎসর বয়সে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। সে সময় যে সমস্ত বাঙালী পরিবার কাশীতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গৌরমোহনের ন্যায় হাওড়া জেলার বেলুড় অঞ্চল হইতে আগত পণ্ডিত দেবনারায়ণ সান্যাল বাচস্পতি মহাশয়ও ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কাশীর পণ্ডিত মহলে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গৌরমোহনের সহিত তাঁহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। শোনা যায় তৈলঙ্গ স্বামী একমাত্র ঐ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বাড়িতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। বাচস্পতি মহাশয় গৌরমোহনের বাড়ির নিকটে খালিসপুরা মহল্লায় বাস করিতেন। সেকারণে তিনি মধ্যে মধ্যে গৌরমোহনের গৃহে আসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। বাচস্পতি মহাশয় বিপত্নীক ছিলেন। তিনটি পুত্র ও একমাত্র শিশুকন্যা কাশীমণিকে স্বয়ং লালন পালন করিতেন। কাশীমণি পিতার সহিত গৌরমোহনের বাড়িতে যাইতেন ও খেলা করিতেন। বাড়ির মহিলারা কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"তুমি কাহাকে বিবাহ করিবে?" শিশুকন্যা তখন সৌম্যদর্শন শ্যামাচরণকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিতেন। গৌরমোহন এই নবম বর্ষীয়া শ্যামবর্ণা কাশীমণির সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ দেন।

শ্যামাচরণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কিছু কিছু ব্যায়াম করিতেন ও সাঁতারে পটু ছিলেন। তিনি শ্রমসহিষ্ণু ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। অযথা সমবয়সীদিগের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটাইতেন না। তিনি কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করিতেন না এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ছিল। খাবার না দিলে চাহিয়া খাইতেন না।

প্রায় ২৩ বৎসর বয়সে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সরকারী পূর্ত্ত বিভাগে (Public Works Department, Military Engineering Works) গাজিপুরে তিনি

করণিকের চাকরী পান। সৈন্যদের রসদ পাঠান ও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করাই সেইকালে এই বিভাগের কাজ ছিল। পরে তাঁহাকে মির্জাপুর, বকসর, কটুয়া, গোরখপুর, দানাপুর, রাণীক্ষেত, কাশী প্রভৃতি স্থানে বদলি হইয়া চাকুরী করিতে হইয়াছিল। চাকরীর শেষ দিকে তিনি ব্যারাক মাষ্টার (বর্তমানে S. D. O.) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

যখন গাজিপুরে কর্ম্মরত ছিলেন তখন তাঁহার বেতন খুব অল্পই ছিল। সেকারণে তিনি সেনাবিভাগের কয়েকজন সাহেব অফিসারকে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা শিখাইয়া কিছু আয় করিতেন, তাহাতে তিনি নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন এবং মাহিনার টাকা পাঠাইতেন কাশীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরের অফিস কাশীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি কাশী বদলি হইয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই ৩১শে মে তাঁহার পিতৃদেব কাশীলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদের সহিত গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মপ্রাণ শ্যামাচরণ সর্ব্বদাই অশান্তি হইতে দূরে থাকিতে চান। বিশেষ করিয়া যে কাজের জন্য তিনি এই মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন, যদিও তাহা তখন তাঁহার নিকট অজ্ঞাত, তবুও পূর্ব্ব হইতেই তাহা নির্দিষ্ট থাকায় সেই কর্ম্ম-সংস্কার তাঁহাকে শান্তির দিকে টানিবেই। যিনি শান্তির বাণী শুনাইবার জন্য আসিয়াছেন তিনি কখনও অশান্তির মধ্যে থাকিতে পারেন না। কিন্তু সবদিক হইতে তাঁহাকে গৃহীর আদর্শ স্থাপন করিতেই হইবে। লোকশিক্ষা দিতে হইলে সবদিক থেকে 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়' এই মহাজন বাক্য প্রথমে নিজ জীবনে পালন করিতে হইবে। তাই সাধারণ গৃহী মানুষের জীবনে যেমন গৃহবিবাদ আসে, তাঁহার জীবনেও আসিল। বিশেষ করিয়া যিনি পূর্ব্ব হইতেই অঙ্গীকারবদ্ধ যে তিনি সাধারণ গৃহীর পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবন নিজে আচরণ করিয়া তবেই অপরকে শিক্ষা দিবেন। তাই তাঁহার জীবনেও গৃহবিবাদ আসিল। অল্প কিছুদিন গৃহবিবাদের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া শেষে তিনি সিমনচৌহাট্টায় একটি দুইতলা বাড়ির এক অংশ ভাড়া লইয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভরসা কেবল সামান্য বেতন ও গৃহশিক্ষকতার মাধ্যমে অল্প আয়। এই সামান্য রোজগারে সংসার চলিতে লাগিল। ইহাও তাঁহার লোকশিক্ষার আর এক দিক্। অর্থাৎ গরীব গৃহস্থ হইয়াও কিভাবে ধীরে ধীরে জীবন গঠন করিয়া সাধনার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তাহাও তিনি লোকশিক্ষার জন্য দেখাইয়া গেলেন। এইগুলিই

মহাপুরুষদের জীবনের ব্যতিক্রম। সাধারণ মানুষ যাহা পারে না, মহাপুরুষগণ অবলীলাক্রমে তাহা প্রথমে নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করেন। নতুবা সাধারণ মানুষ তাঁহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করিবে কেন? গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥[১]

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহা তাহা করে; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

* * * *

বিবাহের দীর্ঘকাল পর এই ভাড়া বাড়িতেই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। কাশীমণি দেবী অত্যন্ত শান্ত, দয়াবতী ও সুগৃহিণী ছিলেন। স্বামীর প্রচণ্ড অর্থকষ্টের সময়ও তিনি পরম ধৈর্য্যসহকারে সবদিক সামলাইয়া চলিতেন। তাঁহার সুবিবেচনা ও ব্যবস্থার গুণে পতির সামান্য উপার্জ্জন হইতে সঞ্চয় করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গরুড়েশ্বরে একটি বসতবাটি ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিনে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দুকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। এই বাড়িতেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বড় কন্যা হরিমতি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মধ্যমা কন্যা হরিকামিনী ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠা কন্যা হরিমোহিনীর জন্ম হয়। শ্যামাচরণ এইখানেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কাশীমণি দেবী কখনও অলসভাবে সময় কাটাইতেন না। প্রাতঃকালে সর্ব্বপ্রথম আগত ভিক্ষুককে স্বহস্তে ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে ভিখারী আসে না, তাই কোন দিন ভিখারী আসিতে বিলম্ব হইলে তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা থাকিত না। স্বামীর অল্প আয় থাকায় সমস্ত গৃহকার্য্য স্বহস্তে করিতেন। অতিথি ও আগন্তুক প্রায়ই আসিত। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে সব স্ত্রীলোক লেখাপড়া

---

(১) গীতা ৩।২১

শেখে তাহারা পরবর্তী জীবনে গণিকা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাই কাশীমণি দেবী লেখাপড়ায় বিমুখ ছিলেন। কিন্তু শ্যামাচরণ নিজে লেখাপড়া পছন্দ করিতেন। তাই তিনি গভীর রাতে নিজ স্ত্রীকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় কাশীমণি দেবী ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ নিজেই পাঠ করিতেন। এই পুণ্যবতী নারী স্বামীর প্রদর্শিত যোগপথে সাধনা করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাধনার এক উচ্চ অবস্থায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাশীমণি দেবী প্রায় ৯৪ বৎসর বয়সে ১৩৩৭ সালের ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯৩০, সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন।

শ্যামাচরণ অত্যন্ত উদ্যোগী ও কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। নানা লোকহিতকর কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে ও রামকালী চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র দে, কাশীনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি তৎকালীন কাশীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। শ্যামা-চরণ সমস্ত দিন চাকরী করিয়া, গৃহশিক্ষকতার কার্য্য করিয়া ও সংসারের নানা কর্ম্ম করিয়াও বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। এই রকম পরিশ্রমপরায়ণতা ও দৃঢ়চিত্ততার জন্যই ভবিষ্যৎ জীবনে কঠোর যোগাভ্যাসের পরিশ্রম তাঁহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই। তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে সংসারে থাকিয়াও দৃঢ়চিত্ততার সহিত সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়। উপনিষদ্ তাহাই বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"[১] বীর্য্যবান্ পুরুষেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, শ্যামাচরণের জীবনদর্শনই তাহার একটি প্রমাণ।

বাঙ্গালীটোলা স্কুল স্থাপনার পর তিনিই ঐ স্কুলের প্রথম সেক্রেটারী হন এবং তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চাহিতেন সকলে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক। সেজন্য ঐ স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেন। স্কুলের ছাত্রদের ঠিকমত বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে কিনা, স্কুলের সম্পত্তি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে কিনা এইসবও তিনি দেখিতেন। শিক্ষকরা ঠিকমত কাজ করিতেছেন কিনা সেজন্য তিনি হঠাৎ স্কুল পরিদর্শন করিতেন। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ তিনি স্কুলে গিয়া দেখিলেন স্কুলের দারোয়ান তাহার কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন না করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। পরদিন তিনি ঐ দারোয়ানকে এক আনা জরিমানা করেন।

(১) মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২.৩

তৎকালে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন নারী শিক্ষারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তাই তিনি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাইত না সেজন্য স্কুলটি বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ নেপালের মহারাজা তাঁহার চতুর্থ রাজকুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ সা ওরফে খালাকে পড়াইবার জন্য তাঁহাকে গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেন। পুনরায় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ নেপালের মহারাণী তাঁহাকে ঐ একই কাজে নিযুক্ত করেন। এইভাবে দেখা যায় তিনি দীর্ঘদিন নেপালের রাজপরিবারে গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায় তৎকালীন কাশীর ধনী ব্যবসায়ী হরশঙ্কর প্রসাদ সিং তাঁহার পুত্রকে পড়াইবার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তাঁহাকে গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি রামমোহন দে ছিলেন লাহিড়ী মহাশয়ের স্নেহ ও কৃপাভাজন। তাঁহারা পাঁচ ভাই ও ভগিনী মনমোহিনী অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাদের লেখাপড়ায় ও উন্নতির পথে যথেষ্ট আনুকুল্য বিধান করেন। পরবর্তীকালে রামমোহন আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের শুভাকাঙ্ক্ষা সুদূর প্রসারী হয়। রামমোহনের পুত্র তারামোহনও কাশীর খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার জামাতা ডঃ এস, সি, দেব এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। ভাইবোন সকলেই শ্যামাচরণের নিকট যোগদীক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন—"ঠাকুরের নিকট যে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি তা মাতা-পিতার নিকটও পাওয়া যায় না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দীক্ষা ও সাধনা।

লোকচক্ষুর অন্তরালে কত অলৌকিক ঘটনাই ঘটিয়া থাকে, কয়জন তাহার খবর রাখে! বিধির অপূর্ব্ব বিধান কতভাবে পরিচালিত হয়। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফলের উৎপত্তিতে। তাহারা ধন্য হয় সেই ফলের আস্বাদনে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি ধূমায়িত হইতে হইতে এইবার প্রজ্বলিত হইবার সুযোগ পাইল। প্রথমে গ্রহণ না ত্যাগ? গ্রহণ না করিলে ত্যাগ করা যায় না। কাহাকেও কিছু প্রদান করিতে হইলে দাতাকে প্রথমে উহা গ্রহণ করিতে হয়। শ্যামাচরণ এক মহান্ ব্রত লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে সংসারী মানুষদের এক অপূর্ব্ব সুকৌশলযুক্ত ও সহজসাধ্য যোগপথ দেখাইতে হইবে, এজন্য তিনি গৃহী মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; অতএব যে পথ দ্বারা তিনি অগণিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইবেন তাহা প্রথমে তাঁহাকে পাইতে হইবে। ভাগ্যবিধাতা যাহাকে যে কাজ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাকে সে কাজ করিতেই হইবে। তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইবার বিধি সেই দিকেই শ্যামাচরণকে হাত ধরিয়া টানিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর শ্যামাচরণ রাণীক্ষেতে বদলির আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এখানে তিনি হেডক্লার্কপদে নিযুক্ত হওয়ায় কিছু বেতন বৃদ্ধিও হয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলকে কাশীতে রাখিয়া, আপন ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর শ্যামাচরণ সুদূর রাণীক্ষেতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তখনকার দিনে রেলগাড়ী না থাকায় এক্কা অথবা অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে কয়েকদিন পর তিনি রাণীক্ষেত পৌঁছাইলেন এবং কাজে যোগদান করিলেন। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে হিমালয়ে অবস্থিত রাণীক্ষেত ৫৯৮০' ফুট উঁচু। কাঠগোদাম থেকে ৫০ মাইল দূরে রাণীক্ষেত বর্ত্তমানের মত জনপদপূর্ণ জায়গা ছিল না। চারিদিকে জঙ্গল, জনবহুলহীন এবং উত্তরদিকে তুষারমৌলি পর্ব্বতমালা সগর্বে আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বড় অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা বিশিষ্ট রাণীক্ষেত যে কোন মানুষকে ধ্যানমৌন

দেবাদিদেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। অতি কঠিন হৃদয়ের মানুষও এখানে আসিলে ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া ওঠে। এখানকার প্রাকৃতিক শোভার সীমাহীন বিচিত্রতা। কোথাও কোথাও সাধুদের আস্তানা, শিবকল্প তাপসদের বিচরণ ভূমি। তাঁহারা এই নির্জ্জন পরিবেশে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন। দেবতাত্মা হিমালয়, প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের মানুষের অন্তরের পূজা পাইয়া আসিতেছে। বিশ্ববিশ্রুত এর খ্যাতি। ভক্তদের বিশ্বাস এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান। যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি।

সৈন্যদের জন্য রাস্তা তৈয়ারী হইবে, তাহাদের রসদ আসিবে, একটি সেনানিবাস স্থাপিত হইবে। এজন্য এখানে একটি নূতন অফিস খোলা হইয়াছে। থাকিবার মত ঘরবাড়ি তখনও না হওয়ায় তাঁহাকে তাঁবুতেই বাস করিতে হইত। অফিসে তাঁহার বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। তদারকী ও কয়েকটি চিঠি পাঠাইয়াই তাঁহার কাজ শেষ হইত। ফলে প্রাকৃতিক শোভা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া উপভোগ করিবার মত যথেষ্ট সময় তাঁহার ছিল।

একদিন শ্যামাচরণ সশস্ত্র সিপাহী ও চাপরাশীদের সঙ্গে লইয়া অফিসের টাকাকড়ি সহ পাহাড়ের নির্জ্জন পথ ধরিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনিলেন কে যেন তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। শ্যামাচরণ পাহাড়ের উপর দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। সন্ন্যাসী কিছুটা দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া শ্যামাচরণের সামনে দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। মুখে মৃদু হাসি। শ্যামাচরণ ভাবিলেন হয়ত কোন লুণ্ঠনকারীদের সর্দ্দার, তাহার দলের লোকেরা নিকটেই কোথাও লুকাইয়া আছে। তাঁহারা সাবধান হইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"শ্যামাচরণ, ভয় পাইও না। আমি জানিতাম তুমি এই পথ দিয়া যাইবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি অফিসের কাজ সত্বর সম্পন্ন করিয়া আমার আস্তানায় আসিবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব"। এই বলিয়া সন্ন্যাসী দূরে পাহাড়ের উপর আস্তানা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

এরপর শ্যামাচরণ অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। শ্যামাচরণ ভাবিতে লাগিলেন সাধুর নিকট যাইবেন কিনা। আবার ভাবিলেন সাধু তাঁহার নাম জানিলেন কেমন করিয়া! শ্যামাচরণ

জানিতেন হিমালয়ের এই নির্জ্জন প্রদেশে অনেক ভাল সাধু-সন্ন্যাসীও থাকেন। তাই স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রাণ শ্যামাচরণের ঐ সাধুর সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল এবং সত্বর ঐ সাধুকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।

পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পথে চলিতে গেলে সমভূমির মানুষ সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পাহাড়ের গাত্র দিয়া যে সরু পথ শিখরদেশে গিয়াছে, তিনি সেই পথ দিয়া একাকী চলিতে লাগিলেন। এই অপার্থিব সৌন্দর্য্যময় প্রদেশে, ধ্যানাসীন ধূর্জ্জটির তপোবনে কত মহাযোগী ধ্যানমগ্ন। তাঁহাদের পুণ্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে কত মানুষের আনাগোনা।

বহুদূর যাইবার পর ক্লান্ত হইয়া শ্যামাচরণ ভাবিতেছেন আর তাঁহার যাওয়া উচিত হইবে কিনা। এদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যদি তিনি তাঁবুতে ফিরিতে না পারেন তাহা হইলে এই শ্বাপদসঙ্কুল এলাকায় ভয়ও আছে। ক্রমে পিছনের পাহাড়ের অন্তরালে দিনমণি সেদিনের মত পাটে বসিবার আয়োজন করিতেছেন। একটা পাথরের উপর বসিয়া শ্যামাচরণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কোথাও জনমানব নাই, থাকিবার কথাও নয়। অল্প শীত পড়িয়াছে। বন পথ। চারদিকে নিবিড় বন। তাহারই মধ্য দিয়া আগাইয়া চলেন শ্যামাচরণ। মনে সন্দেহ জাগে—ভুল পথে এলেন নাকি। সম্মুখে প্রসারিত হিমালয়ের বিচিত্র শোভা। যতদূর দৃষ্টি যায়, পাহাড়ের পর পাহার ঢেউ খেলিয়া দিগন্তে মিশিয়া আছে। মনে হয় হিমালয়ের এই অরণ্যই দেব-মানবের বাসভূমি। এই হিমালয়ই ত সাধুমহাত্মার তপস্যাক্ষেত্র। নীচে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া বাহির হইয়া আসে হিমালয়ের পাদমূলবিধৌত তন্বী নির্ঝরিণী। সে যেন দেবাদিদেবের অঙ্গধৌত চরণামৃত ধরাধামে বহিয়া আনে। ঝরণাধারা নীচে গগাস নদীর কোলে ছুটিয়া গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। বাতাসে অবিরাম সেই জলের কলকল ছলছল শব্দ। যেন বনদেবী অলক্ষ্যে জলতরঙ্গ বাজাইতেছেন। প্রবাহ পথে রাশি রাশি শিলাখণ্ড মাথা তুলিয়া স্তব্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত শোনে। চীর ও পাইন গাছগুলি প্রহরীর মত যেন সঙ্গীন উঁচু করিয়া সারা পাহাড় দখল করিয়া আছে। তাহারই বন-নীলিমার অন্তরালে উর্দ্ধমুখী ক্ষীণ রেখা-পথ অধ্যাত্ম-পিয়াসী পথিক শ্যামাচরণের চিত্তকে হাত বাড়াইয়া অজানা পথে আহ্বান করে।

হঠাৎ তিনি আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন—"শ্যামাচরণ ইধার আও।" দেখিলেন পর্ব্বত শিখরে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে ডাকিতেছেন। সন্দেহের দোলায় দুলিতে দুলিতে কোন এক অজ্ঞাত নেশার টানে শ্যামাচরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে শিখরে পৌঁছাইলেন। দেখিলেন সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ঘরছাড়া পুত্র যেন বহুকাল পরে পিতার স্নেহসিক্ত স্নিগ্ধ আঁখিতলে আসিয়া দাঁড়ায়। নির্নিমেষ নয়নে স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকেন শ্যামাচরণ। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম জানান সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"শ্যামাচরণ, তুমি আমায় চিনতে পারছ না? এই জায়গায় তুমি আগে কখনও এসেছ বলে মনে পড়ে?" গুহার ভিতর বাঘছাল, কমণ্ডলু ইত্যাদি দেখাইয়া বলিলেন—"ঐগুলিকেও তুমি চিনতে পারছ না?"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"আমি এখানে পূর্ব্বে কখনও আসি নাই; ঐগুলি আমি চিনি না, অন্য কাহারও হইবে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"শোন শ্যামাচরণ, এ সবই মহামায়ার খেলা। তিনিই তোমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছেন।" সন্ন্যাসী ধীরে স্পর্শ করেন শ্যামাচরণকে। শ্যামাচরণের শরীরে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া যায়। মনে পড়িয়া যায় তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সাধন জীবন। বুঝিলেন এই মহামুনিই তাঁহার অতীত জন্মের গুরু।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"এইখানে থাকিয়া পূর্ব্বজন্মে তুমি সাধনা করিতে। এই বাঘছাল, এই কমণ্ডলু এসবই তোমার ছিল। ঐগুলি আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। এইখানে সাধনা করিতে করিতে তোমার জীবনাবসান হয়। তাহার পর ঘুরণীতে গৌরমোহনের পুত্র হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ কর। তাহার পর হইতেই সর্ব্ব বিষয়ে তোমার প্রতি আমার লক্ষ্য আছে। তোমাকে এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে আমিই বদলি করাইয়া আনিয়াছি, যোগদীক্ষা দিব বলিয়া। তোমার জন্য এইখানে ৪০ বৎসর অপেক্ষা করিতেছি।"

শ্যামাচরণ আবাল্য কাশীধাম মহাতীর্থে বাস করিয়া অনেক সাধু দেখিয়াছেন। সাধুদের সম্বন্ধে তাঁহার বাস্তব জ্ঞান প্রচুর ছিল। তাছাড়া তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও বিদ্যাবত্তার গুণে হৃদয়াবেগ যথেষ্ট সংযত ছিল। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সাধুর সহিত নানান বিষয়ে আলোচনা

করিয়া তাঁহার উক্তিগুলির বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহাতীত না হইয়াছেন ততক্ষণ তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা লইতে সম্মত হন নাই।

অতঃপর মুনিবর তাঁহাকে যোগদীক্ষা প্রদান করিলেন। শ্যামাচরণ নিস্পন্দ, সমাধিস্থ। এতক্ষণে পিছনের পাহাড়ের অন্তরালে সূর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যাকাশের তারাগুলি নিভৃতে সাজায় অনন্তে আরতির প্রদীপ। চারিদিকে স্বর্গে-মর্ত্ত্যে বিরাজ করে শব্দহীন মহান্ প্রশান্তি। শ্যামাচরণের মত প্রকৃতিও যেন ধ্যানমগ্না নিস্পন্দা যোগিনী। চারিদিকের পাহাড়গুলি জ্যোৎস্নাস্নাত দেবাদিদেবের জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করে। মনে হয় চন্দ্রদেব যেন আরতি করেন ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত শিবসুন্দরের। সারা ধরিত্রীর অঙ্গে উদ্ভাসিত হয় সেই চিরসুন্দরের অনন্তপ্রকাশ।

ক্রমে ভোরের আকাশে ফুটিল উষার অস্পষ্ট আলোক। আকাশে রাত্রি জাগরণের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তারাগুলি তাকাইয়া আছে। শশধর পশ্চিম গগনে পাহাড়ের অন্তরালে অন্তর্হিত। দিগন্তপ্রসারী শুভ্র বাষ্পের মত কুয়াশা। ক্রমে সেই পাতলা কুয়াশার মৌন আবরণ সরিয়ে পূর্ব্বদিকে অরুণ আভা ফোটে। তারাগুলি সম্ভ্রমে লুকায়। পূর্ব্বাকাশে আলোর কমল ফোটে। বিধাতার রূপসৃষ্টির এ এক অপূর্ব্ব মহিমা।

"জয় শিব শম্ভো, হরহর মহাদেব।"—উপস্থিত সন্ন্যাসীদের সমবেত কণ্ঠে শিবধ্বনি ওঠে। পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসে শ্যামাচরণের কর্ণকুহরে। জড় জগতের সেই ধ্বনি নবীন সাধকের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে আনন্দময় অনুরণন তোলে।

দেবাদিদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। শ্যামাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুনীল আকাশ। স্নিগ্ধ বাতাসের আদুরে পরশ। গাছের শাখায় শাখায় বিহঙ্গ কাকলি। শ্যামাচরণ ফিরিয়া চলিলেন নিজ আস্তানায়। কি যেন পরম প্রাপ্তির অপার্থিব আনন্দে মন পরিপূর্ণ।

তাঁহার এই দীক্ষার স্থানটি 'রাণীক্ষেত' হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে দ্বারাহাট পর্ব্বতমালার অন্তর্গত দ্রোণগিরি বা দুনাগিরি পর্ব্বতে।

দীক্ষার মাধ্যমে মহাযোগীর যোগজসংস্কারের প্রবুদ্ধিতে ভারতের অধ্যাত্ম সাধন জগতের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই যৌগিক সম্পদের পুনরুপলব্ধিতে যে কেবল মাত্র তাঁহারই জীবশিবৈকত্বের পথ প্রশস্ত হইল তাহা নহে, সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষেরও মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইল। তাঁহার দীক্ষা প্রাপ্তির সহিত ভাবীকালের মনুষ্যেরও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। জগতের

লক্ষ লক্ষ মানুষ যে সাধনার পথ পাইবে, কত সাধক সাধনপথ পাইবার আশায় আবার যে তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে, আবার ভারতের গৃহে গৃহে গীতাজ্ঞান প্রচারিত হইবে, দুর্লভ ঋষি প্রদর্শিত প্রাচীন যোগাভ্যাসের পন্থা আবার জনসমাজে সহজলভ্য হইবে, এইসব ভাবী কর্মের সম্ভাবনাগুলিও তাঁহার দীক্ষার সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। তাই তাঁহার দীক্ষার দিন হইতে জগতে সাধনজীবনের একটি নূতন দ্বারোদ্ঘাটন হইল।

তাহার পর হইতে শ্যামাচরণ প্রত্যহ অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া গুরু সন্নিধানে চলিয়া আসিয়া গুরু প্রদর্শিত পথে নিজেকে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত করিলেন। অল্প কয়েকদিনের সাধনার ফলেই তাঁহার জন্মান্তর সঞ্চিত যোগবিভূতির বিকাশ ঘটিতে লাগিল এবং বহু অনাস্বাদিত আনন্দ ও অজ্ঞাত রহস্যময়তত্ত্ব তাঁহার ধ্যাননেত্রে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি সাধনায় এবং গুরুপ্রেমে মসগুল হইলেন। জীবনযাত্রার পথে যাঁহার সঙ্গে দুদিন আগেও কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না, এখন তিনিই শ্যামাচরণের জীবনে এক নূতন জগতের সন্ধান দিয়া একান্ত আপনার হইয়া উঠিয়াছেন। যেন আপন জনের নিঃস্বার্থ প্রেম ও অনাবিল স্নেহের রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাবাজী এখন তাঁহার কত একান্ত আপনার।

শ্যামাচরণ তাঁহার গুরুদেবকে বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁহার অগণিত ভক্ত-শিষ্যরাও তাঁহাকে বাবাজী আখ্যা দিয়াছিলেন। সাধনার নেশায় আত্মবিস্মৃত শ্যামাচরণ সংসার, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সবকিছু ভুলিয়া এমনই সাধনায় বিভোর যে তিনি আর গুরুসন্নিধান ত্যাগ করিতে রাজি নহেন। অতীত জন্মে শ্যামাচরণ এই গুহায় অবস্থান করিয়া কঠোর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। ফলে বর্ত্তমান জন্মে অল্প কয়েকদিনের তীব্র সাধনায় তিনি সাধন রাজ্যের এক অতি উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া ঘর সংসার সবকিছু ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় একদিন বাবাজী তাঁহাকে জানাইলেন যে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি ঐ গুহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, কারণ ঐ জায়গা আস্তে আস্তে জনবহুল হইতেছে এবং সাধুদের বসবাসের অনুপযুক্ত হইতেছে। বিশেষ করিয়া যে কাজের জন্য তিনি এতদিন ঐখানে অবস্থান করিতেছিলেন তাহাও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবাজী যে কৌশলে তাঁহাকে এখানে আনিয়াছিলেন বিস্তারিতভাবে তাহাও বলিলেন। ঐ দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে অন্য একটি ক্লার্কের আসিবার ঠিক ছিল, কিন্তু বাবাজীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার পরিবর্ত্তে

শ্যামাচরণকে পাঠাইয়া দেন। বাবাজী আরও বলিলেন—যে কাজের জন্য তোমাকে এখানে আনয়ন করা হইয়াছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, এবার তোমাকে দেশে ফিরিতে হইবে। সেখানে তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে। কিন্তু শ্যামাচরণ আর দেশে ফিরিতে চাহেন না। তিনি বহু সৌভাগ্যে তাঁহার প্রিয়তম গুরুদেবকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তিনি বলিলেন - তিনি গুরু সন্নিধানে থাকিয়া বাকি জীবনটা কঠোর যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

বাবাজী বলিলেন—"তাহা হয় না শ্যামাচরণ। পরিপূর্ণ গৃহিরূপে তুমি সংসারে থাকিয়া কঠোর সাধনা করিয়া এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিবে। বহু লোক তোমার অপেক্ষায় আছে। সেই সমস্ত সৎ গৃহী মানুষদের তুমি মুক্তির পথ দেখাইবে। তুমি তাহাদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেকথা ভুলিলে চলিবে না। সংসারী মানুষ সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বর সাধনা করিতে চায়, কিন্তু সংসারী মানুষের জীবনে অনেক সমস্যা, সময় তাহাদের অল্প। তাই তোমাকে তাহাদের সহজ সরল আড়ম্বরহীন এবং অল্প সময়ে ফলদায়ক এই যোগ সাধনার পথ দেখাইতে হইবে। সেই জন্যই তোমার এই মর্ত্ত্যধামে আগমন, সে কথা ভুলিলে চলিবে না।"

শ্যামাচরণ নিবেদন করিলেন যে সংসারের কর্ম্মকোলাহলে তিনি কেমন করিয়া কঠোর সাধনা করিবেন? ইহা তাঁহার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, তিনি সময় পাইবেন না।

বাবাজী বলিলেন—"না শ্যামাচরণ, তুমি সংসারে ফিরিয়া গিয়া দেখ যথেষ্ট সময় পাইবে। যথা সময়ে তুমি কাশীতে বদলি হইয়া যাইবে ও বাড়া ভাত পাইবে। তুমি স্বয়ং সংসারে থাকিয়া সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে, তবেই তোমার আদর্শ সংসারী মানুষ গ্রহণ করিবে। আরও জানিয়া রাখ, সংসারকে ত্যাগ করা যায় না। কেহ কখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। মানুষ যেখানেই থাকুক সংসার তাহার সাথে থাকে। তাছাছাড়া সংসারী মানুষই পৃথিবীকে এত সুন্দর করিয়াছে, এত বিষয় বৈভব দিয়াছে। সংসারী মানুষ না থাকিলে পৃথিবী এত সুন্দর হইত না। সংসার না থাকিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট হইয়া যাইত। সকলেই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বর সাধনা কেবল মাত্র সংসার ত্যাগীদের জন্য হইতে পারে না। এই যে আমি সন্ন্যাসী হইয়াও যে পাত্রটির দ্বারা জল পান করিতেছি তাহাও সংসারী মানুষের অবদান।" দয়ার্দ্র হৃদয় বাবাজী আরও বলিলেন—"সংসারী মানুষ

ঈশ্বর সাধনার বিষয়ে আজ বড় নিরুপায়। তুমি নিজে সংসারে থাকিয়া তাহাদের সঠিক পথ দেখাইবে। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সংসারে ফিরিয়া যাও। মধ্যে মধ্যে তুমি আমার দেখা পাইবে এবং যখনই তুমি দেখিতে চাইবে আমাকে পাইবে। সংসারে সৎগৃহীর প্রতিষ্ঠা হউক।” তারপর বাবাজী নিকটস্থ কয়েকটি লোককে দেখাইয়া বলিলেন—“ইহাদের তোমাকে দীক্ষা দিতে হইবে। তোমার জন্যই ইহাদের এতদিন আটকাইয়া রাখিয়াছি।”

শ্যামাচরণ বলিলেন—“আপনি উপস্থিত থাকিতে উহারা আমার নিকট দীক্ষা লইবে কেন?”

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—“আমার সহিত উহাদের কোন দেনাপাওনার সম্বন্ধ নাই, তোমার সহিত আছে তাই তোমাকেই দীক্ষা দিতে হইবে।” কেমন করিয়া দীক্ষা দিতে হয় তাহা তিনি শিখাইয়া দিলেন। তারপর তাহাদের দীক্ষা হইল। এইভাবে বাবাজী সহজ যোগ সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও দীক্ষাদান সম্বন্ধে হাতে কলমে শ্যামাচরণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সংসারে ফেরত পাঠাইলেন। কারণ পরবর্ত্তিকালে লোকশিক্ষার জন্য বা লোককে মুক্তির পথ দেখাইতে ঐগুলি সব তাঁহাকেই করিতে হইবে।

রাণীক্ষেতে তখন শীত আসিয়া গিয়াছে। বাবাজীর নির্দ্দেশ মত শ্যামাচরণ রাণীক্ষেত হইতে বদলির জন্য ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়া জানাইলেন যে শীতপ্রধান পার্ব্বত্যদেশে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। চিকিৎসকের সার্টিফিকেটও তৎসহ পাঠাইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আবেদন মঞ্জুর হইল।

প্রচুর জলধারা বক্ষে ধারণ করিয়া নদী যেমন পর্ব্বত হইতে সমতলে নামিয়া আসে, শ্যামাচরণও তেমনি ক্রিয়াযোগ সাধনার সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। গুরু সন্নিধান হইতে তাঁহার বিদায়কালে হিমালয়ের বহু অসাধারণ সিদ্ধ সাধকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জানাইলেন। বৃদ্ধ পিতা তাঁহার যুবক পুত্রকে যেমন সব রকমভাবে যোদ্ধবেশে সাজাইয়া উদ্‌যুক্ত করিয়া রণাঙ্গনে পাঠাইয়া দেন, তেমনি বাবাজী মহারাজও শ্যামাচরণকে যোগ সাধনার গূঢ়-তত্ত্ব সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন, যাহাতে তাঁহার গায়ে সংসারের আঁচড়টি পর্য্যন্ত না লাগে।

যথাসময়ে শ্যামাচরণের বদলির আদেশ আসিল। এইবার তাঁহাকে

উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুর অফিসে যোগদান করিতে হইবে। রণসজ্জায় সজ্জিত শ্যামাচরণ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী অশ্রুসজল নেত্রে গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া মিরজাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। যাইবার প্রাক্কালে মানবপ্রেমিক শ্যামাচরণ গুরুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যেন এই সাধনা তিনি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট প্রচার করিতে পারেন। বাবাজী তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

মিরজাপুর আসিবার সময় তিনি কয়েকদিন মোরাদাবাদ শহরে অবস্থান করেন। এই সময়ে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। কয়েকজন বন্ধুর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিলেন—"বর্ত্তমানে তেমন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু নাই।" তাঁহারা কেহই জানিতেন না শ্যামাচরণের জীবনে কি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

শ্যামাচরণ বলিলেন—"একথা ঠিক নয়, এখনও তেমন মহাপুরুষ আছেন। আপনারা যদি দেখতে চান ত ধ্যানবলে আমি তেমন মহাপুরুষকে এখানে এনে দেখাতে পারি।" নবীন সাধক নিজেকে সংযত রাখিতে পারিলেন না।

বন্ধুদের কৌতুহল বাড়িয়া গেল। তাঁহারা বারংবার শ্যামাচরণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য অগত্যা তিনি রাজি হইয়া বলিলেন—"বেশ, আমাকে একটা নির্জ্জন ঘর দাও এবং উহার দরজা-জানালা সব বন্ধ রাখ।"

গুরুদেবের প্রতিশ্রুতি শ্যামাচরণের স্মরণে আসিল এবং সেই ভরসায় তিনি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া যোগাসনে বসিয়া গুরুচরণে আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অচিরে আবির্ভূত হইল এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ এবং উহা ধীরে ধীরে বাবাজী মহারাজের রূপ ধারণ করিল। পূর্ব্ব হইতেই আসন নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। তাহাতে উপবেশন করিয়া বাবাজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"শ্যামাচরণ, তোমার ডাকে সাড়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, সেইজন্য আসিয়াছি। কিন্তু নিছক তামাসাছলে আমাকে স্মরণ করা তোমার উচিত কাজ হয় নাই।"

নবীন সাধক শ্যামাচরণ তিরস্কৃত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বুঝিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই অসঙ্গত আচরণ হইয়াছে।

দৃঢ় কণ্ঠে বাবাজী বলিলেন—"ভবিষ্যতে তুমি স্মরণ করিলে আমাকে

সাক্ষাত পাবে না। যখনই তোমার প্রয়োজন হবে আমি স্বেচ্ছায় আসব।”

অন্যায়ের জন্য শ্যামাচরণ ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন—“অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনই আমার উদ্দেশ্য ছিল।” নতমস্তকে আবেদন জানাইলেন—“কৃপা করিয়া যখন আসিয়াছেন, তখন সকলকে একবার দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন।”

মহাযোগী রাজি হইয়া কক্ষের দ্বার খুলিতে বলিলেন। শ্যামাচরণ দ্বার খুলিয়া দিলেন। বন্ধুরা সকলেই বাহিরে অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহারা সকলে ঘরে প্রবেশ করিয়া মহাযোগীকে দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিয়া ধন্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধন-পথে।

এরপর শ্যামাচরণ কয়েক জায়গায় বদলি হইয়া দানাপুরে আসিয়া চাকরী করিতে লাগিলেন। এখানে অবস্থানকালে নিভৃতে তিনি কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি নিজেকে এত গোপন রাখিয়াছিলেন যে কেহই তাঁহার সাধনার বিষয় জানিতেন না। গুরু প্রদত্ত যোগসাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল। মহাযোগী বাবাজী মহারাজের কৃপাস্পর্শে তাঁহার জীবনে যে নূতন আলোকের সন্ধান মিলিয়াছে তাহাতে অধ্যাত্মজীবনের নূতন নূতন স্তরগুলি তিনি অনায়াসে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অফিসের দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে কঠোর সাধনায় রত রহিলেন। এ সময় তিনি যোগসাধনায় প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বল্পভাষী ও মধুরভাষী শ্যামাচরণ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। অলসতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সেইজন্য যোগসাধনার কঠোর শ্রম তাঁহাকে দুর্ব্বল করিতে পারে নাই।

শ্যামাচরণ এই সময় হইতে সর্ব্বদাই আত্ম চিন্তায় বিভোর থাকিতেন এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উদাসীন ভাব লক্ষিত হইত। সেইজন্য অফিসের বড় সাহেব আদর করিয়া এই বাঙ্গালীবাবুকে পাগলাবাবু বলিয়া ডাকিতেন।

একদিন শ্যামাচরণ তাঁহার বড় সাহেবকে খুবই বিষন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মেমসাহেব ইংলণ্ডে গুরুতর অসুস্থা, এমন কি জীবন রক্ষা হওয়াও কঠিন। কয়েকদিন যাবৎ সংবাদ না আসায় সাহেব বড়ই চিন্তিত।

মানবপ্রেমিক শ্যামাচরণের অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। দয়ার্দ্রহৃদয় নবীন সাধক নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিলেন না। সাহেবকে বলিলেন অনতিকালমধ্যে তিনি মেমসাহেবের সংবাদ আনিয়া দিবেন।

সাহেব দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন। ভারতীয় যোগীদের অনেক অলৌকিক কাহিনী তিনি শুনিয়াছেন। তবুও অবিশ্বাসী মনে

বিশ্বাস আসিতে চাহে না। অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন শ্যামাচরণের দিকে।

শ্যামাচরণ অফিসের এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কিছু সময় অতিক্রান্ত হইলে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া সাহেবকে জানাইলেন যে তাঁহার মেমসাহেব সুস্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার চিঠি অবিলম্বে আসিতেছে। চিঠির বিষয় বস্তুও তিনি তাঁহাকে জানাইলেন।

অবিশ্বাসী সাহেবের মন কি আর তাহাতে বিশ্বাস করিতে চায়? কয়েকদিন পর যথারীতি মেমসাহেবের চিঠি আসিল এবং তাহার বিষয় বস্তুর সহিত শ্যামাচরণের বক্তব্যের মিল দেখিয়া সাহেব অবাক হইলেন।

কয়েক মাস পর উক্ত সাহেবের স্ত্রী ইংলণ্ড হইতে দানাপুরে আসিয়াছেন। ইংরেজ মহিলারা অনেক সময় স্বামীর অফিসেও আসিয়া থাকেন। একদিন তিনি স্বামীর সহিত তাঁহার অফিসে আসিয়াছেন। হঠাৎ শ্যামাচরণকে দেখিতে পাইয়া তিনি চিনিতে পারিলেন এবং বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে বলিলেন তাঁহার রোগশয্যার পাশে এই মহাত্মাই দাঁড়াইয়াছিলেন এবং এঁরই কৃপায় তাঁহার রোগমুক্তি হয়।

পাগলাবাবুর এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া সাহেবের আনন্দ আর ধরে না।

কিছুদিন পর শ্যামাচরণ কাশীর অফিসে বদলি হন এবং গরুড়েশ্বরের বাড়িতে স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ বাস করিতে থাকেন। স্বামী এতদিন বিদেশে চাকুরীস্থলে থাকিতেন। মাঝে মাঝে কাশীতে আসিয়া সংসারে থাকিতেন। সাধ্বী স্ত্রী কাশীমণি দেবী সংসারের সকল দিক্ একাই সামলাইয়া চলিতেন। এখন স্বামী সংসারে আসিয়া বাস করিতেছেন বটে কিন্তু সংসারের কোন দিকেই তাঁহার বিশেষ খেয়াল নাই। বেতনের টাকা সবই ধরিয়া দেন স্ত্রীর হাতে। পতিপ্রাণা স্ত্রী 'এটা চাই ওটা চাই' বলিয়া স্বামীকে কখনও বিরক্ত করিতেন না। নিজ হস্তে রন্ধন করা, ছেলেদের স্কুলে পাঠান, কাহাকে কি টাকা-পয়সা দিতে হইবে সকল দিক্ তিনিই দেখিতেন। শ্যামাচরণ সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতেন, চাকুরী করিতেন বাকি সময়টা কঠোর যোগসাধনায় নিরত থাকিতেন। সাধ্বী কখনও স্বামীর সাধনপথে বাধা সৃষ্টি করেন নাই, বরং তাঁহার সাধনায় যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। শ্যামাচরণ নিগূঢ় যোগসাধনার স্তরগুলি

একের পর এক অতিক্রম করিয়া প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে তিনি লোককে দীক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। কেদারেশ্বর মন্দিরের দ্বারে ফুলমালা বিক্রয় করিত এক মালী। তাহাকেই তিনি প্রথম দীক্ষাদান করেন। ফুল ফুটিলে অলিকুল নিজ হইতেই মধুলোভে আসিয়া হাজির হয়। তেমনি আস্তে আস্তে দুই-চারিটা করিয়া মুমুক্ষু নরনারী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে যোগাচার্য্যের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

স্বামী যোগসাধনায় প্রভূত উন্নতিলাভ করিলেও এ বিষয়ে কাশীমণি দেবী সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। একদিন গভীর রাত্রে কাশীমণি দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া আলো জ্বালাইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঘরের এক পার্শ্বে শূন্যে পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। স্বামীর এই অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া কাশীমণি দেবীর অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। করজোড়ে পার্শ্বে বসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। না জানিয়া কতদিন কত অন্যায় করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর স্বামী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে কাশীমণি দেবী স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া যোগদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পরদিন কাশীমণি দেবী যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কাশীমণি দেবী বাল্যাবধি প্রায় সব স্থূল পূজা করিতেন। তাঁহার পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, সেজন্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্থূল পূজার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি স্থূল পূজা করিতেন এবং যোগকর্ম্মও করিতেন। শ্যামাচরণ স্থূল পূজা করিতেন না। কিন্তু তিনি কখনও স্ত্রীকে স্থূল পূজা করিতে নিষেধ করিতেন না। যাহার যাহাতে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস বজায় রাখিতে বলিতেন, বরং উৎসাহ দিতেন এবং সেই সাথে যোগকর্ম্মও করিতে উপদেশ দিতেন। (তিনি বলিতেন যোগের উপর ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠিত। বিনা যোগসাধনায় আত্মদর্শন সম্ভব নয়। আবার আত্মদর্শন ব্যতিরেকে আত্মসংবিত্তি হয় না এবং আত্মসংবিত্তি ব্যতিরেকে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। মোক্ষ প্রাপ্তিই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য)

ধীরে ধীরে তাঁহার ভক্ত সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মুচি ভগবান্ দাস, গিরিধারী চামার, কনষ্টেবল বিন্দা হালুয়াই সহ ফেরিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া নামী-দামী ব্যক্তি এমন কি কত রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত তাঁহার

কৃপালাভ করিতে লাগিলেন। তিনি সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ থাকায় কখনও কোন সভায় দাঁড়াইয়া ভাষণ দেন নাই। কোন ভক্ত প্রচারের কথা বলিলে তিনি বলিতেন সূর্য্য উঠিলে কি ঢাক ঢোল পিটাইয়া লোককে জানাইতে হয়? যাহার দৃষ্টি আছে সে দেখিতে পাইবেই। তেমনই আত্মধর্মের প্রচার নিষ্প্রয়োজন। যাহার যখন প্রয়োজন হইবে বা প্রাণ কাঁদিবে, সে আপনা হইতেই চলিয়া আসিবে। যেখানে প্রকৃত কিছু থাকে না সেখানেই প্রচার প্রয়োজন হয়। তিনি কোন মঠ মিশন বা আশ্রম স্থাপন করেন নাই। সন্ন্যাস অপেক্ষা গার্হস্থ্যকেই তিনি বেশী মর্য্যাদা দিতেন।

কিছু কিছু সাধক আছেন যাঁহাদের চলার পথ এবং সাধনার মধ্যে বিশেষ কিছু পরিলক্ষিত হয়। জোয়ারের মধ্যে গা ভাসাইয়া তাঁহারা চলেন না। যে সব মহাত্মাদের মধ্যে নূতনত্ব থাকে তাঁহাদেরই সকলে মহাপুরুষ আখ্যা প্রদান করেন। শ্যামাচরণও যোগপথে এইরকম নূতনত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের বৃদ্ধ শ্বশুর বাচস্পতি মহাশয় নিষ্ঠাবান্ বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনিও শ্যামাচরণের অপূর্ব্ব যোগসিদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া জামাইয়ের নিকট হইতে যোগদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আর জামাই সম্বোধনে ডাকিতেন না। আদর করিয়া "যোগিরাজ" বলিয়া ডাকিতেন। সেই হইতে ধীরে ধীরে তিনি "যোগিরাজ" বলিয়া পরিচিত হন। যোগিরাজের এক বিখ্যাত পণ্ডিত ভক্ত দেওঘরের পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে "কাশীর বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বর্ত্তমানে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে "বড়বাবা" বলিয়া সম্বোধন করেন।

বৃদ্ধ শ্বশুর দেবনারায়ণ বাচস্পতি প্রায় শতায়ুঃ হইয়া পরলোক গমন করেন। বাচস্পতি মহাশয় মৃত্যু শয্যায় শায়িত আছেন। কাশীমণি দেবীর বড় ইচ্ছা যোগিরাজ পরলোকযাত্রী বৃদ্ধ শ্বশুরকে একবার প্রণাম করিয়া আসেন। কাশীমণি দেবী তাঁহার সেই ইচ্ছা প্রকাশও করিলেন, কিন্তু যোগিরাজ কিছু না বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যোগিরাজ মৃত্যুপথযাত্রী শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু প্রণাম না করায় কাশীমণি দেবী ব্যথিত হইলেন। দেবনারায়ণও যোগিরাজের প্রণাম লইতেন না।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টম্বর মাসে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তখন তাঁহার মাসিক পেন্‌শন ধার্য্য হইয়াছিল ঊনত্রিশ টাকা চার আনা ছয় প্যাই। এই সামান্য অর্থে তাঁহার সংসার চালাইতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি কাশীরাজ ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহের পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহকে শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়াইবার জন্য গৃহ-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল ত্রিশ টাকা। প্রতিদিন রাজার নৌকা আসিয়া যোগিরাজকে লইয়া যাইত গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত রামনগরের রাজপ্রাসাদে। বর্ষার সময় গঙ্গায় জল বাড়িলে রাজপ্রাসাদেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইত। রাজা স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রাজা শ্যামাচরণের সকল শাস্ত্র বিশেষ করিয়া বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনায় বড়ই প্রীত হইলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে অধিকতর কিছু জানিতে উৎসুক হইলেন। যোগিরাজ সব সময় নিজেকে গোপন রাখিতেন। যোগিরাজের এক সহপাঠী বন্ধু গিরীশচন্দ্র দে মহাশয় কাশী রাজএষ্টেটে উচ্চপদে চাকুরী করিতেন। সেজন্য রাজার সহিত তাঁহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। একদিন কথাচ্ছলে গিরীশবাবু রাজাকে বলিলেন—"শ্যামাচরণ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি সিদ্ধ মহাযোগী।"

রাজা বলিলেন—"তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান শুনিয়া সেই রকমই অনুমান করিয়াছিলাম। এখন তোমার কথায় বিশ্বাস হইল।" ইহার পর রাজা ও তাঁহার পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন।

* * * *

শ্যামাচরণের তিন কন্যা হরিমতী, হরিকামিনী ও হরিমোহিনী। কাশীমণি দেবী জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিমতীর বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। বিবাহের দিনও স্থির হইল, কিন্তু বিবাহ দেবার মত অর্থ কোথায়? কাশীমণি দেবী সেকথা স্বামীকে জানাইলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"চিন্তা করিয়া কোন লাভ নাই, যাঁহার চিন্তা তিনিই করিবেন। যথাসময়ে অঙ্গদ সবকিছু আনিবে!"

কয়েকদিন পর কাশীরাজ লোক মারফৎ সুদৃশ্য জরির বটুয়ার ভিতর কতকগুলি মোহর পাঠাইলেন যোগিরাজের নিকট তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য।

ইহাতে শ্রীভগবানের সেই অমোঘ বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হইল—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম॥[১]

অর্থাৎ (অন্য কিছু চিন্তা না করিয়া যিনি আমাকেই (আত্মাকে) উপাসনা করেন আমি তাঁহার পার্থিব এবং অপার্থিব সব ভারই বহন করি।)

যোগিরাজের এই জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল ঢাকা জেলার লটাখোলা গ্রামের রামচরণ মৈত্র[২] মহাশয়ের সহিত। পরে মধ্যমা কন্যা হরিকামিণীর বিবাহ হইয়াছিল বঙ্গদেশের পাবনা জেলার ভারাঙ্গা নামক গ্রামের গঙ্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের সহিত এবং কনিষ্ঠা কন্যা হরিমোহিণীর বিবাহ হইয়াছিল বিষ্ণুপুরে কাদাকুলির রামময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত।

যোগিরাজের সাধারণতঃ কোন অসুখবিসুখ হইত না। প্রকৃতই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। এই সময় গ্রীষ্মকালে তিনি একবার অর্শরোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু অল্প চিকিৎসাতেই তাঁহার রোগমুক্তি ঘটে।

যোগিরাজ ধুতি ফতুয়া ও পাঞ্জাবী পরিধান করিতেন। ফিতে দেওয়া কাপড়ের জুতা ব্যবহার করিতেন এবং বাড়িতে খড়ম ব্যবহার করিতেন। সে জুতা আজও রক্ষিত আছে। তিনি সকালে জলখাবার খাইতেন না। একটু ঘি ও চিনি খাইয়া জলযোগ করিতেন। মধ্যাহ্নে ভাত খাইতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন। দুধ বেশী খাইতেন। প্রতিদিন রাত্রে আহারাদির পর হুঁকাতে একবার তামাক সেবন করিতেন। সেই সময় বাড়ির লোকদের সহিত কিছুক্ষণ আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। তাঁহার দেহের উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। আজানুলম্বিত বাহুযুগল। শরীরের নিম্নাঙ্গ ছিল ধপ্‌ধপে সাদা, শাঁক আলুর মত। মধ্যাংশ ছিল গোলাপী রঙের এবং মস্তক ও মুখমণ্ডল ছিল দুধে-আলতা রঙের। খুবই আকর্ষণীয় তাঁহার চেহারা ছিল। তিনি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইলে যাহারা তাঁহাকে চিনিত না তাহারাও তাঁহার আকর্ষণীয় চেহারা দেখিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়া পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইত। প্রথম দিকে অনেক সময় সারারাত যোগসাধন করিতেন এবং শেষের দিকে ভোর রাত্রে উঠিয়া সাধন করিতেন।

(১) গীতা ৯।২২

(২) শ্রীপঞ্চমী ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ রাত্রে রামচরণ মৈত্র মহাশয় পরলোক গমন করেন।

তারপর সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পুনরায় সাধন করিতেন। সকালে সাধারণতঃ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না।

যোগিরাজের এক ভক্ত মটরু, কাশীতে তাহার ছোট একটি দরজীর দোকান ছিল। মটরু প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় আসিয়া যোগিরাজের উপদেশ শ্রবণ করিত। মটরু গরীব ছিল বলিয়া যোগিরাজের কোন সেবা করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার সেবা করিবার বড়ই ইচ্ছা। তাই মটরু প্রতিদিন দুই খিলি ভাল সাজা পান আনিয়া যোগিরাজকে দিত। যোগিরাজও দুইবেলা আহারাদির পর সেই পান আনন্দে সেবন করিতেন। মটরু যোগিরাজকে এইভাবে সারাজীবন পান খাওয়াইবে ইহা সে জীবনের একটি ব্রত করিয়া লইয়াছিল। যোগিরাজের দেহত্যাগের পরও মটরু দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সে প্রতিদিন দুই খিলি ভাল সাজা পান লইয়া আসিয়া যোগিরাজের পাদুকার উপর রাখিয়া দিয়া সেখানে বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাইত। সেই সময় আত্মনিমগ্ন মটরুর দুই নয়নে অশ্রুধারা নামিয়া আসিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যোগারূঢ়

তিনি সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে নারায়ণ দর্শন করিতেন। কোন দর্শনার্থী বা ভক্ত প্রণাম করিলে তিনি প্রত্যভিবাদন জানাইতেন। কিন্তু কেহ তঁাহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করুক ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না।

কোন ব্রহ্মজ্ঞানী তঁাহার সাধনার উপলব্ধির বিষয় দৈনন্দিন দিনপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এমন জানা যায় না। যোগিরাজ এইরকম ছাব্বিশখানি দিনপঞ্জি রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। তিনি বাঙলা অক্ষরে এবং হিন্দী ভাষায় দিনপঞ্জিগুলি লিখিয়াছেন। ইহাতে তঁাহার সাধনার ক্রমোন্নতি বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। তিনি সাধনার এমন এক উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন যাহা আজও তাহার দিনলিপিগুলি দেখিলে বোঝা যায়। তঁাহার দিনলিপির এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"ময় কুছ নাহি ওহি সূর্য্যহি জো কুছ হয় বিলকুল মালিক উহ ছোড়ায় দুসর কুছ নাহি উসকা রূপ নিচে লিখা দেখ।"

অর্থাৎ আমি কিছুই নই, ঐ আত্মসূর্য্যই সবকিছু, সম্পূর্ণ মালিক। সেই আত্মসূর্য্য ছাড়া আর কিছুই নাই। তঁাহার রূপ নীচে লিখিলাম।

ইহার পর একটি মানুষের মুখাকৃতি অঙ্কন করিয়া উহার কপালের উপর লিখিয়াছেন **"হম শ্যামাচরণ সূর্য্য।"**—আমিই সেই শ্যামাচরণ আত্মসূর্য্য।

অপর এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"ওহি সূর্য্য উসিকা জ্যোত সমেত ওহি মহাপুরুষ ব্রহ্ম হয়—বড়া আনন্দ —আব বড়া মজা হুয়া, অব বিলকুল স্বাসা ভিতর চলতা হয় ইসকে বরাবর আনন্দ কোই দুসরা বাত নহি ইসিকা নাম চিদানন্দ—এহি ব্রহ্ম —এত্তেরোজ বাদ আজ জন্ম সফল।"

অর্থাৎ জ্যোতি সমেত সূর্য্য (আত্মসূর্য্য) তিনিই মহাপুরুষ ব্রহ্ম। বড় আনন্দ। এখন বড়ই মজা (আনন্দ) হইল। এখন শ্বাস সম্পূর্ণ ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। এমন আনন্দ আর অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না। ইহারই নাম চিদানন্দ, ইনিই ব্রহ্ম। এতদিন পরে আজ জন্ম সফল হইল।

অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়া সুষুম্নাবাহী হয় তখনই এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই তিনি বলিতেছেন এই অবস্থার মত আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। এই শাশ্বত আনন্দে স্থিতিলাভ করিয়া তিনি বলিতেছেন এতদিন পর আজ মনুষ্য জন্ম সফল হইল, অর্থাৎ তিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন।

আরও লিখিয়াছেন—**"আপনাহি স্বরূপ নারায়ণকা দেখা। মহাদেব ও পার্ব্বতী আদমি কা রূপ দেখা পার্ব্বতী হমে চুমা দিয়া।"** অর্থাৎ আপন স্বরূপ নারায়ণকে দেখিলাম। মনুষ্যরূপে মহাদেব ও পার্ব্বতীর রূপ দেখিলাম। মাতৃভাবে পার্ব্বতী আমাকে চুমা দিলেন। অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজেকে ও নারায়ণকে এক দেখিতেছেন।

এই ধরনের বহু লেখার মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটি অবিকল তুলিয়া দেওয়া হইল। ইহা হইতে বোঝা যায় তিনি সাধনার কত উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন।

তাঁহার এক ভক্ত কনষ্টেবল বিন্দা হালুয়াই সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া বলিতেন—"বিন্দা সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসছে।"

অবসর গ্রহণের পর হইতে এই আচার্য্য বরিষ্ঠের বৃহত্তম ভূমিকা শুরু হয়। গুরুকৃপায় অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী হইয়াও এই মহাযোগী গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মুখ্যতঃ গৃহীদের মধ্যে যোগসাধনার প্রচার করিতেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শুরু করিয়া বহু নীচ জাতীয় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এমন কি রাজা মহারাজা হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন। দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী, কাশীর ভাস্করানন্দ সরস্বতী, নানক-পন্থী সাইদাস বাবা[১] সহ অনেক ত্যাগী সন্ন্যাসীও তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া ধন্য হন।

কাশীরাজ ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহ মাঝে মাঝে তৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সহিত দেখা করিতে যাইতেন। রাজা একদিন ভাস্করানন্দের কাছে এই গৃহী মহাযোগীর অনেক প্রশংসা করায় ভাস্করানন্দ তাঁহার সহিত

(১) আমেদাবাদ জেলার শিরডির মহাযোগী সাইবাবা সম্ভবতঃ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহত্যাগ করেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর। তাঁহার জীবন চরিতে দেখা যায় তিনি ছিলেন কবীরপন্থী। তিনি কখনও কাশীতে আসিয়াছেন এমন কথাও জানা যায় না। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের দিনপঞ্জিতে লিখিত আছে তিনি নানকপন্থী সাইদাসবাবাকে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা দিয়াছেন। জানা

সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি সন্ন্যাসী হওয়ায় গৃহীর বাড়িতে যাইয়া দেখা করা অনুচিত ভাবিয়া রাজাকে অনুরোধ করেন তিনি যদি গৃহিযোগীকে অনুরোধ করিয়া একবার তাঁহার কাছে আনিতে পারেন। সেইমত কাশীরাজের অনুরোধে যোগিরাজ প্রথমে রাজি হন নাই। শেষে বহু অনুরোধের পর রাজি হন এবং কাশীরাজ তাঁহার নিজের ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া যোগিরাজকে লইয়া যান ভাস্করানন্দের কাছে। মিলন হইল দুই মহামানবের। ভাস্করানন্দ গৃহিযোগীর সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিলেন এবং খুশী হইয়া তাঁহার সাধন পদ্ধতি পাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার এক বন্ধু মাঝে মাঝে মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করিতে যাইতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যোগিরাজের শিষ্য ছিলেন। একদিন দুই বন্ধু যোগিরাজকে অনুরোধ করিলেন তৈলঙ্গ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য। যেগিরাজ সম্মত হওয়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যোগিরাজকে লইয়া গেলেন তৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট। কাশীধামে তখন স্বামীজীর বিপুল খ্যাতি। চলমান শিব নামে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মৌন স্বামীজী বসিয়া আছেন তাঁহার পঞ্চগঙ্গা ঘাটের আশ্রমে। চারিদিকে ভক্তগণ উপবিষ্ট। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত

যায় শিরডির সাইবাবা কখনও তাঁহার গুরুর নাম কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার নামোল্লেখ করিতেন 'ভেনকুশ' এই ছদ্মনামে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁহার নিকট আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। ধর্মমত এবং সাধন পদ্ধতির দিক্ থেকে উভয়ের মধ্যে অনেকাংশে মিল দেখা যায়। অবশ্য শিরডির সাইদাসবাবা যে সত্যই কবীরপন্থী ছিলেন এমন নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অপর দিকে লাহিড়ী মহাশয়ের জীবিতকালে ভারতবর্ষে একমাত্র শিরডির সাইদাসবাবার নামই পাওয়া যায়, অপর কোন সাইবাবার নাম পাওয়া যায় না। শিরডির সাইবাবা প্রকৃত কোথাকার মানুষ ছিলেন তাহাও সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎই তিনি শিরডি গ্রামে আসিয়াছিলেন। কবীরপন্থী বলিয়া তাঁহার জীবনীতে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাও কতটা সঠিক নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, কারণ সাইবাবা সবকিছুই গোপন রাখিতেন। সে কারণে হয়ত শিরডির সাইদাসবাবাই লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা পাইয়া থাকিতে পারেন এবং তিনি হয়ত কবীরপন্থী না হইয়া নানকপন্থীও হইতে পারেন।

শ্যামাচরণকে আসিতে দেখিয়া স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিশাল বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ে উভয়কে প্রত্যভিবাদন শেষে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই মহাযোগীর এই মিলন দর্শনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেমাশ্রু নামিয়া আসিল। তাহার পর তাঁহারা আপন আপন গন্তব্যস্থল অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজীর নিকট উপস্থিত ভক্তেরা যোগিরাজকে চিনিতেন না। তাঁহারা কখনও স্বামীজীকে কাহাকেও প্রেমালিঙ্গন করিতে দেখেন নাই। তাঁহারা উৎসুক হইয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় মৌন স্বামীজী একটি শ্লেট-পেন্সিলে লিখিয়া দিলেন—"যাঁহাকে পাইবার জন্য সাধুদের কৌপিনটাও ত্যাগ করিতে হয়, এই মহাত্মা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও তাঁহাকেই পাইয়াছেন।"

স্বামীজীর নিকট উপস্থিত ভক্তদের মধ্য হইতে একজন কৌতূহলপরবশ হইয়া পরদিন যোগিরাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে গোপালবাবুকে ইহা বলিয়াছিলেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীজীর এই স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহিযোগী শ্যামাচরণ মানবসমাজে অবিলম্বে পরিচিত হইয়া পড়েন। শিবক্ষেত্র কাশীধামের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যোগিরাজের অলৌকিক লীলা প্রসারিত হইতে লাগিল। পতঙ্গের মত জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্বিবশেষে সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষ আসিতে লাগিল। তিনিও পতিতপাবনের ন্যায় অকৃপণ হস্তে সকলকে কৃপা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি চাহিতেন সকলে গৃহে থাকিয়া অধ্যাত্মপথে উন্নতি করুক। কেহ সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন। বুঝাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। বলিতেন—"সন্ন্যাস জীবন বড় কঠিন। কোন কারণে ভুল করিলেও সংসারীর ক্ষমা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ক্ষমা নাই। সন্ন্যাসীর বেশভূষায় আধ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ থাকে, কিন্তু আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক, নীরব গৃহী সাধকের অনাড়ম্বর সাধনায় বহিঃপ্রকাশ নাই।" অবশ্য তাঁহার সংসার ত্যাগী শিষ্যও অনেক ছিলেন। তিনি সকল জাতির মানুষকে হিন্দুধর্ম্মের পরম গুহ্য এই যোগক্রিয়া দীক্ষা দিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার সমালোচনা করিতেন। তিনি স্মিতহাস্যে তাঁহাদের বলিতেন—"আমি ব্রাহ্মণের মধ্যে চণ্ডাল দেখি, আবার চণ্ডালের মধ্যে ব্রাহ্মণও দেখি। সৌভাগ্যক্রমে একটি ভাল পথ পাইয়াছি। যখন মানুষের

ভিতর মানুষ দেখি আর সে যদি জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাকে বলিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

কাশীর প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী দণ্ডিস্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, যিনি গৃহস্থাশ্রমে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনিও যোগিরাজের কৃপালাভে ধন হন। কাশীতে অহল্যাবাঈ ঘাটের নিকট বিশুদ্ধানন্দ মঠে তিনি থাকিতেন। যোগিরাজের মহাপ্রয়াণের পরও বহুদিন তিনি জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশুদ্ধানন্দজী বড়ই শারীরিক কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার এই অসুস্থতার জন্য যোগিরাজ-পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। ঐ সময় তাঁহার সেবার প্রতি কিছু অবহেলাও হইতেছিল। তাই একদিন তিনি তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এখন দেখছি গৃহস্থাশ্রমই ছিল ভাল।" এইরূপে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী গৃহস্থাশ্রমকেই উচ্চ মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যোগিরাজকে দর্শন করিবার মানসে চুঁচুড়া আদালতের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও যোগিরাজের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সমভিব্যাহারে কাশীধাম আসিয়া রংপুরের কাকিনা ষ্টেট ঠাকুরবাড়িতে অবস্থান করেন। উক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট পরে জানা যায় যে ঐ সময় তাঁহারা যোগিরাজের নিকট হইতে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উদয়পুরের রাজার ভাই এবং সেখানকার এক শ্বেতকুষ্ঠ রোগী তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে দেখা যায় তিনি রোগমুক্ত হইয়া সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের শ্যামাচরণ লাহিড়ী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যোগিরাজের নিকট ১৫ই অক্টোবর ১৮৮৮ খৃঃ দীক্ষা প্রাপ্ত হন। যোগিরাজের জীবদ্দশায় উক্ত শ্যামাচরণের দেহত্যাগ হইলে সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ভক্ত ভুল বুঝিয়া কাশীতে যোগিরাজের বাড়িতে চিঠি লিখিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর্যজীবন

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শাস্ত্রবিধি ও যোগাচারের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা অনুসারে ভারতীয়গণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে যোগসিদ্ধিও লাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারিতেন। শরীর জীর্ণ হইলে তাঁহারা যৌগিক প্রক্রিয়ায় তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত অনায়াসে ত্যাগ করিয়া নবীন শরীর ধারণ করিতেন। এই পারম্পর্য্যের গতি মহাকবি কালিদাসের সময় পর্য্যন্ত যে অব্যাহত ছিল, সে তথ্য আমরা তাঁহার "যোগেনান্তে তনুত্যজাম্" কথাটি হইতে পাইয়া থাকি।

যোগিরাজ বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা সহ বহু ধর্ম্মগ্রন্থের আধ্যাত্মিক যৌগিক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা সমূহ ছিল অপূর্ব্ব। সেগুলি সাধারণের বোধগম্য না হইলেও সাধকদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষ করিয়া গীতার এইরূপ সাধন রহস্যপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক যৌগিক ব্যাখ্যা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। পূর্ব্বে গীতা সাধারণতঃ পণ্ডিত মহলেই আলোচিত হইত। সাধারণের মাঝে উহা তেমন প্রচারিত ছিল না। তিনি গীতাকে মানুষের অধ্যাত্মমার্গের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন গীতা ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ। তাই তিনি গীতার সহস্রাধিক গ্রন্থ ছাপাইয়া ভক্তদের মাঝে বিতরণ করেন। প্রতিদিন তিনি গীতা ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার ঐ অপূর্ব্ব গীতা ব্যাখ্যায় বহু ভক্ত আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেন। পূর্ব্বে বহু মহাত্মা গীতাকে বহুভাবে দেখিয়াছেন। কেহ দ্বৈতবাদ, কেহ অদ্বৈতবাদ, কেহ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ ইহার মধ্যে জ্ঞানের প্রাধান্য, কেহ ভক্তির প্রাধান্য, কেহ বা কর্ম্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু গীতা যে একখানি পূর্ণাঙ্গ যোগশাস্ত্র এই দৃষ্টিতে খুব কম মনীষীই উপলব্ধি করিয়াছেন। গীতাতে ১৮টি অধ্যায়ের সবই যোগ। বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আরও দেখা যায় গীতার প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে "ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ইত্যাদি।" অতএব গীতা ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগশাস্ত্র। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যেমন কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ প্রসিদ্ধ, তেমনি যোগমার্গও আর একটি প্রসিদ্ধ পথ। প্রাচীনকালে ঋষিরা যোগমার্গের অধিক সমাদর করিতেন। গীতায় সর্ব্বত্র যোগের কথাই পরিলক্ষিত হয়। এই পন্থায় বিজ্ঞান সম্মতভাবে তত্ত্বকথা আলোচিত হইয়াছে। ইহা কেবল আলোচনাত্মক শাস্ত্র মাত্র নহে, ইহাতে আধ্যাত্মিক মার্গের সাধনোপযোগী কর্ম্ম ও তাহার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন, কারণ যোগী ব্যতীত অপর কেহ গীতাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে সক্ষম নহেন। গীতা সাধনা ও অনুভবের গ্রন্থ। অতএব কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি যিনি যে পথেই সাধনা করুন না কেন সবই যোগ। যোগ ছাড়া সাধনা হয় না। যোগ অর্থাৎ মিলন। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটানই যোগ অর্থাৎ যুক্ত করান। সব সাধকের একই উদ্দেশ্য—জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন ঘটান।

যোগিরাজের স্বহস্ত লিখিত গীতা সহ কয়েকখানি গ্রন্থের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[১] অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যখন ভক্তদের নিকট বলিতেন তখন পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, প্রসাদদাস গোস্বামী ও মহেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়গণ উহা লিখিয়া রাখিতেন। পরে তাঁহারা নিজ নিজ নামে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত করেন। যোগিরাজ তাঁহার নামে কোন গ্রন্থই প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রোজনামচায় বৈশেষিক দর্শনের এক অপূর্ব্ব যোগশাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দেখা যায়।

তাঁহার গীতা ব্যাখ্যা ছিল অপূর্ব্ব। যেমন গীতায় বলা হইয়াছে "শ্রীভগবান্ উবাচ।" তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে সকলেই উহার ভাষ্য করিয়াছেন

---

(১) যোগিরাজ নিম্নলিখিত ২৬ খানি গ্রন্থের যৌগিকভাষ্য করিয়াছিলেন :— (১) গীতা (২) বেদান্ত দর্শন (৩) গৌতম সূত্র (৪) অষ্টাবক্র সংহিতা (৫) সাংখ্য-দর্শন (৬) ওঁকার গীতা (৭) গুরু গীতা (৮) তেজবিন্দু উপনিষদ্ (৯) ধ্যানবিন্দু উপনিষদ্ (১০) অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ (১১) অবিনাশী কবীরগীতা (১২) কবীর (কবীরের দোঁহাবলী) (১৩) মীমাংসার্থ সংগ্রহ (১৪) নিরালম্বোপনিষদ্ (১৫) চরক (১৬) চণ্ডী (১৭) লিঙ্গপুরাণ (১৮) তন্ত্রসার (১৯) যন্ত্রসার (২০) জপজি (নানক-সাহেবকৃত আদি গ্রন্থ) (২১) বৈশেষিক দর্শনম্ (২২) পাতঞ্জল যোগসূত্র (২৩) মনুসংহিতা বা মনুরহস্য (২৪) পাণিনীয় শিক্ষা (২৫) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (২৬) অবধূত গীতা।

"শ্রীভগবান্ বলিলেন।" কিন্তু যোগিরাজ তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন "কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছে।" ইহা সম্পূর্ণ নূতন এক অনুভবীয় ভাষ্য। কূটস্থই সব। কারণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥[১]

অর্থাৎ ক্ষর এবং অক্ষর নামে ইহলোকে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন। তাহার মধ্যে সমুদায় ভূতগণ ক্ষর বা নশ্বর এবং কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর বা অবিনশ্বর পুরুষ বলিয়া উক্ত হন।

এই কূটস্থটি কি তাহার বর্ণনা পূর্ব্বে কেহ করেন নাই। অবশ্য ইহা বর্ণনাগম্য নহে, সাধনলব্ধ অনুভূতিগম্য। উহা কেবল যোগিগণই জ্ঞাত আছেন। কূট শব্দের অর্থ নেহাই। অর্থাৎ যে লৌহপীঠের উপর কর্ম্মকার বা স্বর্ণকারগণ লোহা বা সোনা পেটাই করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ারী করেন, কিন্তু নেহাই যাহা তাহাই থাকে। নেহাইয়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, উহা নির্ব্বিকার। তেমনি কূটস্থকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত জগৎ বর্ত্তমান। সকলেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু কূটস্থের কোন পরিবর্ত্তন নাই, তিনি অবিনাশী। অর্থাৎ যাহা ত্রিনয়ন, তুরীয়দৃষ্টি, জ্ঞানচক্ষু তাহাই কূটস্থ। এই কূটস্থে যোগীর স্থিতিপ্রাপ্তি হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তাঁহার জ্ঞাত হয়, সবকিছু প্রকাশ বা অনুভব হয়। উহাই সবকিছুর উৎসস্থল ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রকাশস্থল। এইখানে স্থিতিপ্রাপ্তি হইলেই যোগী নিজেই নিজের কাছে সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর পাইয়া থাকেন। আপনা হইতেই তাঁহার নিকট সকল প্রশ্নের উদয় হয় ও তাহার মীমাংসাও হইয়া যায়। দূরবীনের সাহায্যে যেমন বহু দূরের বস্তু লক্ষিত হয়, তেমনি কূটস্থে স্থিতিলাভ হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা যায়। অর্জ্জুন তেজস্তত্ত্ব, সেই তেজস্তত্ত্বের দ্বারা যোগীর অভ্যন্তরে জিজ্ঞাসিত হইতেছে ও কূটস্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ইহা যোগীমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন বলিয়া গীতা অনুভবের গ্রন্থ। তাই তিনি উহার ভাষ্যে বলিয়াছেন "কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইতেছে।" যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া যোনিমুদ্রার দ্বারা আজ্ঞাচক্রে স্বর্ণাভা বেষ্টিত, মাঝে কাল ও তন্মধ্যে বিন্দু স্বরূপ এক চক্ষু লক্ষিত হয়। পরে উহা কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ আভা ধারণ করিয়া যোগীকে 'আমি

(১) গীতা ১৫।১৬

হারা' করাইয়া দেয়। উহাই 'সুদর্শন চক্র', উহা দর্শন করিলে যোগীর সমস্ত পাপরাশির ছেদন হয় বা হরণ হয় বলিয়া তিনিই হরি। তিনিই পাপরাশির হরণকর্ত্তা! সুদর্শন অর্থাৎ সুন্দর দেখিতে। মাঝে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ, তন্মধ্যে নিশ্চল তারকা বিশিষ্ট বলিয়া ধ্রুব। তিনিই তারকনাথ। ইহাতে স্থিতিপ্রাপ্তি ঘটিলে যোগীর ধ্রুব জ্ঞান হয়। উহা গগন সদৃশ বলিয়া গগনগুহা বলা হয়। উক্ত স্থানে স্থিতি প্রাপ্তি ঘটিলে যোগী সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত হয়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—"ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম।"[১] এই কূটস্থই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ অবিনাশী পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কূটস্থরূপ "সুদর্শন চক্র" দর্শনে যোগীর বিরুদ্ধ ভাবগুলি অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষীয় অসুরগণের ছেদন পূর্ব্বক নাশ হয়। তখন যোগী নিবৃত্তি পথে চলিতে সমর্থ হন।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া তুলসীদাস বলিয়াছেন—

জগু পেখন্ তুম্হ্ দেখনিহারে।
বিধি হরি শম্ভু নাচাও নিহারে॥
তেঁউ ন জানহিঁ মরমু তুমহারা।
ঔরু তুমহহি কো জাননিহারা॥[২]

জগৎ দৃশ্যমান এবং তুমিই দ্রষ্টা; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে তুমিই নাচাও। তাঁহারাও (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ) তোমার মর্ম্ম জানেন না, তাহা হইলে অন্য কে তোমাকে জানিতে সমর্থ।

তুলসীদাস বলিতেছেন এই জগৎ দৃশ্যমান এবং তুমিই দ্রষ্টা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে তুমিই নাচাইতেছ অর্থাৎ সত্ব রজ তম এই তিন গুণই, তিন দেবতা। ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা অর্থাৎ রজোগুণ, মহেশ্বর নিধন কর্ত্তা অর্থাৎ তমোগুণ এবং বিষ্ণু পালন কর্ত্তা অর্থাৎ সত্বগুণ। এই তিন গুণের পরিচালক তুমিই, কারণ দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত এই তিন গুণ প্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত। প্রাণ না থাকিলে উক্ত তিন গুণও থাকে না। প্রাণের অস্তিত্বে উহাদের অস্তিত্ব। তাই বলিতেছেন এই তিন গুণকে তুমিই নাচাও। অর্থাৎ হে আত্মারাম, এই তিন দেবতার ভিতরে তুমি কূটস্থচৈতন্যরূপে বিরাজিত, তাই ইঁহারাও তোমাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে সমর্থ নহেন।

---

(১) মহাভারত বনপর্ব্ব, বক-যক্ষ সংবাদ।
(২) রামচরিতমানস, অযোধ্যাকাণ্ড।

তাহা হইলে অন্য সকলে অর্থাৎ উক্ত প্রধান তিন গুণ ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে কিরূপে জানিবে? তুমিই আত্মারামরূপে অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্যরূপে সকল দেহে বিরাজিত। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন—"নিজরূপ বিন্দি সভোঁসে হয়।"—নিজরূপ বিন্দু সকলের ভিতরেই বর্ত্তমান)

আবার এই কূটস্থকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা কবীর বলিতেছেন—

মরতে মরতে জগ মরা,
মরনা না জানে কোয়।
এ্যায়সা মরনা কোই না মরা,
যো ফির না মরনা হোয়॥
মরনা হ্যায় দুই ভাঁতি কা,
যো মরনা জানে কোয়।
রামদুয়ারে যো মরে,
ফির না মরনা হোয়।

জগৎবাসী মরিয়াই চলিয়াছে কিন্তু কেমন করিয়া প্রকৃত মরিতে হয় তাহা কেহ জানিল না। এমন মরা কেউ মরিল না যাহাকে আর পুনরায় না মরিতে হয়। মৃত্যু দুই প্রকারের; অবশ্য যদি কেহ মরিতে জানে। একটি সাধারণ মৃত্যু, অপরটি অসাধারণ মৃত্যু। রামদুয়ারে যে মরে পুনরায় তাহাকে আর মরিতে হয় না। কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই রামদুয়ারটি কি? কোন রামমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এমন মন্দির দুয়ারে কি তিনি মরিতে বলিতেছেন? যদি কেহ তেমন মন্দির দুয়ারে মৃত্যু বরণ করেন তাহা হইলে কি তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইবে না? এমন কথা মহাত্মা কবীর বলেন নাই। কূটস্থের মধ্যবর্ত্তী যে বিন্দু তাহাকে গগনগুহা বলা হয়। যাঁহারা সাধনপথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা ইহা দেখিতে পান। তিনিই আত্মারাম বা রামদুয়ার, তিনিই আত্মনারায়ণ, তিনিই সকল দুঃখের নাশ করেন বলিয়া দুর্গতিনাশিনী। ঐ বিন্দুরূপী রামদুয়ার দর্শন করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন তেমন মহাত্মার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাই মহাত্মা কবীর আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন জগৎবাসীর কয়জন সেই রামদুয়াররূপ কূটস্থ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

যিনি করেন তিনি জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে রেহাই পান। যোগিরাজ বলিয়াছেন—

"জানা জানা সব কোই কহতে,
জানাকো নহি জানা হয় ;
জানা উহিঁকা জঁাহাসে,
ফির লোট নহি আনা হয়।
জিসকি লাগি লগন ইসসে,
ওহি ওয়াকিফ হয় উস ঘরসে॥"

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ
মূর্দ্ধ্ন্যাধ্যায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥[১]

অর্থাৎ প্রয়াণকালে স্থিরচিত্তে ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগবল দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে ধারণ পূর্ব্বক যিনি স্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে প্রাপ্ত হন। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া, মনকে নিরালম্বে স্থির করিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করিয়া একাক্ষর ব্রহ্মনামরূপ ওঁকার ক্রিয়া করিতে করিতে আমাকে (কূটস্থকে) স্মরণ পূর্ব্বক যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন—**"মরণে ওক্ত যো জয়সা ভাওএ সোই ওয়সা হোয়। আপ সৎ চিত্তানন্দ হয় আপরূপ হয়।"** দেহত্যাগ করিবার সময় যে যাহা চিন্তা করে পরবর্ত্তী জীবনে সে তাহাই হয়। প্রকৃতপক্ষে তুমি সৎ চিত্তানন্দ ও নিজরূপ।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন—**"জ্যোতিষ্মন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সুখং রথং সুষদং ভূরিবারং"**[২] কূটস্থ ব্রহ্ম তাঁহার তিন চক্র, প্রথমে জ্যোতিচক্র, পরে

(১) গীতা ৮।১০, ১২, ১৩

(২) ঋগ্বেদ্ ৭ অষ্টক ৪ অধ্যায় ২৯ ঋচা।

কৃষ্ণচক্র এবং মধ্যে নক্ষত্রচক্র। এই ত্রিচক্রে থাকিলে সুন্দররূপে ব্রহ্মে থাকা যায়। এই ত্রিচক্ররূপ রথে আরোহণ করিয়া চলিলে ব্রহ্মে থাকা হয়। অনেকবার সূর্য্য দর্শনের পর কোটি সূর্য্যের উদয় হয় তখন সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়। **"গুহায়দি কবিণা বিশাং নক্ষত্র শবসাং।"**[১] কূটস্থের মধ্যে যে নক্ষত্র স্বরূপ গুহা তাহাতে স্থিতিপ্রাপ্তি হইলে যোগীর অলৌকিক কথা বলিবার ক্ষমতা হয় ও সর্ব্বদা সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ নক্ষত্র স্বরূপ দেখে। উহাই তারকনাথ। **"অক্ষরং বিন্দু জ্যোতি মন্বে হবিষ্মহে। পরসূর্য্যেতি শা সহ পরমগুহ্য।"**[২] সেই কূটস্থ অক্ষর তাহার মধ্যে যে নক্ষত্র স্বরূপ বিন্দু জ্যোতি তিনিই সার ব্রহ্ম, তাঁহারই সদা হবন করা উচিত। পরে যে বৃহৎ সূর্য্য তাহার মধ্যে পুরুষোত্তম নারায়ণ যিনি সকল পতির কর্ত্তা তাঁহার সহিত লীন হওয়া সে পরম গুহ্য। যোগিরাজ বলিয়াছেন—**"ক্রিয়ার দ্বারায় চক্ষু উন্মিলন হয়—তাহাতেই বলিয়াছে—চক্ষুউন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"**

সকল জীবদেহে এক চিৎ অণু অর্থাৎ চেতনপূর্ণ অণু বর্ত্তমান। উহা সূক্ষ্মাদপীসূক্ষ্ম। সেই চেতন অণু হইতে যে জ্যোতির্ম্মন্ডল প্রকাশিত তিনিই কূটস্থ।

যোগিরাজ তাঁহার দৈনন্দিন উপলব্ধির বিষয় যাহা দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিতেন সেখানে কূটস্থের বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—**"ভুলোনা ভুলোনা তারে সে ঘন সৃষ্টি সংহারে, সর্ব্বদা আছে সম্মুখে দেখোনা দেখোনা তারে। সদা স্মরণ কর ওঁকারের তারে।"** অর্থাৎ সেই কূটস্থ যিনি সৃষ্টি হইতে সংহার পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই ঘন কৃষ্ণবর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহাকে কখনও ভুলি না। তিনি সর্ব্বদা সকলের সম্মুখে আছেন, তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখ এবং ওঁকার ক্রিয়ার মাধ্যমে সর্ব্বদা স্মরণ কর। তাই তিনি বলিতেন গীতাকে যদি জানিতে চাও তাহা হইলে নিজ দেহরূপ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ কর) দেহের বাহিরে গীতাকে জানা যায় না। দেখ গীতার প্রথম শ্লোকেই ভগবান বলিয়াছেন—**"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে...।"** এখানে ভগবান্ দুইটি ক্ষেত্রের কথা বলিয়াছেন, একটি ধর্ম্মক্ষেত্র অপরটি কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্র। সকল প্রকার ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম-

(১) ঋগ্বেদ্ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২৫ ঋচা।

(২) ঋগ্বেদ্ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ২৫ ঋচা।

এই দেহরূপ ক্ষেত্র দ্বারাই সম্পাদিত হয়। দেহ ব্যতীত ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। অতএব এই দেহই একাধারে ধর্ম্মক্ষেত্র এবং কর্ম্মক্ষেত্র। এই দেহই যে ক্ষেত্র সেকথা ভগবান্ ঐ গীতাতেই বলিয়াছেন—"**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।**"[১] তাই গীতাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে দেহরূপ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে, তবেই গীতার মর্ম্ম সঠিক জানা যাইবে। গীতা ভারতের প্রাণস্বরূপ। গীতা সম্পূর্ণরূপে যোগশাস্ত্র এবং অধ্যাত্ম গ্রন্থ। এই প্রকারে গীতাকে জানিতে পারিলে মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করা যায়। পাখী পড়ার মত পড়িয়া কি লাভ হইবে? গীতাকে জানা প্রাণকর্ম্মরূপ সাধন সাপেক্ষ। কুরুপক্ষ অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষ—যে বন্ধনরূপ কর্ম্ম করায় এবং পাণ্ডবপক্ষ অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষ। এই দুই পক্ষের যুদ্ধ জীব হৃদয়ে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে, সুতরাং গীতার যুদ্ধও অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। মহাত্মা রামপ্রসাদও সেই কথা বলিয়াছেন—

("প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
বিবেক নামে তারই ব্যাটা,
তত্ত্বকথা তারে শুনাবি।")

* * * * *

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত আছে পরমতীর্থ শিবক্ষেত্র কাশীধামে যাহার দেহত্যাগ হয় তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। এই বিশ্বাসে এক ভক্ত বৃদ্ধাবস্থায় কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং জীবনে অনেক অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি একাকী একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করিতেছিলেন। প্রায়ই তিনি আসিয়া যোগিরাজের গীতা ব্যাখ্যা শুনিতেন। তিনি যোগিরাজ অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলেন। একদিন পাঠ শেষ হইলে উঠিয়া গিয়া তিনি যোগিরাজকে প্রণাম করিলেন। যোগিরাজ বলিলেন—"আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রণাম করিবেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আজ পর্য্যন্ত গীতার বহু প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি এবং

---

(১) গীতা ১৩।২

পড়িয়াছি, কিন্তু এমন ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আজ হইতে আমি আপনার ভক্ত।"

একদিন যোগিরাজ বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন এবং এক বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীখণ্ড ব্যাখ্যা করিতেছেন। "কাশীতে মরিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না" এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় কিছু সন্দেহজনক কথা বলিলে বৃদ্ধ উঠিয়া গিয়া করজোড়ে পণ্ডিতের নিকট বলিলেন—"এমন কথা বলিবেন না, এই শিবধামে আসিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনিতেছি। আপনি এমন কথা বলিলে আমার বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইবে।"

বার্দ্ধক্যহেতু ঐ ভক্ত বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বের মত আর তেমন চলাফেরা করিতে পারেন না। বাড়ির মালিক এক বৃদ্ধা একদিন আসিয়া যোগিরাজকে বলিলেন—"ঐ ভদ্রলোক যদি বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে কে দেখিবে?" তিনি ঘর না ছাড়ায় বৃদ্ধা বড়ই মুশকিলে পড়িয়াছেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"আমি কি করব? তিনি ত আমার কাছে থাকেন না।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"তিনি আপনার নিকট প্রতিদিন পাঠ শুনিতে আসিতেন, সুতরাং আপনিই ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

যোগিরাজ বিরক্তস্বরে বলিলেন—"আপনাকে দেখিতে হইবে না, যাঁহার দেখা কর্ত্তব্য তিনিই দেখিবেন।"

খবর আসিল ভক্তটি মুমূর্ষু। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি একবার যোগিরাজের দর্শন প্রার্থী।

যোগিরাজ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। যাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ বলিলেন—"দয়া করে আপনার চরণদুটি আমার মাথায় ঠেকান।"

যোগিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এ আপনি কি কথা বলছেন. বরং মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনিই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

দুই হাত তুলিয়া প্রাণভরিয়া বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সজ্ঞানে কাশীলাভ করিলেন।

নিজে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও এইভাবে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান বজায় রাখিতেন এবং গৃহীর সকল সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতেন।

যোগিরাজ বলিতেন সকলেরই উচিত মনকে স্থির করা। মন স্থির না করিতে পারিলে সাধন হয় না, সংসার কর্ম্মও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। মানুষ

অমানুষ হইয়া যায়। প্রাণ চঞ্চল বলিয়াই মন চঞ্চল। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহির্মুখী বলিয়াই মন বাহিরের দিকে ধাবিত হয়। যোগকর্ম্মের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অন্তর্মুখী হইলে মনও অন্তর্মুখী হয় ও স্থির হয়। স্থির মনের দ্বারায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঈশ্বর সত্তা নিরূপিত হয়। তাই তিনি গীতোক্ত রাজযোগের অন্তর্গত "সহজ কর্ম্ম" করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন। বিশেষ করিয়া তিনি চাহিতেন যাহাতে সকল যুবক এই কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহাদের জীবন সুন্দর হইবে। তিনি ক্রিয়াযোগের প্রতি যুবকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেন। কারণ তিনি বলিতেন অল্প বয়সে এই যোগকর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে সাধন করিবার মত দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় এবং অধ্যাত্মপথে ইহ জীবনেই চরম সাফল্যলাভ করা যায়। তিনি বলিতেন— ঈশ্বর সাধনা কর বা নাই কর মনের অধীনে না থাকিয়া মনকে নিজ অধীনে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনকে লইয়াই সব। যোগকর্ম্ম ছাড়া মনকে স্ববশে রাখা যায় না। ঈশ্বর সাধনা করিবার মত মন যদি নাও থাকে তাহা হইলেও এই কর্ম্ম সকলেরই করা উচিত। কারণ এই কর্ম্ম করিলে মন স্ববশে থাকে। পুরাকালে ঋষিগণও এই কর্ম্ম করিতেন। যোগিরাজ পুনরায় সেই ঋষি প্রদর্শিত পথই সংসারী মানুষের নিকট পুনঃ স্থাপনা করিলেন।

এই "সহজ কর্ম্মটি" কি? এ বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন— "**সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।**"[১] সহজ অর্থাৎ easy নহে। সহজ অর্থাৎ যাহা জন্মের সহিত পাওয়া গিয়াছে। যাহা পাইবার জন্য কোন প্রকার কর্ম্ম বা চেষ্টা করিতে হয় নাই। জীব জন্মগ্রহণ করিবার সাথে সাথে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুই নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকে ততক্ষণই জীব জীবিত থাকে। ইহাই সারা জীবনের সাথী। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া মীরাবাঈ বলিয়াছেন "মেরে জনম মরণকে সাথী, তুঁহে না বিশরো দিন রাতি।" জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সাথী যে শ্বাস-প্রশ্বাস তাহাকে যেন কখনও বিস্মরণ না হই। এই শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ সহজ কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম, আত্মকর্ম্ম বা প্রাণায়াম তাহাকে ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন। এই সহজ কর্ম্ম অনভ্যাসের দরুন প্রথম প্রথম যদি দোষযুক্তও হয় তবুও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। করিতে করিতে ঠিক হইয়া যাইবে। ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন।

(১) গীতা ১৮।৪৮

যোগিরাজ কাহাকেও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উপদেশ দিতেন না। বরং বলিতেন সংসারে থাকিয়াই যোগসাধনা করিতে। বলিতেন, সংসারে থাকিয়াই যোগসাধনার মাধ্যমে ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সংসারাশ্রম পালন করিতে। শাস্ত্রসম্মত এই যোগসাধনের মাধ্যমে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। তাহা হইলেই ধীরে ধীরে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। ঐ শুদ্ধ চিত্তে প্রেম ভালবাসা শান্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি আসিবে। তখন বিশ্বচৈতন্যের সহিত একীভূত হইয়া হিংসা দ্বেষ রহিত হইয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষে রূপান্তরিত হইবে। প্রাণই ত সব। তিনিই শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠের সহিত মিলিত হইলে তবেই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়। তিনি গার্হস্থ্য জীবনকে অব্যাহত রাখিয়া সুদীর্ঘকাল যোগসাধনা করিয়া যোগক্রিয়া অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগক্রিয়া সাধনের প্রেরণা দিয়া যোগসাধনার বীজ বপন করিয়াছিলেন।

যেগিরাজের শ্যালক রাজচন্দ্র সান্যালের পুত্র তারকনাথ একজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক। একবার তিনি এক কঠিন পেটের রোগে আক্রান্ত হইলেন। দীর্ঘ চিকিৎসাতেও রোগের উপশম হইল না দেখিয়া শেষে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কানপুর গিয়া পিতার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কানপুরে অবস্থানকালে সেখানকার এক ব্যক্তি তারকনাথকে বলিলেন—"ঔষধের দ্বারায় তোমার এ রোগ উপশম হইবে না। যদি তুমি কোন মহাত্মার কৃপালাভ করিতে পার তাহা হইলে অচিরে রোগ উপশম হইতে পারে।" তিনি আরও বলিলেন—"গোরখপুরে তেমন এক মহাত্মা আছেন। অবিলম্বে সেইখানে যাইয়া তঁাহার কৃপা লাভের চেষ্টা কর।"

তারকনাথ গোরখপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় তঁাহার পিতার বন্ধু সবকিছু শুনিয়া বলিলেন—"তোমার বাড়িতেই মহাত্মা রয়েছেন, আর তুমি যাচ্ছ অন্য জায়গায় মহাত্মা খুঁজতে?"

তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার বাড়িতে আবার মহাত্মা কোথায়? আমি ত কোন মহাত্মার কথা শুনি নাই।"

পিতার বন্ধু বলিলেন—"তোমার পিসামহাশয় শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে চেন না? তিনিই এক মহাত্মা। তঁাহার কৃপা লাভ করিবার চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে।"

তারকনাথ আশ্চর্য্য হন। তাঁহার পিসামহাশয় একজন মহাত্মা এমন কথা তিনি পূর্ব্বে কখনও শোনেন নাই। কতবার তাঁহার বাড়ি আসিয়াছেন,

তাঁহার সহিত কত কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মহাত্মার মত তিনি কিছুই দেখেন নাই।

তারকনাথ কাশী ফিরিয়া আসিলেন। পিতাকে সঙ্গে লইয়া পিসামহাশয়ের সহিত দেখা করিলেন।

পিসামহাশয় সবকিছু শুনিয়া তারকনাথকে এক টোটকা ঔষধ দিলেন। তারকনাথ উহা ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। তারপর তারকনাথ যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সাধনার নেশায় মত্ত হইলেন। কোন প্রকার উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন না দেখিয়া পিসামহাশয় তাঁহাকে সাধনা কম করিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন—"সাধনাও করতে হবে, আবার নিজের রোজগারে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হবে। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন চালান উচিত নয়। নিজের সংসার নিজেই চালান উচিত।"

এই তারকনাথ পরে ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক হইয়াও সাধনার উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইহা হইতে বোঝা যায় যোগিরাজ নিজেকে কত গোপন রাখিতেন।

কাশীরাজ ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহ বৃদ্ধ হইয়াছেন। বার্দ্ধক্যহেতু অসুস্থ হইয়া পরলোক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। গঙ্গার অপর পারে রামনগরে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। কথিত আছে কাশীধামের অপর পারে ব্যাসকাশীতে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা পরবর্ত্তী জীবনে গর্দ্দভ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই আশঙ্কায় কাশীর মূল ভূখণ্ডে রাজবংশের একটি প্রাসাদ আছে। রাজবংশের যাহার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কাশীর প্রাসাদে আনয়ন করা হয়। ঈশ্বরী প্রসাদও তাই কাশীর প্রাসাদে আসিয়া পরলোক গমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। একদিন তিনি লোক মাধ্যমে তাঁহার গুরুর নিকট খবর পাঠাইলেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একবার তাঁহার দর্শন প্রার্থী। যদি একবার কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন।

যোগিরাজ সব শুনিয়া বলিলেন—"আমি আর বিশেষ কোথাও যাই না ; আচ্ছা দেখা যাবে।"

রাজা পরলোক গমন করিলেন। যোগিরাজের শ্যালক পুত্র তারকনাথ সান্যাল কয়েকদিন পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজার বড় ইচ্ছা ছিল আপনাকে দর্শন করতে, কিন্তু আপনি একবার দেখা দিলেন না ?"

যোগিরাজ মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"স্থূল শরীরে আর কোথাও যেতে পারি না, রাজা দর্শন পেয়েছেন, কোন চিন্তা নেই।"

এই উত্তরে উপস্থিত সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলেন।

যোগিরাজের এক ভক্ত ডাক্তার গোবর্দ্ধন দত্ত জাহাজে ডাক্তারের চাকুরি করেন। জাহাজে করিয়া নানান দেশে যাইতে হয়। জাহাজ যখনই কলিকাতা বন্দরে ফিরিয়া আসে তখনই তিনি কাশী যাইয়া স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন করেন। এই রকম একবার তিনি কাশীধাম আসিয়া যোগিরাজকে প্রণাম করিয়া পাশে বসিলেন।

যোগিরাজ স্নেহভরে বলিলেন—"এত দূর থেকে কষ্ট করে আস কেন? এতে ত তোমার কষ্ট হয়, অর্থও ব্যয় হয়।"

গোবর্দ্ধনবাবু মিনতি স্বরে বলিলেন—"জাহাজে চাকরি করি, জলে জলে ঘুরে বেড়াই। যখন জাহাজ কলিকাতা বন্দরে লাগে ছুটে আসি আপনাকে দর্শন করতে। জাহাজে থাকি বলে শুচিতাও ঠিকমত থাকে না, সাধন-ভজনও নিয়মিত করতে পারি না। এ অধমকে কৃপা করুন যেন স্মরণমাত্র আপনার দর্শন পাই।"

যোগিরাজ মাথা দোলাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকেন।

পরবর্ত্তীকালে গোবর্দ্ধনবাবুর নিকট শোনা যায় জাহাজে চলার সময় যখনই তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিতেন তখনই তিনি তাঁহার দর্শন পাইতেন। গোবর্দ্ধনবাবু শেষ জীবনে কাশীবাসী হইয়াছিলেন এবং সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যোগিরাজের বাড়ির অনতিদূরে থাকিত ভৈরব। সে যোগিরাজকে প্রতিদিন দাড়ি কামাইয়া দিত এবং গৃহের অন্যান্য কাজও করিয়া দিত। ভৈরবের সামান্য মাথার গোলমাল থাকায় কেহই আর তাহার নিকট চুল-দাড়ি কাটিত না, সকলেই ভয় পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু যোগিরাজ তাহাকে কোনদিনও পরিত্যাগ করেন নাই।

একদিন যোগিরাজ মধ্যাহ্নে আহারের জন্য নীচের বৈঠকখানা ঘর হইতে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন। সেই সময় ভৈরবও এক ঘড়া জল লইয়া আগে আগে উঠিতেছিল। সে যোগিরাজকে উঠিতে দেখিয়া সিঁড়ির একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং যোগিরাজ নিকটে আসিতেই 'হর হর মহাদেব' বলিয়া সেই ঘড়ার জল তাঁহার মাথায় ঢালিয়া দিল।

যোগিরাজ কিছুই বলিলেন না, একটু মুচকি হাসিয়া উপরে চলিয়া গেলেন এবং কাপড় বদলাইয়া ফেলিলেন।

অমরানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক ভক্ত যোগিরাজের বাড়িতেই থাকিতেন। তিনি ইহা দেখিয়া খুবই চটিয়া গেলেন, কিন্তু কিছু ব্যক্ত করিলেন না। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও বৈকালে যোগিরাজ গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। সেই সময় অমরানন্দ ভৈরবকে একটি থামে বাঁধিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। ভৈরব চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চিৎকারে কাশীমণি দেবী ছুটিয়া আসিলেন এবং ব্রহ্মচারীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"যাঁর মাথায় জল ঢেলে দিল, তিনি কিছুই বলিলেন না। আপনি কেন ওকে বেঁধে মারছেন ? ওর মাথার ঠিক নেই, ও তো জেনেশুনে কিছু করে নি।"

রামমোহন দে আইন পরীক্ষা দিবার সময় মানত করিয়াছিলেন যে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারিলে গরুড়েশ্বর মহাদেব এবং যোগিরাজকে দুগ্ধের দ্বারা স্নান করাইবেন। উক্ত পরীক্ষায় পাস করিবার পর তিনি যথারীতি গরুড়েশ্বর মহাদেবকে দুগ্ধস্নান করাইলেন এবং যোগিরাজের বাড়িতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার স্নানের সময় আমি আপনাকে দুধ দিয়ে স্নান করাব।"

যোগিরাজ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামমোহন তাঁহার মানতের কথা ব্যক্ত করিলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"গরুড়েশ্বর মহাদেবকে স্নান করিয়েছ, তাতেই হবে। আমাকে স্নান করাবার প্রয়োজন নেই।"

রামমোহন কাতর প্রার্থনা করিয়া পুনরায় বলিলেন "আমি মানত করেছি, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। আমি পরে আপনাকে ভাল জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেব।"

অবশেষে যোগিরাজ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

যোগিরাজ প্রায়ই সারারাত্র ধরিয়া ক্রিয়াসাধন করিয়া প্রাতঃকালে রাণামহল ঘাটে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তাঁহার পরমভক্ত কৃষ্ণারাম সঙ্গে থাকিত। যখন স্নান করিতে যাইতেন তখন তিনি ক্রিয়ার নেশায় বুঁদ হইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে পথ চলিতেন। পথিপার্শ্বে একটি পানের দোকান ছিল। যোগিরাজের এই মাতাল অবস্থা দেখিয়া ঐ দোকানদার কৌতুক করিয়া প্রায়ই বলিত - "আজ চড়ল বা। দেখো বাঙ্গালী বাবুকা কাম, সুবা সুবা

কেত্না চড়ল বা।" অর্থাৎ সকাল সকাল এই বাঙালিবাবু মাদকের নেশায় কত মত্ত হইয়া আছেন।

পরবর্ত্তিকালে দেখা যায় ঐ পানওয়ালা তাঁহার অনুগত ভক্তে পরিণত হইয়া সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

যোগিরাজ স্থূল পূজা করিতেন না। কোন দেব-দেবীর মন্দিরেও যাইতেন না। সর্ব্বদা আত্মধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। কেবল রবিবারে কাশীর বটুক ভৈরব দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ব্রহ্মজ্ঞ, আপনি কেন বটুক ভৈরব দর্শন করিতে যান?"

যোগিরাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি যদি না যাই তোমরা যাবে কেন?"

যোগিরাজ ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। উপদেশ দিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"শাস্ত্র কাহাকে বলে?"

শোন, শাস্ত্র অনন্ত। তবে সাধারণতঃ শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায় এবং বেদানুগত স্মৃতি-পুরাণকেও শাস্ত্র বলে। যাহা অজ্ঞাত, শাস্ত্র তাহার জ্ঞাপক। যাহা আছে, অথচ আমরা জানি না, শাস্ত্রই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জানিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিধি বা সাধনা আছে। বেদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই আছে। কর্ম্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে লোকে কর্ম্ম করিয়া স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ করে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড অন্যরূপ, তাহার দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করে। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড ছাড়া জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশলাভ করা যায় না। তাই বেদ সর্ব্ব পথের প্রদর্শক। বেদজ্ঞান অর্থাৎ ধ্রুব বা সত্য জ্ঞান ব্যতীত জীবের মুক্তি হইতে পারে না। যাহারা শুভকর্ম্ম করে না, বা করিলেও শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করিয়া করে; তাহারা সুখ, সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র অনন্ত, তাহার বিধিও অনন্ত। সুতরাং সকলেই যে সকল শাস্ত্র পালন করিয়া চলিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাহারা এত পরস্পর বিরুদ্ধ যে তাহা সকলের পক্ষে মানিয়া চলা সম্ভব নয়। আবার সব বিধি সকলের জন্যও নহে। কাহার পক্ষে কোন্ বিধি উপযুক্ত হইবে তাহা বলিয়া দিতে হইলেও

শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আবার কেবল মাত্র শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও চলিবে না, জিজ্ঞাসুর পক্ষে কোন্ বিধি সঠিক হইবে তাহা বুঝিতে হইলে অধিক স্মৃতিশক্তি আবশ্যক। কিন্তু তাহা সকলের থাকে না। সেই ধারণাবতী বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি এমন হওয়া চাই যাহার দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। ইহা সাধকের কঠোর সাধনার ফলে লাভ হয়। তাহাকে আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। সুতরাং বাহ্যভাবে কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশীলনে কোন প্রকার ফল লাভ হয় না। সেইজন্য বহু শাস্ত্র আলোচনার নিষেধ করা হইয়াছে। যিনি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কিন্তু আত্মবিষয়ক ধ্যান ধারণাদি করেন না, আত্মদর্শী নহেন, তাঁহার শাস্ত্রপাঠ অমূলক শ্রম মাত্র। কিন্তু যিনি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ আত্মনিষ্ঠ তাঁহার শ্রম সার্থক।

শাস্ত্র বহু, জানিবার বিষয়ও অনন্ত, কিন্তু পরমায়ু অল্প। সুতরাং সকল শাস্ত্রের যাহা সারাংশ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

শাস্ত্র অর্থে বেদ, বেদ অর্থে জ্ঞান। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ। স্বতঃ প্রকাশিত স্র্য্যের সাময়িক আবরণ যেমন মেঘ, তেমনি জ্ঞানের সাময়িক আবরণ অজ্ঞান। মেঘ সরিয়া গেলে যেমন স্র্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি অজ্ঞান সরিয়া গেলে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। সুতরাং যাহা সত্য তাহার কোন ব্যাভিচার হয় না। তেমনি আমরা জানিতে না পারিলেও সত্যস্বরূপ আত্মার কোন বিকার হয় না, উহা সর্ব্বদাই একরূপ। কিন্তু এই এক-স্বরূপ আত্মার দর্শন হয় না কেন? স্র্য্যের কোলে মেঘের মত, সত্যজ্ঞানের কোলে অজ্ঞানরূপ আবরণ। মেঘ সরিয়া গেলে যেমন স্র্য্য দেখা যায়, তেমনি অজ্ঞান সরিয়া গেলে সত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ হয়। তাহা হইলে ইহা ঠিক যে আমাদের জানিবার পূর্ব্বেও স্র্য্যের মত তাঁহার স্বতঃপ্রকাশ ছিল। চেষ্টার ফলে অজ্ঞানের আবরণ সরিয়া যায় মাত্র। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রানুশীলন আবশ্যক। সেই শাস্ত্র কি? শাস্ত্র অর্থে যাহা শাসন বা আজ্ঞা করে। কাহার শাসনে এই শরীর চলিতেছে? "বায়ুর্ধাতা শরীরিনাম্"—বায়ুই এই শরীরের শাসক। বায়ুর শক্তিতেই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সব চলিতেছে। তাহার মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রধান। অতএব বায়ুই শরীরের শাসন কর্ত্তা বা শাস্ত্র। শাস্—শ্বাস, স্ত্র—অস্ত্র। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ অস্ত্রই শাস্ত্র। এই শ্বাসরূপী অস্ত্র চালনা করিয়া যিনি দক্ষতা বা পটুতা অর্জ্জন করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়াছেন তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ এইগুলিকেও শাস্ত্র বলা

হয়। কারণ এই প্রকারে শ্বাসরূপী অস্ত্র চালনা করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছেন সেই সকল ঋষিগণ তাঁহাদের অনুভূতির বিষয় যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতিও শাস্ত্র পদবাচ্য। তাই এগুলিও প্রামাণিক। এই শ্বাসরূপী শাস্ত্রের শরণাগত হইলে সমগ্র প্রকৃতি তাহার অধীন হয়। তখন তাহার প্রকৃতি-পুরুষ অবগত হইয়া নানাত্ব চলিয়া যায় এবং জন্ম-মরণ রহিত হয়। এই প্রাণযজ্ঞরূপ শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারিলে আত্মোন্নতি লাভ হয়, অভীষ্ট ভোগ প্রদান করে। সেইজন্যই ইহাকে বলা হয়—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥[১]

এই আত্মবিদ্যা অন্যান্য সকল বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, গুহ্য হইতেও গুহ্যতম এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। ইহা অপেক্ষা পবিত্র আর কিছু নাই। এই আত্মবিদ্যা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট বোধগম্য এবং ধর্ম্মসম্মত। ইহা বিজ্ঞান সম্মত হওয়ায় সুখে ও আরামে করা যায়, সেকারণে ইহা অক্ষয় অর্থাৎ এই সাধনের কখনও ক্ষয়প্রাপ্তি হয় না।

(প্রাণবায়ু চঞ্চল হইয়া মনকে উৎক্ষিপ্ত বা চঞ্চল করে এবং সেই মনের দ্বারা বিষয় ভোগ হয়। বায়ু স্থির হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম দর্শন হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ু স্থির হইলে অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। এই বায়ুর সাধনাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। বায়ু সকলের শাসক বলিয়া উহার ক্রিয়া সম্বন্ধীয় যে নিয়ম বা বিধি আছে তাহাই শাস্ত্রবিধি। এই বায়ুর ক্রিয়াকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে। এই ক্রিয়া দ্বারা মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত বিশ্বচৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে বেদজ্ঞান হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাই যথাক্রমে প্রধান তিন বেদ। বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে বেদাতীত জ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ সহস্রারে স্থিতি হয়। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"[২] বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি গুণাতীত হও। এই বেদ-বিধি অর্থাৎ এই আত্মবিদ্যারূপ বায়ুর ক্রিয়া দ্বারাই ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা লাভ হয়। এই বেদ-বিধি হইল ষট্‌চক্রের ক্রিয়া। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়কে জানিলে আর

(১) গীতা ৯।২
(২) গীতা ২।৪৫

যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তেমনি ষট্‌চক্রপথে প্রাণায়াম ক্রিয়া করিলে একপ্রকার বিশেষ স্থিতিলাভ হয়, ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম বা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কেহ নাই। তখন আর কোন প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক থাকে না, কারণ যে কর্ম্ম করিবে সে আর নাই। ইহাকেই বলে কর্ম্মের অতীত অবস্থা। কর্ম্মের অতীতাবস্থায় যোগীকে যাইতেই হইবে। ক্রিয়া করাই কর্ম্মযোগ বা বেদপাঠ। এই কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আত্মদর্শন লাভ হয় তখন সাধকের আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যে স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ হয় তাহাই ভক্তিযোগ এবং শেষে ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকা অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় পৌঁছিয়া অবস্থান করা তাহাই জ্ঞানযোগ বা তাহাই জ্ঞানের অর্থাৎ বেদের অন্ত হওয়ায় বেদান্ত। কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ এগুলি স্বতন্ত্র যোগ নহে, এগুলি যোগীর যোগসাধনার ক্রম বিশেষ। সঠিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে ভক্তির উদয় হয় না, ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না। তাই এগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, কেহ স্বতন্ত্র যোগ নহে। সাধারণ ব্যক্তিই কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র যোগ ভাবিয়া থাকে)

মনকে ষট্‌চক্রের মধ্যে না রাখিয়া বাহিরের বস্তুতে রাখিলে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করা হয়। এইজন্য প্রথম প্রথম শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥[১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, শান্তি ও পরমাগতি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। অতএব শাস্ত্রের সারাংশ কাহার নিকট পাওয়া যায়?

মহিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রমশ্নন্তি পণ্ডিতাঃ॥[২]

চারিবেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া সারাংশ যোগীরা খাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট অসারভাগ লৌকিক পণ্ডিতগণ পান করেন। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন—"দুধ খির খায় সকলে চাঁচি ছেলেমানুষ অর্থাৎ সাধকেই

(১) গীতা ১৬.২৩
(২) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

খায়।” সহস্রারে প্রাণের স্থিতি হইলেই ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম্মের শেষ হইল। এইজন্য ষট্‌চক্রের ক্রিয়াই বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং সহস্রারে স্থিতিই জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি। অবশ্য শেষে জ্ঞানও নাই অজ্ঞানও নাই। কারণ জ্ঞান থাকিলে অজ্ঞানও থাকে। যেমন দিন থাকিলে রাত্র থাকে বা সুখ থাকিলে দুঃখও থাকে। কর্ম্মের সমাপ্তিতে আর কর্ম্ম থাকে না। তখন নিজে না থাকায় জ্ঞান অজ্ঞান দুইই থাকে না। যে জানিবে সে যখন নাই তখন জ্ঞান কাহার হইবে? তখন আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই, মোক্ষও নাই বন্ধনও নাই। তখন সদা ব্রহ্মে থাকায় সংসারে মন নাই। মৃতবৎ। কর্ম্মের সেই অতীত অবস্থায় সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হইয়া যায়, উহাই অদ্বৈত ভাব। বর্ত্তমান মন প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হইতে জাত, কিন্তু স্থিরপ্রাণে কোন তরঙ্গ নাই। তাই যোগিরাজ বলিতেন—“শ্বাসকে সর্ব্বদা নাড়িলে চাড়িলে শ্বাসের নির্ব্বাণ হয় অর্থাৎ স্থির হয়, স্থিরত্বের নাম যোগ। জীব মাত্রেই চঞ্চল অতএব স্থির পদ ব্যতীত গতি নাই—প্রাণায়ামে স্থির হয়। পাখা টানাতে চলে, মন করিলে টানা জায় মন না চলিলে টানিতে ইচ্ছা করে না, মন স্থির হইলে অনাবশ্যক ইচ্ছা করে না, অনাবশ্যক কার্য্য না করার নাম ইচ্ছা রহিত।” যখন প্রাণের চঞ্চলতা চলিয়া যায় অর্থাৎ কর্ম্মের অতীত অবস্থা হয়, তখন বর্ত্তমান মন স্থির প্রাণে লয় প্রাপ্ত হইয়া সবই ব্রহ্ম হইয়া যায়। তখন মন, বুদ্ধি, জ্ঞান কিছুই না থাকায় ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অদ্বৈত পরব্রহ্মে লীন হইয়া শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়শূন্য হইয়া কেবল ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি তখন স্বয়ং ব্রহ্ম হন। এই প্রকার ব্রহ্মবিদকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না, কারণ স্বয়ং ব্রহ্মকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

যদি কেহ বলেন যে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়াছে, তবে জানিতে হইবে তাঁহার মোক্ষ হয় নাই। কারণ তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ দেহবোধ ও জ্ঞান সবই রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহার প্রকৃত মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ দেহবোধ ও জ্ঞান কিছুই থাকে না। তাঁহার জ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশ হয়। তিনি তখন জ্ঞানী নহেন, অজ্ঞানীও নহেন। মোক্ষ হইয়াছে কিনা ইহা জানিবার জন্য যে জ্ঞান তাহাও তখন থাকে না। তিনি 'ভোঁ' হইয়া যান। সে এক বিচিত্র অবস্থা। সে অবস্থায় সমস্ত সত্ত্বা বিলীন হয়। কিন্তু যিনি জ্ঞান দ্বারা বুঝিতেছেন যে তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন,

তাঁহার মোক্ষ হয় নাই। কারণ যতকিছু জানা তাহা না জানার মধ্যে। —"মুক্ত যে পুনর্ব্বার ক্রিয়ার পর অবস্থার পর থাকিয়াও মুক্ত কারণ তাঁহার পুনরাবৃত্তি হুইতেথাকে না, সকলেতেই ব্রহ্ম দেখে ব্রহ্মে আটকিয়া বিনা প্রয়াসে থাকে। ইহা না হইলে অপুরুষার্থ।"

এই বিশেষ স্থিতি প্রাপ্তি হইলে প্রাণ ও মনের চাঞ্চল্য চলিয়া যায় ও শান্ত হইয়া আত্মাতে নিমগ্ন হয়। এই কর্ম্ম প্রথমে ইড়া-পিঙ্গলাতে আরম্ভ করিতে হয়, উহাই তখন প্রত্যক্ষ। পরে সুষুম্নায় কাজ হয়, তখন নির্ম্মল সত্ত্বগুণের উদয় হয়। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কূটস্থে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলেই কর্ত্তব্য কি ও জ্ঞাতব্য কি তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥[১]

অর্থাৎ সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যকরূপে সংযত করিয়া অনির্ব্বচনীয়, রূপাদিবিহীন, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, স্থির অতএব নিত্য ও অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন অর্থাৎ যাঁহারা আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে আত্মায় পরমাত্মরূপী অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন তাঁহারা সকল ভূতের হিতকারী হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন।

যোগীকে তিনটি গ্রন্থি অবশ্যই ভেদ করিতে হইবে—জিহ্বাগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি এবং মূলাধারগ্রন্থি অর্থাৎ যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি। এই তিন গ্রন্থিকে যিনি ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই ত্রিভঙ্গমুরারী। উহা একটি অবস্থা। যোগীর এই অবস্থার বিষয় রূপকছলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গমুরারী মূর্ত্তির মাধ্যমে দেখান হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥[২]

অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইলে যোগীর সর্ব্বসংশয়ের ছেদন হয় এবং তখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া একমাত্র আত্মদর্শনে তন্ময়প্রাপ্ত

(১) গীতা ১২।৩, ৪
(২) মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধঃ ২য় অধ্যায় ২১ শ্লোক।

হওয়ায় সকল প্রকার কর্ম্ম ক্ষয় হয়, অর্থাৎ তখন কোন কর্ম্ম থাকে না। তখন যোগী কর্ম্মের অতীতাবস্থা বা ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় একমাত্র আত্মনারায়ণকে দেখেন। সুতরাং সবই এক হইয়া যাওয়ায় অজ হয় অর্থাৎ তখন বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই। কারণ মোক্ষ বলিবার কেহ নাই। উহাই অভয়পদ, কারণ সেখানে দুই না থাকায় ভয় নাই। সেখানে মিলিলে পুনরাবৃত্তি রোধ হয়, উহাই উৎসস্থল। দুর্গাপূজায় অসুরবধের মাধ্যমে ঐ হৃদয়গ্রন্থি ভেদের ক্রিয়াই রূপকছলে দেখান হইয়াছে।

যোগিরাজ আরও বলিতেন—যতদিন পশুবৃত্তি বশীভূত না হয় ততদিন প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি আছে মানুষ তাহার সন্ধান পায় না। এই অলৌকিক শক্তি প্রস্ফুটিত করিবার উপায় শাস্ত্রের মধ্যে নানা জায়গায় ঋষিরা আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও চিত্রের মাধ্যমে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে দৈবীধর্ম্মের অনুকূলে পরিচালিত করিলেই ধর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যত উৎকর্ষ লাভ করিবে ততই উহারা ঈশ্বরমুখী হইবে। প্রাণশক্তিকে দৈবী সম্পদের অনুকূলে চালিত করিতে না পারিলে এই প্রাণই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥[১]

অর্থাৎ যিনি আত্মকর্ম্মদ্বারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ ঊর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে স্থির করিতে পারিয়াছেন, আত্মা সেই ব্যক্তির আত্মার বন্ধু। এইরূপে যিনি চঞ্চল প্রাণকে ঊর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্রে) স্থির করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ঊর্দ্ধরেতাঃ। রেত অর্থে শুক্রকে বুঝায় "শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণ।"[২] শুক্রই প্রাণ। সেই প্রাণের চঞ্চল গতিকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা স্থির করিয়া যিনি আজ্ঞাচক্র স্থানে রাখিতে পারেন তিনিই ঊর্দ্ধরেতা। নচেৎ শরীরস্থ শুক্রস্খলন হয় বলিয়া স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করা বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারী ব্যক্তি ঊর্দ্ধরেতা নহেন। কারণ তাঁহার চঞ্চল মন বশীকৃত হয় নাই। যিনি প্রাণকে এই প্রকারে ঊর্দ্ধে রাখিতে পারেন নাই সেই

(১) গীতা ৬.৬
(২) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চঞ্চল আত্মাই অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল মনই সর্ব্বপ্রকারে দুষ্কর্ম্মাদি শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। প্রাণশক্তির কার্য্য স্পন্দন। স্পন্দন জন্যই ইন্দ্রিয়, মন সর্ব্বদা বিষয়মুখে ছুটিতেছে। প্রাণের গতি যেমন অবিরাম চলিয়াছে, ইন্দ্রিয়দের বিষয় গ্রহণও তেমনি বিরামহীন। এইজন্য প্রাণ যাহাতে স্পন্দিত হইতে না পারে তাহার চেষ্টাই যোগীকে প্রথমে করিতে হইবে।[১] যে বিদ্যা বা কৌশল দ্বারা প্রাণকে স্পন্দিত হইতে না দিয়া উহাকে দৈবীভাবে আনয়ন করা যায় ঋষিরা তাহাকেই যোগবিদ্যা বলিয়াছেন। "তস্মাদ যোগায় যুজ্যস্ব যোগ কর্ম্ম সুকৌশলম্।[২] অতএব তুমি কর্ম্মযোগে নিযুক্ত হও, ইহা অতি সুকৌশলযুক্ত। প্রাণনক্রিয়ার কৌশলই যোগ। কারণ "সমত্বং যোগ উচ্যতে।"[৩] সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। ইহার প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম বা প্রাণকর্ম্ম বা আত্মকর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্ম। উহাই শাস্ত্র। "অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা"[৪]—একমাত্র প্রাণকর্ম্মই সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত। ইহার অনুশীলই শাস্ত্রানুশীলন। দৃঢ়তার সহিত ইহার অনুশীলন করিয়া সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সঙ্গকে ছেদনপূর্ব্বক নাশ কর। অতএব কর্ম্মের ক্ষেত্র এই মনুষ্য শরীর লাভ করিয়া কখনও প্রাণকর্ম্ম করিতে অবহেলা করিও না। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"[৫] এই নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার হোক, কর্ম্মফলে নয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন— "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।"[৬] অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ওঠ এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ সাধন সমর কর। কারণ 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"[৭] এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (প্রাণকর্ম্ম) অল্পস্বল্প করিলেও মহান্ ভয় হইতে ত্রাণ করে। জীবের মৃত্যুভয়ই প্রধান, সেই মৃত্যু হইতে ত্রাণ করে। এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁহার দৈনন্দিন দিনলিপিতে স্বহস্তে লিখিয়াছেন—"কেবল রেচক ও পুরক আউর

(১) তন্ত্রযোগ শাস্ত্রের স্পন্দদর্শন একটি বিশেষ শাখা। সেখানে স্পন্দের স্বরূপ, ক্রিয়া প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ও যোগসম্মত ব্যখ্যা দেওয়া আছে।

(২) গীতা ২৫০

(৩) গীতা ২।৪৮

(৪) গীতা ১৫।৩

(৫) গীতা ২।৪৭

(৬) গীতা ২।৩৭

(৭) গীতা ২।৪০

বঢ়াওএ সিদ্ধি দে—লাগে আউর সমাধ—রেচক পুরক বিনা জয়সে বন্ধ্যাকুপ, প্রাণ বায়ু কো বল লে আওএ মন নিশ্চল হোয় জায়—আয়ুর বঢ়াওএ—রোগ ন রহে—পাপ জলাওএ নির্ম্মল করে—জ্ঞান হোয় তিমির নাশে।"[১] অর্থাৎ (প্রাণায়ামে রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিনটি কর্ম্ম আছে। যোগিরাজ বলিতেছেন, রেচক ও পূরক আরও বাড়াও তাহা হইলেই প্রাণ স্থির হইয়া সমাধি আসিবে এবং সিদ্ধি পাইবে। স্বতন্ত্র কুম্ভকের আবশ্যক নাই। এই রেচক ও পূরক ব্যতীত যে প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগ ছাড়া যে প্রাণায়াম তাহা জলহীন কূপের ন্যায় বিফল। প্রাণবায়ুকে অন্তর্মুখীভাবে বলপূর্ব্বক টানা ও ফেলা এই কর্ম্ম করিলেই মন নিশ্চল হইয়া যায়। উহা আরও বাড়াও তাহা হইলে রোগ থাকিবে না, জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইবে, নির্ম্মল হইবে, জ্ঞান হইবে ও অজ্ঞান চলিয়া যাইবে)

এই অবস্থার বিষয় যাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছিল, সে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"স্বাসা একদম সে বন্দ হুয়া, বড়া মজা। আবকী মজাকি বাত কুছ কহা নজায়।" অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল, বড়ই আনন্দ। এই আনন্দের কথা কিছুই বলা যায় না। কারণ বলিবার উপায় নাই, নিজ বোধগম্য।

* * * *

শ্রীরামপুরের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগিরাজের এক ভক্ত, কাজ করেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। দেশে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে নামিলেন কাশীধামে। বড় ইচ্ছা গুরুদেবকে দর্শন করা। দীর্ঘ পথশ্রমে চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। যোগিরাজের সামনে আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। যোগিরাজ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"এখানে এসেছ কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও।"

এ কি কথা বলেন গুরুদেব, দুঃখ পান সুরেন্দ্রনাথ। কি তাঁর অপরাধ ভেবে পান না। কেন তিনি এত নির্দ্দয় হলেন তাঁর প্রতি। চোখের কোণ ছলছল করে ওঠে।

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে যোগিরাজ বলিলেন—"যাও সুরেন স্নান কর, যা রান্না হয়েছে খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি যে ট্রেন্ পাও তাই ধরে বাড়ী যাও।"

জিজ্ঞাসা করার সাহস পান না সুরেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাই করেন।

(১) সংশোধন না করিয়া অবিকল তুলিয়া দেওয়া হইল।

মটরুকে ডাকিয়া যোগিরাজ বলিলেন—"যাও, সুরেনকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এস।"

সুরেন এসে নামেন শ্রীরামপুর রেলষ্টেশনে। দু'পা যেতেই দেখেন তাঁর ছোটভাই দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই অপেক্ষায়।

—"এত দেরী করে এলে দাদা! দু'দিন আগে টেলিগ্রাম করে প্রতিদিন ট্রেন্ দেখি তুমি আস কিনা।"

—"কেন কি হয়েছে? আমি ত কোন টেলিগ্রাম পাই নি।"

—"মায়ের অবস্থা খুব খারাপ।"

সুরেন তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছান।

—"সুরেন, তুই এসেছিস? আমি তোরই জন্য অপেক্ষা করে আছি বাবা। আমার যে যাবার সময় হয়েছে।" স্নেহময়ীর হাত দু'খানি এগিয়ে আসে সুরেনের দিকে। সুরেন জড়িয়ে ধরেন জননীকে। তারপর ধীরে ধীরে জননীর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

সুরেনের দুই গালে নেমে আসে অশ্রুধারা। মনে পড়ে কেন তাঁর গুরু তাঁর প্রতি এত নির্দ্দয় হয়েছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার দধিমুখা গ্রামের হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম্মোপলক্ষ্যে নিজ গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী আর এক গ্রামে যাইতেছেন। তিন চার মাইল পথ। তাই তিনি ঘুর পথ পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। চারিদিকে শাল সেগুন মহুয়ার বন, মাঝে সরু পথ। কোথাও জনমানব নাই। ভেসে আসে নানা বন-ফুলের গন্ধ ও বিহঙ্গ কাকলী। হরিপদ চলিয়াছেন ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর হইয়া। ভয় তাঁকে ছুঁতে পারে না। হঠাৎ চমকে ওঠেন হরিপদ, যমদূত তাঁর সামনে। এক নরখাদক লেজ নাড়িতে নাড়িতে গুটি গুটি এগিয়ে আসে তাঁরই দিকে। যেন শিকার তার হাতের নাগালে, তাড়াহুড়ার কিছু নেই। হরিপদ বুঝলেন মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী, যমের বাহন এসে গেছে। এখানে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করার নাই। একমাত্র তাঁর দয়াল গুরু যদি তাঁকে রক্ষা করেন। কে যেন তাঁর ভিতর হইতে বলিল—"গুরু রক্ষা কর, গুরু রক্ষা কর।"

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে হরিপদ ও তাঁর সংহারকারী। হরিপদ শুনতে পেলেন পিছন থেকে কে যেন তাড়াচ্ছেন "হ্যাৎ হ্যাৎ।" এরপর নরখাদক লেজ নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল গভীর অরণ্যের ভিতর। প্রেমাশ্রু নেমে আসে হরিপদর দুই গালে।

অল্প কিছুদিন পর হরিপদ আসিয়াছেন কাশীধাম। যোগিরাজ চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাইয়া বলিলেন—"এ যাত্রায় জীবনটা বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

—"বড় ভয় পেয়েছিলে কিনা।" যোগিরাজ মৃদু মৃদু হাসেন। উপস্থিত ভক্তরা মুখ চাওয়া চাওই করেন, বুঝতে পারেন না কেহ।

পরে সকলেই হরিপদবাবুর নিকট হইতে ঘটনাটি শুনিয়াছিলেন।

এইভাবে তিনি সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিতেন এবং আর্ত্ত আশ্রিতদের রক্ষা করিতেন। কতভাবে তিনি সকলের হিত করিতেন তাহার হদিস পাওয়া যায় না।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও উপদেশ দিতেছেন যোগিরাজ। অনেক ভক্ত শুনিতেছেন। কেমন করে তোমরাও সর্ব্বভূতেহিতে রত হতে পার? দেখ, শরীরের ভিতরেই সব। শরীরটা ত পঞ্চভূতের। শরীরে যে পঞ্চভূত বাহিরেও সেই পঞ্চভূত। ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম। শরীরে পঞ্চভূতের স্থান যথাক্রমে মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, মণিপুরে তেজস্তত্ত্ব, অনাহতে বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধাখ্যে ব্যোমতত্ত্ব এবং তাহার উর্দ্ধে তত্ত্বাতীত। এই পঞ্চভূতকে জানিতে পারিলেই বাহিরের বৃহৎ পঞ্চভূতকে জানা যায়। কিন্তু প্রথমে কেউ যদি চেষ্টা করে বাহিরের বৃহৎ পঞ্চভূতকে জানিতে তাহা হইলে পারিবে না, হারিয়ে যাবে। অতএব দেহের ভিতরের পঞ্চভূতকে জানিতে পারিলে ভিতর বাহির সব মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। দুই আর থাকে না। তখন পঞ্চভূতেও যে প্রাণীরূপী ঈশ্বর বর্ত্তমান তাহার উপলব্ধি হয়, কূটস্থে স্থিতি হয়। দূরবীণ দ্বারা যেমন দূরের বস্তুকে নিকটে দেখা যায়, তেমনি কূটস্থরূপী দূরবীণের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল চিত্র যোগীর বোধগম্য হয়। তোমরাও চেষ্টা করিলে পারিবে। প্রাণ চঞ্চল বলিয়াই কূটস্থে স্থিতি হয় না। প্রাণকর্ম্মের দ্বারা ষট্‌চক্রপথে যাতায়াতের মাধ্যমে প্রাণ স্থির হইলেই কূটস্থে স্থিতি হয়, তখন সবকিছু যোগীর কাছে স্বচ্ছ হইয়া যায়। কূটস্থে যে চক্ষু লক্ষিত হয় তাহার ভিতর এক আকাশ দেখা যায়। উহা দৃশ্যমান আকাশ নহে, উহা আকাশের আকাশ মহাকাশ। উহা এতই স্বচ্ছ যে সেখানে কোন বাধা নাই। বাধা না থাকায় নিকট দূর বলিয়া কিছু নাই। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম সকলই লক্ষিত হয়। যেমন একটি সরিষাদানা নিকটে যদ্রূপ দেখায় শত-সহস্র যোজন দূরেও তদ্রূপ দেখায়। সেখানে আলো নাই অন্ধকার নাই, অথচ সবকিছু দৃষ্ট হয়, স্বয়ং প্রকাশ। বিশাল পর্ব্বতের অপর প্রান্তের বস্তু সহ শত যোজন দূরের ক্ষুদ্রতম বস্তুও অনায়াসে লক্ষিত হয়,

যেমন দূরবীনের সাহায্যে দূরের বস্তুকে নিকটে দেখা যায়। সেই মহাকাশ দর্শনে যোগীর ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান হয়। সেই স্বচ্ছ অবিনাশী মহাকাশরূপ ব্রহ্ম সদা স্থির ও সর্ব্বভূতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। তিনি নাই ত কেহ নাই। এই চরাচর তাঁহা হইতেই উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্তি হয়। তাই যোগিরাজ তাঁহার সাধনলব্ধ অনুভূতির কথা ৩রা জুন লিখিয়াছেন— "সূন্যকে ভিতর যো সূন্য হয় সো অলখ হয়—সোই বিন্দি সোই সূর্য্য। সূন্যকে ভিতর যো সূন্য হয় উস্কা আদি নহি। লেকন উহ সূন্যসে ইহ সূন্যকা ভেদ হয়। সবুজ সূন্য অনন্ত ওহি ব্রহ্ম। সূরজ উসিমে লয় হো জাতা হয়। অব বড়া মজা ভিতর সে উঠতা হয় ভিতর জাতা হয়। অব অগম স্থানমে গএ য়্যানে স্থির। অভি বহুত দূর গগন পন্থমে জানা হয়। আঁখ বন্দ করকে বাহরকা চিজ মালুম হোতা হয়।"—বর্ত্তমান শূন্যের ভিতর যে শূন্য অর্থাৎ যে শূন্য হইতে বর্ত্তমান শূন্যের উৎপত্তি তাহা অদৃশ্য, তাহাই বিন্দু এবং তাহাই আত্মসূর্য্য। সূন্যের ভিতর যে শূন্য অর্থাৎ মহাশূন্য তাহার আদি নাই অতএব অন্তও নাই, কিন্তু সেই স্বচ্ছ মহাশূন্য তাহা বর্ত্তমান শূন্য (আকাশ) হইতে পৃথক, কারণ বর্ত্তমান শূন্যে দূর নিকট সম্পর্ক আছে, ইহা পঞ্চভূতের শেষ ভূত, কিন্তু সেই মহাশূন্যে দূর নিকট সম্পর্ক নাই, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই, পঞ্চভূত এবং তত্ত্বাতীত। সেই শূন্যের অস্তিত্বে বর্ত্তমান শূন্যের অস্তিত্ব। সেই স্বচ্ছ শূন্য সবুজ ও অনন্ত, উহাই ব্রহ্ম। আত্মসূর্য্যও সেই মহাশূন্যে লয় হইয়া যায়, কারণ সবকিছুরই উৎপত্তি ও লয়স্থল সেই অনন্ত নির্বিকার অজর অমর মহাশূন্য। এখন বড়ই আনন্দ হইতেছে এবং উহা ভিতর হইতে উঠিতেছে ও ভিতরেই যাইতেছে। যেখানে যোগিগণ ছাড়া আর কেহই যাইতে পারেন না এমন যে অগম্য স্থান সেইখানে পৌঁছিলাম অর্থাৎ মহাস্থির ঘরে পৌঁছিলাম। এখন সেই মহাশূন্য পথে বহুদূর যাইতে হইবে অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। এখন চোখ বন্ধ করিলেও বাহিরের সবকিছু দেখিতে ও জানিতে পারিতেছি। উহারই বাহ্য প্রতীক শালগ্রামশিলা। প্রবল বেগে প্রবাহিত জলের নিম্নদেশে বৃহৎ শিলা যেমন নিশ্চল থাকে, তদ্রূপ বিনাশী নাম ও রূপ নানাপ্রকারে প্রবাহিত হইলেও তাহার আধারস্বরূপ মহাকাশরূপ কূটস্থ পরব্রহ্ম অচল থাকেন। সেই নশ্বর নামরূপে উপেক্ষা হইলে তবেই মহাকাশরূপ সচ্চিদানন্দ জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন আত্মার কোন অবয়বের আশঙ্কা করা যায় না, তেমনি নাম বা রূপ ইহারাও সেই স্বচ্ছ স্বরূপের অংশ হইতে পারে না। তাই তিনি সকলকে বলিতেন—"এই শরীরে যে কূটস্থ

আছেন তাঁহাকে যে গুরুর উপদেশে না দেখে সে অন্ধ। যেমন কবুতরের পালক উড়তে উড়তে আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে তেমনি বায়ু ক্রমশ রুকতে রুকতে সূক্ষ্ম্য হয় অবশেষে সুন্যের মধ্যে দিইয়া অনেক দিনের পর গমনাগমন করিতে পারে।"

শরণাগত ভক্তদের প্রতি যোগিরাজের করুণা ছিল অপরিসীম। তাহাদের রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা সজাগ থাকিতেন।

কলিকাতার এক বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ীর পত্নী অভয়া যোগিরাজের ভক্ত। ঐ দম্পতীর পর পর কয়েকটি সন্তান হইয়া বাঁচে নাই, সেজন্য তাঁহাদের বড় দুঃখ। অভয়া একদিন তাঁর গুরু যোগিরাজ চরণে প্রার্থনা জানাইলেন যেন তাঁর একটি সন্তান হয় ও সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকে।

মহাযোগী বসে আছেন প্রশান্ত আননে। কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করছেন। দেখলেই মনে হয় জগৎ সংসারের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত এক বিহঙ্গ। কে এল কে গেল, কে কি কথা বলল কিছুই খেয়াল নেই তাঁর।

অভয়া ভাবেন বোধহয় গুরুদেব তাঁর কথা শুনতে পান নি। পুনরায় আকুল প্রার্থনা জানায় অভয়া।

ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞানে ফিরিয়া আসিলেন মহাযোগী।

অভয়া পুনরায় প্রার্থনা জানায় তাঁর গুরুচরণে। একটি সন্তান তাঁর চাই এবং সে যেন বেঁচে থাকে।

যোগিরাজ প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন—"শোন অভয়া, তোমার একটি কন্যা হবে এবং বেঁচে থাকবে। কিন্তু একটা নির্দ্দেশ পালন করতে পারবে? যেন ভুল না হয়।"

আশার ক্ষীণ তরঙ্গ জাগে অভয়ার মনে। অভয়া ভাবে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যদি কৃপা করেন তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হবে। গদগদ কণ্ঠে অভয়া বলে—"আপনি যা আদেশ করবেন, তাই করব।"

ভক্তবৎসল শ্যামাচরণ বলেন—"রাত্রির প্রথম দিকে কন্যাটির জন্ম হবে। জন্মের কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যোদয় পর্যন্ত প্রসূতির ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। কিন্তু সাবধান প্রদীপটি যেন নিভে না যায়।"

যথাসময়ে অভয়ার একটি কন্যা হল। গুরুদেবের আদেশ মত প্রদীপ জ্বালান ছিল। কিন্তু যামিনীর শেষ ভাগে ক্লান্ত প্রসূতি ও ধাত্রী উভয়েই কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে প্রদীপের তেল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, নিবুনিবু অবস্থা।

ঐ সময়ে সূতিকাগারে ঘটিল এক অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ সশব্দে দরজাটি খুলিয়া গেল। নিদ্রিতা প্রসূতিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বিস্মিত নেত্রে দেখেন কক্ষদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই দয়াল গুরুদেব ভক্তপ্রাণ পতিতপাবন করুণার ঘণীভূত মূর্ত্তপ্রতীক যোগিশ্রেষ্ঠ শ্যামাচরণ।

কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তিমিত দীপশিখার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিছেন—"ঐ দেখ অভয়া, প্রদীপ নিভে যায়, তাড়াতাড়ি তেল দাও।"

ক্লান্ত অভয়া উঠিয়া পড়েন, তেল ঢালিয়া দেন দীপাধারে। ততক্ষণে গুরুদেবের করুণাঘন মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যায়।

গুরুকৃপা স্মরণ করে প্রেমাশ্রু নেমে আসে অভয়ার দুই গালে।

পরে অভয়া স্বীয় গুরুদেবকে একথা জানালে যোগিরাজ মৃদু হেসে বলেছিলেন—"কর্ত্তব্যে অবহেলা করা তোমাদের স্বভাব। কর্ত্তব্যে অবহেলা কখনও কোর না।"

যেগিরাজ এইভাবে অনেক অপুত্রকের পুত্র লাভের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিনলিপি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তিনি ৮ই ফেব্রুয়ারী (সাল নাই) লিখিয়াছেন—"**শ্যামলালকো পুত্র হোনেকা উপায় বতলায়া।**"—শ্যামলালকে তাহার পুত্র লাভের উপায় বলিয়া দিলাম।

যোগিরাজের ঋষি সদৃশ দুই পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী ও দুকড়ি লাহিড়ী এবং তিন কন্যা হরিমতী, হরিকামিনী ও হরিমোহিনী। ষোল বছরের বিবাহিতা মধ্যমা কন্যা হরিকামিনী পিত্রালয়ে আসিয়াছে। হঠাৎ কন্যাটি কলেরা রোগে আক্রান্ত হল, একেবারে এশিয়াটিক কলেরা। কাশীমণি দেবী যোগিরাজকে অনুরোধ করিলেন কন্যাটির যাহোক একটা ব্যবস্থা কর, ওকে বাঁচাও। তুমি থাকতে মেয়েটা মরে যাবে?

যোগিরাজ নিরুদ্বিগ্ন, যেন কিছুই হয় নি। কাশীমণি দেবী বার বার অনুরোধ করেন, যেমন করে হোক মেয়েটিকে বাঁচাও। মহাযোগী কোন কথা না বলিয়া একটি অপামার্গের শিকড় ও আড়াইটি গোলমরিচ দিয়া বলিলেন—"এই দু'টি জিনিষ একত্রে বেটে খাইয়ে দাও।"

কাশীমণি দেবী ভাবিলেন কন্যা বিবাহিতা, ডাক্তারের ঔষধ খাওয়ানই ভাল। না হলে যদি কোন অঘটন হয় তাহলে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে কথা শুনতে হবে। তাই তিনি যোগিরাজ প্রদত্ত ঔষধ না খাইয়ে ডাক্তারের ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পরদিন কন্যাটি পরলোক গমন করিল।

যোগিরাজ অন্যান্য দিনের ন্যায় সেইদিনও বৈকালে যথারীতি গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং তাহার সুযোগ্য শিষ্য পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতার মূল শ্লোক পাঠ করিতেছেন। অনেক ভক্ত শুনিতেছেন। এমন সময় উপরের ঘর হইতে মহা ক্রন্দনরোল উঠিল। উপস্থিত সকলেই বিচলিত হইলেন।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় যোগিরাজ বলিলেন—"মেজ মেয়েটি মারা গেছে, তাই সকলে কাঁদছে। বোধহয় শ্মশানযাত্রীরা এসেছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতা গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া বলিলেন—"আজকের মত থাক।"

যোগিরাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ওদের কাজ ওরা করুক, তোমাদের কাজ তোমরা কর।"

উপস্থিত সকল ভক্ত বলিলেন—"বর্ত্তমানে আর গীতা ব্যাখ্যা শোনার মত মনের স্থৈর্য্য নাই। আজকের মত বন্ধ থাক।"

যোগিরাজ অনুদ্বেলিত, যেন কিছুই হয় নাই। প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"আচ্ছা, তাহলে বন্ধ রাখ।"

পরদিন যোগিরাজের শ্যালক রাজচন্দ্র সান্যাল মহাশয় আসিয়া যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়জন বিয়োগে যে দুঃখ সাধারণ মানুষের হয়ে থাকে তা কি তোমার হয়?"

যোগিরাজ স্মিতহাস্যে বলিলেন—"দুঃখ ত সকলেরই হবে, তবে জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন পাথরের গুলিকে যদি শক্ত জায়গায় আছাড় মারা যায় তাহলে তা লাফিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যদি নরম মাটিতে আছাড় মারা হয় তাহলে সেটা গেঁথে যায়। তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিকে দুঃখ আঘাত দিতে পারে না। আঘাত তার কাছেও আসে কিন্তু ফিরে যায়। অজ্ঞানী সেই আঘাতে হায় হায় করে।"

পদ্মপত্রে জলের মত সংসারে বাস করিয়াও এই মহান্ গৃহিযোগী কত সহজেই সকল দুঃখ কষ্ট হইতে সদা নির্লিপ্ত থাকিতেন। ঠিক যেমন গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥[১]

---

(১) গীতা ২।১৫

এই সকল সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর ব্যক্তি ব্যথা না পান, তিনি অমরত্ব এবং নিত্যানন্দ লাভ করেন।

* * * * *

যোগিরাজ প্রতিদিন বৈকালে গঙ্গাতীরে রাণামহল ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। সেখানেই গঙ্গাতীরে ভক্ত কৃষ্ণারামের আস্তানা। যেগিরাজ কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণারামের বারান্দায় বসিতেন, গীতা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেন। তারপর সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ি ফিরিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ভক্তদের নানা উপদেশ দিতেন। রাত্রি নয়টা বাজিলে ভক্তরা চলিয়া যাইতেন। এইভাবে যখন তিনি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ভক্তদের উপদেশ দিতেন, তখন কোন কোন সময় দেখা যাইত তিনি হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেন। কেন তিনি মাঝে মাঝে এইভাবে প্রণাম করিতেন, কাহাকেই বা প্রণাম করিতেন তাহা উপস্থিত ভক্তরা বুঝিতে পারিতেন না। জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও হইত না। ক্রমে তাহাদের মধ্যে কৌতূহল জাগিল। একদিন যখন তিনি হঠাৎ প্রণাম করিলেন, সাথে সাথে একজন উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দেখিলেন যে এক ভক্ত যোগিরাজের উদ্দেশ্যে বারান্দায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন এবং যোগিরাজ সেই প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন। ঘরের ভিতর হইতে উহা দেখিবার কোন উপায় ছিল না। এইভাবে বাহির হইতে যখনই কেহ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন তিনি তাহার প্রত্যভিবাদন করিতেন। এমন কি বহু দূরে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিতে দেখা যাইত। নিকট ও দূর, ভিতর ও বাহির সবই তাঁহার কাছে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। সকলের মাঝে তিনি সেই এককেই দেখিতেন।

প্রিয়নাথ কড়ার মহাশয় ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাম উভয়েই যোগিরাজের প্রিয় শিষ্য। দুই বন্ধু কাশী এসেছেন। প্রত্যহ উভয় বন্ধু গুরু দর্শনে যান, উপদেশ শ্রবণ করেন। বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল।

হঠাৎ একদিন রামের কলেরা হল। এশিয়াটিক কলেরা। বিদেশ বিভুঁই, প্রিয়নাথ বড়ই চিন্তিত হলেন। কি করবেন ঠিক করতে না পেরে ছুটে গেলেন গুরুদেবের কাছে।

যোগিরাজ সব শুনে সামাজিক রীতি অনুসারে বললেন—"ভাল ডাক্তার দেখাও।"

প্রিয়নাথ দুইজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আনলেন। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। অবশেষে ডাক্তারেরা হতাশ হয়ে বললেন রোগীর অন্তিম সময় এসে গেছে, আর কোন উপায় নেই।

নিরুপায় প্রিয়নাথ আবার ছুটলেন গুরুদেবের নিকট। রোগীর অন্তিম অবস্থার কথা নিবেদন করলেন। বললেন এতক্ষণে রোগী হয়ত আর জীবিত নেই। শোকাতুর প্রিয়নাথের অশ্রুধারা ঝরে পড়ে।

প্রশান্ত হৃদয় ভক্তবৎসল মহাযোগী আসন ছেড়ে উঠলেন। একটি শিশি নিয়ে পাশের প্রদীপ হতে খানিকটা রেড়ির তেল ঢেলে বললেন—"যাও, তাড়াতাড়ি এটা রোগীকে খাইয়ে দাও।"

প্রিয়নাথ ভাবলেন কাকেই বা খাওয়াবেন। এতক্ষণে হয়ত রাম জীবিত নেই। আবার ভাবলেন তাঁর গুরুদেব ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁর কথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

প্রিয়নাথ দ্রুত পৌঁছলেন রোগীর নিকট। দেখলেন রোগীর দেহে প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই। তবুও বিশ্বাসে ভর করে প্রিয়নাথ রোগীর মুখ একটু ফাঁক করে কয়েকটা ফোঁটা তেল ঢেলে দিলেন। আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত। সকলের সমক্ষে ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ধীরে ধীরে প্রাণহীন দেহটি নড়ে উঠল, শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হল। রোগী পুনর্জীবন লাভ করল।

এই প্রিয়নাথ কড়ার মহাশয়ই পরবর্ত্তীকালে স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[১]

এই মহাযোগী সর্ব্বদা এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অবস্থান করিতেন। হিমালয়ের মত নিস্তব্ধ শান্তি যেন সদা তাঁহাতে বিরাজ করিত। সাধনহীন লোকদের সঙ্গে বৃথা ধর্ম্ম আলোচনা করা তিনি পছন্দ করিতেন না। বরং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি শাস্ত্রোক্ত যোগ-সাধনের এই নিগূঢ় অষ্টাঙ্গ কর্ম্মাদির উপরই তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহার যৌগিক অপরোক্ষ অনুভূতি ছিল অপূর্ব্ব। সেই যোগলব্ধ অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন ও অধ্যাত্ম গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা করিতেন। ভাবের উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছু

(১) প্রিয়নাথ কড়ার মহাশয় ১০শে আগষ্ট ১৮৮৩ খৃঃ যোগিরাজের নিকট হইতে দীক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার ডায়েরিতে লেখা আছে।

বলিতেন না। যাহা তিনি যৌগিক প্রত্যক্ষে অনুভব করিতেন তাহাই ভক্তদের উপদেশ দিতেন। সেজন্য তাঁহার উপদেশগুলি মানুষের মনে রেখাপাত করিত। তাঁহার বর্ণনাগুলি ছিল জীবন্ত। তিনি বলিতেন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ কর .এবং ক্রমে পরমাত্মার সহিত একীভূত হও। ইহাই মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ধ্যান ধারণা ও সমাধি ছাড়া অধ্যাত্ম রাজ্যের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাত্ম বিষয়ক তত্ত্বের প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। এই ছিল তাঁর মূল কথা। তিনি বলিতেন—প্রাণই সকল শক্তির উৎস। প্রাণের সাধনা করিলেই সব সাধনা করা হয়। এই প্রাণের তিনটি অবস্থা। আদিতে স্থির, অন্তে স্থির এবং মধ্যে চঞ্চল। আদিতে স্থির অন্তে স্থির হওয়ায় একটি অবস্থা এবং মধ্যে চঞ্চল, প্রাণের মূলতঃ এই দুইটি অবস্থা। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।"[১] অর্থাৎ ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনেও অব্যক্ত। চঞ্চল প্রাণই প্রকৃতি। চঞ্চল প্রাণই জীবের বর্ত্তমান অস্তিত্ব। চঞ্চল প্রাণ হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ। যতকিছু কর্ম্ম সবই চঞ্চল প্রাণ হইতে। কিন্তু স্থির প্রাণ চঞ্চল প্রাণের উৎসস্থল। স্থির প্রাণ কিছু করেন না, কিছু করানও না। তিনি সর্ব্বদা সাক্ষী মাত্র। চঞ্চল প্রাণই স্থির প্রাণের কর্ম্ম। চঞ্চল প্রাণ প্রকৃতি, স্থির প্রাণ পুরুষ। চঞ্চলতাই জীব, স্থিরত্বই শিব। চঞ্চলতাই বন্ধন, স্থিরত্বই মুক্তি। অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল দিকে যে টান বা গতি তাহাই বন্ধন এবং স্থিরত্বের দিকে যে টান বা গতি তাহাই মুক্তি। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—"নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে"—নিশ্চল বা স্থির অবস্থাই ব্রহ্ম। উহা অমরপদ, কারণ সেই মহাস্থির অবস্থায় জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। উহা নিত্য শাশ্বত, কারণ তাঁহার আগেও কেহ নাই, পরেও নাই, চির বিরাজমান। উহাই বুদ্ধ, কারণ উহা জ্ঞানের অতীত অবস্থা, জ্ঞানও সেইখানে পৌঁছাইতে পারে না। উহা নিত্য মুক্ত, কারণ সেখানে বন্ধন নাই। উহাই কর্ম্মের অতীতাবস্থা বা ক্রিয়ার পরাবস্থা, কারণ কোন প্রকার কর্ম্ম সেখানে নাই। চঞ্চলতার অবসান হেতু কোন প্রকার কর্ম্ম সেখানে থাকিতে পারে না। প্রাণের সঙ্কোচন অবস্থাই শিব এবং প্রসারণ অবস্থাই জীব। তাই সাধকের উচিত সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে চঞ্চলতার অবসান ঘটাইয়া স্থিরত্বকে প্রাপ্ত হওয়া। যখন জীব চঞ্চলতার

(১) গীতা ২।২৮

অবসান ঘটাইয়া মহাস্থিররূপ মহাপ্রাণকে পাইবে তখন জীব নিজেই শিব হইয়া যাইবে।[১] (সকলেই অমৃতের পুত্র। কেহ ছোট নয়, কেহ বড় নয়। যোগিরাজ নিজে আচার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়াও নিজেকে সর্ব্বদা ক্ষুদ্র ভাবিতেন এবং সকলকে ক্ষুদ্র ভাবিবার উপদেশ দিতেন। বলিতেন এই যোগসাধন করিতে হইলে প্রয়োজন একটি সুস্থ সবল মনুষ্য শরীর ও প্রচুর মনোবল এবং সদিচ্ছা। এই দুইটি সম্পদ যাহার আছে সে অনায়াসে এই যোগসাধনা করিতে পারে। কোন বাধাই তাহার প্রতিবন্ধক হয় না। কেহ পাপী নয়, কেহ পুণ্যাত্মা নয়। সকলেই সমান। সকলেই যখন ঈশ্বরের পুত্র তখন সকলেরই ঈশ্বর সাধনার অধিকার আছে। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল জাতির মানুষেরই এই যোগসাধনা করিবার অধিকার আছে। ইহা কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নহে। তিনি বলিতেন কূটস্থে মন রাখিলে পাপ নাই, কূটস্থে মন না রাখিলেই পাপ। কূটস্থই ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা ব্রহ্ম। তুমি সংসারেই থাক অথবা সংসার ত্যাগ করিয়াই যাও, যেখানেই থাক প্রাণ তোমার দেহেই আছেন; অর্থাৎ ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই আছেন। তিনি নাই ত তুমি নাই। প্রাণ তোমার দেহে যতক্ষণ চঞ্চল আছেন ততক্ষণ তুমি জীবিত। যখন তাঁহাকে দেহের ভিতরেই খুঁজিতে হইবে তখন সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? বরং সংসারই সাধনার অনুকূল ক্ষেত্র। এখানে থাকিলে সবকিছু পাওয়া যায়। সংসারে থাকিয়াই যিনি নিজ দেহস্থ প্রাণরূপী ঈশ্বরের সাধনা করেন তিনিই বীর সাধক। নিজ দেহস্থ প্রাণরূপী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র ঈশ্বর সত্তা অনুভব হয়। এই প্রাণরূপী ঈশ্বরের সাধনা করিতে হইলে দেহে প্রাণ থাকা দরকার। প্রাণকে পাইতে হইলে প্রাণকেই প্রয়োজন। প্রাণ ছাড়া প্রাণকে পাওয়া যায় না। প্রাণের দ্বারায় প্রাণের পূজা বা সেবা করিতে হয়।[২] বাহিরের কোন বস্তু দ্বারা প্রাণের পূজা বা সেবা সম্ভব নহে। যাহা কিছু দেখিতেছ সবই প্রাণ। প্রাণ ব্যতীত আর কিছু নাই। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ; তিনিই দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী। তাই ঋষিরা উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণু পিতামহ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥")

---

(১) বৌদ্ধ দর্শনের মতে ইহাই মহাস্থবিরত্ব প্রাপ্তি।

(২) এ বিষয়ে লেখকের 'প্রাণময়ংজগৎ' গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

এই প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, তিনিই পুত্র, তিনিই সখা। ঋষিরাও তাহাই বলিয়াছেন—পিতা হ বৈ প্রাণঃ, মাতা হ বৈ প্রাণঃ, পুত্র হ বৈ প্রাণঃ, আচার্য্য হ বৈঃ প্রাণঃ।[১] প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, আবার প্রাণেই অবস্থান। প্রাণই ধর্ম্ম,[২] কারণ প্রাণই সবকিছু ধারণ করিয়া আছেন। প্রাণই কর্ম্ম, কারণ প্রাণ ছাড়া কোন কর্ম্ম সম্পাদন হয় না। প্রাণই জীব, কারণ প্রাণ চঞ্চল বলিয়া জীব জীবিত। প্রাণই শিব, কারণ তিনিই নিধন কর্ত্তা। প্রাণই বিষ্ণু,[৩] কারণ তিনিই পালন কর্ত্তা। প্রাণই দুর্গা, কারণ তিনিই এই দেহরূপ কেল্লা অর্থাৎ দুর্গে বাস করিয়া সকল দুর্গতিকে নাশ করেন। প্রাণই পুরুষ, কারণ এই দেহরূপ পুরে একমাত্র তিনিই বাস করেন। তিনি এই দেহ ও দেহের বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনিই সর্ব্বদর্শী। অতএব মানুষ হইতে কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই একমাত্র উপাস্য ও ধর্ম্ম এই প্রাণ। সকল দেব-দেবীরও উপাস্য এই প্রাণ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি মনুষ্য হইতে সকল প্রকার ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত সকলেরই উপাস্য ঐ এক প্রাণরূপী ঈশ্বর, কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই। প্রাণ দেহে না থাকিলে কিছুই থাকে না। প্রাণের অস্তিত্বে ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সকলেরই অস্তিত্ব। তাই তোমরা সকলে আপন আপন প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই উপাসনা কর, প্রাণেরই শরণাপন্ন হও। তাহা হইলেই জগতের প্রাণকে ভালবাসিতে পারিবে, সর্ব্ব জীবে প্রেম আসিবে। তিনিই প্রেমের উৎসস্থল, তিনিই সকলের পতি, তাই তিনি বিশ্বপতি, তাই তাঁহার প্রতি প্রেম কর। সকলে প্রাণের সেবা কর অর্থৎ প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ যাহা অবিরাম কর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম তাহা কর। তাহা হইলে প্রাণকে পাইবে। প্রাণই তুমি। সেই প্রাণ তোমার 'বর্ত্তমান তোমাকে' বদ্ধ করিয়াছেন, আবার তিনিই তোমার 'বর্ত্তমান তোমাকে' মুক্ত করিতে পারেন। এছাড়া কাহারও সাধ্য নাই মুক্ত করিতে পারে। প্রাণই বন্ধন কর্ত্তা, প্রাণই মুক্তিদাতা। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—এই দেহের ভিতরেই তিনি আছেন অথচ কয়জন তাঁহার সন্ধান করে?

(১) উপনিষৎ।

(২) ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধৃ ধাতু অর্থ ধারণ করা।

(৩) বিষ্—আবিষ্ট বা প্রবিষ্ট হওয়া। যিনি সকল পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন তিনিই বিষ্ণু।

বহিঃপ্রাণায়ামরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্মুখ গতি নিবারণ করিয়া অন্তর্মুখগতিরূপ অন্তঃপ্রাণায়াম বহু পরিমানে করিতে পারিলে, সকল প্রকার ইচ্ছার নাশ হইয়া জ্ঞানাবস্থা লাভ হইয়া থাকে বা পুনরাবর্ত্তন রোধ হয়; এ অবস্থায় দেহত্যাগের পর আর বর্ত্তমান অবস্থারূপ জন্ম হয় না, জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়।

"প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্বমিদং বশে যো ভূতো সর্ব্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। নমস্তে প্রাণক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে। বিদ্যুতে বর্ষতে ঔষধি যৎ প্রাণ ঋতাবাসতে অভিক্রন্দব্যোষধে প্রাণো মৃত্যু প্রাণং দেবা উপাসতে প্রাণোহি সত্যবাদিন সুত্তম লোক আদবৎ। প্রাণো বিরাট, প্রাণো দেষ্ট্, প্রাণং সর্ব্ব উপাসতে প্রাণোহ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা প্রাণমাহ প্রজাপতিং প্রাণাপানৌ ব্রীহি যাবানত্বান প্রাণ উচ্যতে, যাবৎ প্রাণ আহিতা অপানো ব্রীহিরুচ্যতে, অপানতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা যদাত্বং প্রাণ জিন্বসথে সজায়তে পুনং প্রাণমাহ মাতরীশ্বনাং বাতোহ প্রাণ উচ্যতে। প্রাণোহ ভূতং ভবঞ্চ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। প্রাণ মাসং পর্য্যাবৃতো নমদন্যো ভবিষ্যসি। অপাং গর্ভমিব জীবসে প্রাণবধ্না-মিত্বামযী।"[১]

অর্থাৎ এই প্রাণবায়ু, যিনি হৃদয়ে আছেন তাঁহাকে নমস্কার অর্থাৎ তাঁহাকে তাঁহারই দ্বারা ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা নমস্কার। প্রাণের বশে সমুদয়, তিনি না থাকিলে কিছু নাই। প্রাণের দ্বারা বাহির ভিতর সমুদয় কর্ম্ম হয়। প্রাণ যিনি সর্বের সর্বা কর্ত্তা, তাঁহার সেবা করা আবশ্যক অর্থাৎ ক্রিয়া করা আবশ্যক। যতকিছু হইয়াছে সকলেরই ঈশ্বর প্রাণ। এই প্রাণেশ্বরকে সেবা করার জন্য প্রাণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই প্রাণের বৃদ্ধির নাম প্রাণায়াম। অতএব সকল বুদ্ধিমানের উচিত প্রতিদিন প্রাণের সেবা করা অর্থাৎ ক্রিয়া করা। প্রাণেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এবং এই শরীর তাহার আধার। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সকলেরই প্রাণের ক্রিয়া করা উচিত যাহা মহান্ অমোঘ ঔষধ। সেই এক হইবার নিমিত্ত সকল শাস্ত্র এবং সকলের প্রথমেই প্রাণায়াম। সেই প্রাণবায়ুর বিকারে মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্যুতি নাই আবার কূটস্থের শক্তি দ্বারা প্রকাশ হয়। তিনিই তেজ অপ্ অন্নস্বরূপা গায়ত্রী, যাঁহার প্রকাশে ভিতর বাহির প্রকাশ হয়। ঈশ্বরকে মনে করা তাহাও প্রাণের কর্ম্ম। এই প্রাণের রোধে বিরাট মূর্ত্তি দেখায়,

(১) অথর্ব্ববেদ ১১ কাণ্ড ২৩ প্রপাঠক ১ অনুবাক ৩ মন্ত্র।

আর দেখিবার কর্ত্তা সেই প্রাণ। প্রাণকেই সকলে উপাসনা করিতেছেন, কেহ মনোযোগপূর্ব্বক কেহ অমনোযোগপূর্ব্বক। এই প্রাণের দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র দেখা যায়। প্রাণাপানের মধ্যে পুরুষ, সেই প্রাণই আসিতেছেন ও যাইতেছেন, সেই প্রাণের নাম মাতরীশ্বা। এই প্রাণবায়ু দ্বারা সমস্ত হইয়াছে ও হইবে, প্রাণেই সব প্রতিষ্ঠিত। প্রাণক্রিয়া ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা, কারণ সত্যতে না থাকায় সবই মিথ্যা। অতএব আত্মক্রিয়া যাহা সর্ব্বশাস্ত্রের মত, তাহা করা কর্ত্তব্য। **"সর্ব্বমোঙ্কারাং এবেদ ওঁ সর্ব্বং গায়ত্রী চ ত্রায়তে চ।"**[১] এই শরীরই ওঁকার ইহা জানিলে সমস্ত জানা হইল। ক্রিয়াই গায়ত্রী, ক্রিয়া করিলে ত্রাণ পায়। **"যে অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌখ্যাং কীর্ত্তয়সন্তি যে দ্বিজা তাং তাবয়তি দুর্গা নিনাবেব সিন্ধু দুরিতাত্যগ্নি।"**[২] অর্থাৎ যে ক্রিয়াবান্ যোনিমুদ্রায় কূটস্থ প্রত্যহ দর্শন করেন, তাঁহাকে সেই কূটস্থ স্বরূপ কেল্লার অধিপতি দুর্গা সংসাররূপ সমুদ্র হইতে পার করিয়া দেন। ক্রিয়া স্বরূপ নৌকা দ্বারা এইরূপ করিতে করিতে চঞ্চল মন স্থির হইয়া যায় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় যত পাপ আছে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।—"ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা" এই একটি কথা বলিলেই সব বলা হইল।

পূর্ব্বজন্মের কৃত যে কর্ম্ম, তাহাকে দৈব বলে এবং বর্ত্তমানে যে কর্ম্ম করা হয় তাহাকে পুরুষকার বলে। অতএব দৈব ও পুরুষকার জনিত ক্লেশ নিবারণের জন্য ক্রিয়াবানদের গুরুপদেশানুসারে ক্রিয়ায় সতত মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। ১৭২৮ বা ২০৭৩৬ বার প্রাণায়াম করিলে যাহা কামনা করে তাহা সিদ্ধ হয়, সেই কূটস্থে থাকার নামই লক্ষ্মী। ইহাতেই শান্তিপদ পাওয়া যায়; ক্রিয়া করিলেই সিদ্ধি হয়। তিনিই বিশ্বকর্ম্মা, এই বিশ্বসংসারকে খাওয়াইতেছেন। কূটস্থের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার তিনিই দেব হইতেছেন। আবার ওঁকার ক্রিয়ায় স্থিতিস্বরূপ বামদিকের হৃদয়ে বামদেব। এই দেহের ছয় চক্রে যে ছয় ঋতু তাহাতে যে কূটস্থ স্বরূপ ভ্রমর আছেন, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও মধুকর হইতেছেন। ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপ ধনুক ধরিয়া আছেন, তাই তিনিই 'রাম'। তিনি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সবকিছু হরণ করেন এইজন্য তাঁহার নাম 'হরি'। আবার হরিণের মত

(১) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ২ অধ্যায় ৪ সূত্র।

(২) ঋগ্বেদ ৭ অধ্যায় ৮ অষ্টক ১৪ ঋচা।

দিব্য চক্ষু কূটস্থ স্বরূপ তজ্জন্য তাঁহার নাম 'হরিনাম', যাহা যোগীরা দেখেন। তিনি সকল ভূতকে হরণ করেন তাই তাঁহার নাম সর্ব্বভূতহর। তিনি সর্ব্বদাই নিত্য তাই তিনি শাশ্বত। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবান অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ বর্জ্জিত তাই তিনিই ভগবান্। ১৮৭৪ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর লিখিয়াছেন—"ওঁ জ্যোতরূপ—এহি জ্যোত শরীরমে ব্যাপক হো জায়গা তব সব দেখেগা আউর বোলনেকা তবিয়ত ন চাহেনেপর।" —(এই ওঁকাররূপী আত্মজ্যোতি সমস্ত শরীরে প্রসারিত বা পরিপূর্ণ হইলে (এই শরীরেই স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল তিন লোক) সবকিছু দেখা যাইবে এবং ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সবকিছু বলা যাইবে) ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥[১]

অর্থাৎ (হে মহৎ-প্রাণরূপ মহাত্মন্, স্বর্গ ও পৃথিবীর এই অন্তর (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) অর্থাৎ মূলাধার ও সহস্রারের যে অন্তর এবং সমুদয় দিক্ তোমার (আত্মার) তেজোরূপ আলোকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ শরীরের ঊর্দ্ধ অধঃ পূর্ব্ব পশ্চিমাদি সকল দিক্ তোমার আলোকে (আত্মজ্যোতিতে) পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তোমার (আত্মার) এই অদ্ভুত প্রচণ্ড অগ্নিসম ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতিশয় ভীত হইতেছে অর্থাৎ শরীরের ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্য তিন লোকই চমকিত হইয়া মন ত্রাসিত হইতেছে।)

*　　*　　*　　*　　*

যোগিরাজ কখনও তাঁহার প্রচার চাহেন নাই। সেইজন্য কখনও তাঁহার ছবি তুলিতে দিতেন না। একদিন ভক্তরা তাঁহার ছবি তুলিবেন মনস্থ করিয়া তাঁহারই ভক্ত সুদক্ষ ফটোগ্রাফার গঙ্গাধর দেকে ডাকিয়া আনিলেন। এইবার তাঁহারা যোগিরাজের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। যোগিরাজ বলিলেন—"ফটো তুলিবার প্রয়োজন নাই। ফটো তুলিলে

(১) গীতা ১১।২০

ভবিষ্যতে তোমরা সাধনা ত্যাগ করিয়া ফটোটিকেই পূজা করিতে শুরু করিবে।"

কিন্তু ভক্তরা নাছোড়বান্দা। তাঁহারা বার বার অনুরোধ করায় শেষে যোগিরাজের সম্মতি মিলিল। গঙ্গাধরবাবু সহ সকল ভক্তগণ আনন্দিত হইয়া ফটো তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ক্যামেরার সম্মুখে গিয়া যোগিরাজ বালক সুলভ আচরণে ক্যামেরার নানা যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরবাবুও উৎসাহী হইয়া যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বুঝাইতে লাগিলেন।

শেষে ফটো উঠাইবার সময় গঙ্গাধরবাবু পড়িলেন মহাবিপদে। ক্যামেরার দর্শনস্থানে যোগিরাজের ছবি প্রতিফলিত হইতেছে না। ভাবিলেন হয়ত ক্যামেরার কোন ত্রুটি হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন অপরের ছবি দর্শনস্থানে ঠিকই প্রতিফলিত হইতেছে। গঙ্গাধরবাবু এতক্ষণে আসল ব্যাপারটি বুঝিলেন। দেখিলেন যোগিরাজ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। গঙ্গাধরবাবু এবার কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাইলেন—"আপনি দয়া করুন, নইলে ফটো উঠিবে না, ভক্তদেরও মনোবাঞ্ছা পূরণ হইবে না।"

যোগিরাজ এবার মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তোল, ছবি তোল।"

দেখা গেল এবারে দর্শনস্থানে মূর্ত্তি ঠিকমত প্রতিফলিত হইতেছে।

বর্ত্তমানে তাঁহার লক্ষ লক্ষ অনুগামী ভক্তের কাছে যে ছবি দেখা যায় উহা সেই ছবি যাহা ঐদিন গঙ্গাধর দে তুলিয়াছিলেন। এছাড়া তাঁহার দ্বিতীয় কোন ছবি তোলা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোথাও কোন ফটোর দোকানে তাঁহার ছবি পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি প্রচারে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়াই এই গোপনীয়তা পালন করা হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি ফটোখানি দেখিলে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে যোগিরাজ কত সুঠাম সুন্দর ও যোগিসুলভ দেহের অধিকারী ছিলেন। চোখ দুটির পানে তাকাইলে মনে হয় যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সুতীক্ষ্ণভাবে অবলোকন করিতেছেন। উহা শাম্ভবী মুদ্রায় অবস্থিত।

শ্যামাচরণ সাধনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া আর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও সর্ব্বদা সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করিতেন। অতি সাধারণ বেশভূষা তাঁহার ছিল। স্বল্পভাষী ও মধুরভাষী শ্যামাচরণ বিনা প্রয়োজনে কখনও যোগবিভূতির ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেন না। নিতান্ত

লীলাছলে অথবা মুমুক্ষু ভক্তদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার মানসে কখনও কখনও তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে দেখা গিয়াছে। অধ্যাত্মশক্তির উৎসরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও যোগিরাজ নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করিতেন। ভক্তদেরও তাহাই উপদেশ দিয়া বলিতেন—নিজেকে ক্ষুদ্র না ভাবিলে আত্মরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। অনেক সময় তিনি ভক্তদের বলিতেন—"আমি গুরু নই, গুরু শিষ্যের পাট রাখি না।"

এই সময়ে যোগিরাজ অধ্যাত্মশক্তির পূর্ণ পাত্র লইয়া, পতিতপাবনের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া মানবকল্যানের জন্য অধিরূঢ় ছিলেন। শুধু তাহাই নয় তাঁহাকে দর্শন মাত্র কত মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিত। বহু সাধু সন্ন্যাসীও গভীর রাত্রে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া বহু দুরূহ যোগসাধনা শিক্ষালাভ করিতেন। আবার প্রত্যুষে সকলে চলিয়া যাইতেন। এইভাবে তিনি বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতেন। সেজন্য তাঁহাকে কখনও অবসন্ন হইতে দেখা যায় নাই। সদা প্রফুল্লবদনে আগন্তুক ভক্তদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। সে সময় তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন করুণার ঘনীভূত মূর্ত্তি। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ শূন্য হইয়া অনেক সময় দেখা গিয়াছে এই মহাযোগী নিজ হইতে ভক্তদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যোগিরাজের বসত বাটি হইতে অল্প কিছু দূরে গোয়ালা জয়পাল ভগতের দুধ-দৈয়ের দোকান ছিল। সারাদিন বসিয়া বসিয়া দুধ-দৈ বিক্রয় করিত আর দেখিত কত মানুষ মহারাজজীর নিকট আসে ও যায়। কত মানুষ তাঁহার কৃপা পাইয়া ধন্য হয়। মহারাজজীর প্রতি জয়পালের গভীর শ্রদ্ধা। জয়পাল ভাবে সে সাধারণ মানুষ, মহারাজজী কি আর তাহাকে কৃপা করিবেন? সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারে না জয়পাল। একদিন জয়পাল রাস্তা দিয়া যাইতেছে। হঠাৎ সামনে মহারাজজীকে আসিতে দেখিয়া জয়পাল ভক্তি-বিনম্রচিত্তে প্রণাম করিয়া রাস্তার পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। মহারাজজী প্রত্যাভিবাদন করিয়া মৃদু হাসিলেন। বলিলেন—"জয়পাল, কাল তুমি আসবে, তোমায় দীক্ষা দেব।"

জয়পাল ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিল—"মহারাজজীর জয় হোক।" জয়পাল আনন্দে অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিল—মহারাজজী ডাকিয়া লইয়া কৃপা করিতেছেন, কিন্তু আমি কি তাঁহার উপদেশ পালন করিতে পারিব?

পরদিন যথাসময়ে জয়পাল উপস্থিত হইয়া দীক্ষালাভ করিল।

পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় ঐ ছোট্ট দুধ-দৈয়ের দোকান হইতেই জয়পালের প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল। ভক্ত জয়পাল ধনে-পুত্রে সমৃদ্ধ সংসার পাইয়াও শেষে সবকিছু পুত্রদের হস্তে সমর্পন করিয়া সর্ব্বদা জাহ্নবী তীরে একটি কুটিরে একাকী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিত। জয়পাল সাধনার অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

বাঙলাদেশের ভাগিরথী তীরে এক অখ্যাত পল্লীতে ইট-নির্ম্মাণ কারখানায় কাজ করিতেন হিতলাল সরকার। সামান্য আয়ে কোন রকমে সংসার চালাইতেন। কিন্তু পরোপকার করার প্রবৃত্তি ছিল তাঁহার সহজাত। কোন গরীব দুঃখী কিছু চাহিলে নিজের ও পরিবারের কষ্টের কথা না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সাধ্যমত তিনি তাহা দান করিতেন। হিতলাল সংসারের সবকিছু করিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার মন যেন কোথায় চলিয়া যাইত। গঙ্গার তীরে হিতলাল চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। সব কাজ করিতেন বটে, কিন্তু কিছুই যেন ভাল লাগিত না। কি যেন পাইতে চান হিতলাল। জীবনটা যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

হিতলাল প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও কাজে গিয়াছেন। সবকিছু তত্ত্বাবধান করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অকারণে চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। ভাবিলেন এখানে থাকিয়া কোন লাভ নাই, এখনই কোথাও যাইতে হইবে। যাহা ভাবা তাহাই কাজ। কারখানা ছাড়িয়া হিতলাল চলিতে আরম্ভ করিলেন। যেন কোন এক অজানা শক্তি তাঁহাকে প্রবল আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই জানেন না। মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া চলিয়াছেন হিতলাল। কিছু সময় পর রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ট্রেন্ দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেনে উঠিয়া পৌঁছাইলেন হাওড়া ষ্টেশনে। হিতলালের কোন খেয়াল নাই। টিকিট ঘরের সামনে গিয়া বলিলেন—"একটি টিকিট দিন।"

টিকিটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাইবেন?"

হিতলাল বলিলেন—"এই কয়টা টাকা আছে, ইহাতে যাহা হয় একটা টিকিট দিন।"

প্রৌঢ় টিকিটবাবু বুঝিলেন হয়ত ভদ্রলোক কোন কারণে মনোবেদনা পাইয়াছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখনও কাশী গিয়াছেন?"

হিতলাল বলিলেন—"না, কখনও কাশী যাই নাই।"

টিকিটবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে কাশী যান, এই টাকায় হইয়া যাইবে। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় শান্তিলাভ করিবেন।"

হিতলাল জানিতেন কাশীতে বাঙালীটোলা বলিয়া একটি জায়গা আছে, সেখানে অনেক বাঙালী বাস করেন। কাশী রেলষ্টেশনে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাঙালীটোলা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সরু গলিপথ ধরিয়া হিতলাল চলিতেছেন। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত হিতলাল কোথায় যাইবেন কিছুই জানেন না। যেন চলিতে হইবে তাই চলিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন একটি বাড়ি হইতে সৌম্যমূর্ত্তি এক ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন—"এই যে, এদিকে আসুন।"

হিতলাল বিস্মিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। নিকটে গিয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। তাহলে ডাকলেন কেন?"

ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"সে কথা পরে হবে, আপনি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। আগে স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করুন।"

হিতলাল ভাবিলেন এই ভদ্রলোক তাঁহার কষ্টের কথা জানিলেন কি করিয়া?

হিতলালের জন্য স্নানাহার ও বিশ্রামের যথোচিত ব্যবস্থা হইল। বিশ্রামান্তে অন্যান্য লোকের সহিত আলাপ করিয়া হিতলাল জানিলেন ইনিই সেই মহাত্মা যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র।

এমন সময় যোগিরাজ নিজ ঘরে হিতলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—"আপনার দীক্ষালাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাই আমিই আপনাকে আনিয়াছি।"

হিতলাল লুটাইয়া পড়িলেন যোগিরাজের চরণতলে। মহাযোগীর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন হিতলাল।

যোগিরাজের প্রতিবেশী এক যুবক চন্দ্রমোহন দে, সবেমাত্র ডাক্তারী পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। চন্দ্রমোহন ছিল রামমোহনের ভ্রাতা। একদিন চন্দ্রমোহন আসিয়া যোগিরাজকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া আধুনিক চিকিৎসার নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমোহন নূতন ডাক্তার হইয়াছে,

উৎসাহের অন্ত নাই। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা দিক্ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল।

যোগিরাজ জানিতে চাহিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৃতের সংজ্ঞা কি?

মৃতের যাহা সংজ্ঞা চন্দ্রমোহন তাহা বুঝাইয়া বলিল।

কৌতুকভরে মৃদু হাসিয়া যোগিরাজ বলিলেন—"আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ ত চন্দ্রমোহন আমি জীবিত না মৃত?"

চন্দ্রমোহন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবাক হইল। দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। হৃৎপিণ্ডও স্তব্ধ। চন্দ্রমোহন কি বলিবে ভাবিয়া পায় না।

হঠাৎ যোগিরাজ মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে চন্দ্রমোহন, আমাকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দাও।"

চন্দ্রমোহন আরও বিপদে পড়িল। কি উত্তর দিবে চিন্তা করিতেছে। অকস্মাৎ চন্দ্রমোহনের মাথায় এক বুদ্ধি খেলিয়া গেল। চন্দ্রমোহন বলিল—"ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতাম, কিন্তু আপনি যে কথা বলিতেছেন। মৃত ব্যক্তি ত কথা বলিতে পারে না।"

যোগিরাজ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঠিকই বলেছ। কিন্তু জেনে রেখো তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের ঊর্দ্ধে আরও অনেক কিছু জানার আছে। সেখানে তোমাদের বিজ্ঞান যেতে পারে না। কিন্তু যোগীরা সহজেই সেই জ্ঞানের সন্ধান পান।"

এই ঘটনাটি চন্দ্রমোহনের জীবনে স্মরণীয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে কৃতী চিকিৎসক হইয়াও চন্দ্রমোহন অধ্যাত্মপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

যোগিরাজ চাহিতেন সকলে সংসারে থাকিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করুক এবং তাহারই মাঝে যোগকর্ম্ম করিয়া ধীরে ধীরে আত্মোন্নতি লাভ করুক। তিনি স্বয়ং সেই আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নিজে সাধারণ সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া, সাধারণ বদলির চাকরি করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া এবং তাহারই মাঝে একটু একটু সাধন করিয়া সাধনার সর্ব্বোচ্চশিখরে পৌঁছিয়া সাধারণ গৃহী মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এমন আদর্শ আর কেহ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। সংসারে থাকিয়া সাধন ভজন করিবার সময় পাই না কাহারও এই অজুহাতকে তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন যদি কাহারও ঈশ্বর সাধনার প্রকৃত সদিচ্ছা থাকে তবে সংসারে থাকিয়াও তাহা করা সম্ভব। অপরের উপর নির্ভর

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা তিনি একেবারেই সমর্থন করিতেন না। তিনি জানিতেন আধুনিক স্বোপার্জ্জনরত মানবকে অর্থসঙ্কটগ্রস্ত সমাজের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। তাই তিনি প্রাচীন যোগীর কঠোর আদর্শগুলি অনুমোদন করেন নি। নিজ গৃহে গুপ্তভাবে সাধনশীল যোগীর সুযোগসুবিধার প্রতিই তিনি অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম ঋষি প্রদর্শিত কঠিন যোগ প্রণালীগুলিকে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া, যোগের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহার পথ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি জানিতেন আধুনিক ক্ষীণজীবী মানবের পক্ষে প্রাচীন কঠোর যোগসাধন করা সম্ভব নহে। তাই তাহার প্রাচীন জটিলতা দূর করিয়া সাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষফলপ্রদ সহজসাধ্য অনাড়ম্বর সরল যোগসাধনে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াসের পূর্ব্বে ভারতীয় প্রাচীন কঠোর যোগসাধন সাধারণের নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান ছিল। এই যুগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই কঠোর প্রাচীন যোগসাধনকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া দেশের যে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা মানবসমাজ কোন দিনই ভুলিবে না। তাঁহার এই প্রয়াস মানবসমাজকে আত্মানুসন্ধানের জন্য আরও উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া দিয়াছে। আজ আর যোগসাধন গৃহস্থ মানব সমাজের কাছে কোন কঠিন কর্ম্ম নহে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণও সকলেই যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষ ছিলেন। তাঁহারাও সংসারে থাকিয়া বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া বর্ণাশ্রমের বিধি অনুসারে যোগযুক্ত অবস্থায় সকল কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা।

গৃহিযোগী শ্যামাচরণ বলিতেন বর্ত্তমান কালের মানুষের পক্ষে ভক্তিপথে সাধন করা বড়ই কঠিন। সমস্যা জর্জ্জরীভূত সমাজে, আধুনিক বিশ্বাস-বিহীন বিলাসবহুল সমাজে তেমন ভক্তিমান্ ব্যক্তি খুবই কম। তাই তিনি সহজ সরল আড়ম্বরহীন যোগসাধনের প্রতি মানবকে আকৃষ্ট করিয়া বলিতেন এই যুগোপযোগী সহজ যোগসাধন গণিতশাস্ত্রের ন্যায় একেবারে অভ্রান্ত। জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে কোন মানুষ ইহা করিতে সক্ষম। মানব-প্রেমিক শ্যামাচরণ এইভাবে সামাজিক মঙ্গলসাধনে ব্রতী ছিলেন।

তখনকার দিনে জাতিভেদ প্রথা বড়ই প্রবল ছিল। যোগিরাজ উচ্চ ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তৎকালে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে জাতিভেদ প্রথা না মানিয়া চলা বড়ই কঠিন কাজ ছিল। এ হেন কর্ম্মে তেমন ব্যক্তিকে

সমাজ শাস্তি প্রদান করিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করিত না। ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যোগিরাজ সাধনক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা গ্রাহ্য করেন নাই।

পরিগণিত বর্ণের রামপ্রসাদ জয়সোয়াল ওকালতী করিতেন। যোগিরাজ সমক্ষে যে সমস্ত ভক্তরা বসিয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামপ্রসাদও তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া প্রতিদিন উপদেশ শ্রবণ করিতেন। রামপ্রসাদের এই আচরণে ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হন এবং একদিন প্রকাশ্যে তাহা বলিয়াও ফেলিলেন। কিন্তু জয়সোয়াল কোন প্রতিবাদ না করিয়া ভক্তসুলভ চিত্তে নীরব রহিলেন।

কিছু সময় পর যোগিরাজ জয়সোয়ালকে ডাকিয়া বলিবেন—"আমি যে আসনে বসে আছি তুমি এখানে বস।" এই বলিয়া তিনি নিজ আসন হইতে কিছুটা সরিয়া বসিলেন।

জয়সোয়াল বড়ই কুণ্ঠাবোধ করিতে লাগিলেন। গুরুমহারাজের আসনে বসিবেন, ইহা কেমন করিয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব!

উপস্থিত ভক্তশিষ্যদের মধ্য হইতে রায়বাহাদুর গিরীশ প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়[১] যিনি উক্ত বিষয়ে অধিকতর আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি যোগিরাজের এই আদেশে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নিজ গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং জয়সোয়ালকে নিজ পার্শ্বে টানিয়া লইয়া বসাইলেন।

এইভাবে যোগিরাজ ভেদাভেদ না রাখিয়া ঈশ্বর সাধনার জন্য সকলকে সমান মর্য্যাদা প্রদান করিতেন।

* * * *

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে জাহ্নবী-বেষ্টিত শিবক্ষেত্র কাশীধাম বৈদিক যুগের প্রাক্কাল হইতেই ভারতের মানুষকে অধ্যাত্মপথে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক হিসাবে এই শিবপুরী আজও তাহার গতি অব্যাহত রাখিয়াছে। রাজা মহারাজা হইতে সাধু সন্ন্যাসী ও ফকির সকলেই এই শিবধামে আসিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা চালিয়া দেন বাবা বিশ্বনাথের চরণে। এখানে আসিলে সকলেই সমান।

(১) ইনি রাজসাহী জেলার কাশিমপুরের জমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৮২ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল যোগিরাজের নিকট দীক্ষা লাভ করেন।

তদানীন্তন কাশ্মীররাজ শিবক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই গৃহিযোগীর কথা শুনিয়াছিলেন। একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন যোগিরাজের নিকট, কখন কি ভাবে রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাহা অবগত হইবার উদ্দেশ্যে।

কর্ম্মচারীটি আসিয়া রাজার ইচ্ছা নিবেদন করায় যোগিরাজ বলিলেন—"রাত নয়টার পর যখন লোকজন কেহ থাকিবে না তখন রাজা একাকী আসিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে একজন বিশ্বস্ত লোক সাথে আনিতে পারেন। কিন্তু এখানে আসিবার বিষয় রাজাকে গোপন রাখিতে হইবে।"

যথাসময়ে রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যাভিবাদন শেষে রাজা যোগিরাজের সহিত আলোচনা করিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন এই গোপনীয়তার কারণ কি?

যোগিরাজ বলিলেন—"আপনি রাজা, বহুলোক আপনাকে চেনে। আপনি প্রকাশ্যে আসিলে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে। সেইজন্যই গোপনীয়তা পালনের নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম।"

রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তদানীন্তন নেপালাধীশ এবং বর্দ্ধমানরাজও ঐরূপ গোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হন।

যোগিরাজ তাঁহার নির্দ্ধারিত সাধন পথে কয়েকটি ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সাধক সাধনা করিয়া যেমন যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তেমন তেমন সাধনার উচ্চতর ক্রমগুলিও প্রাপ্ত হইবে। এই নিয়ম তিনি নিজে সারাজীবন মানিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সাধকদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাহারও ক্রমভঙ্গ করিবার উপায় ছিল না।

একদিন এক ভক্ত করজোড়ে নিবেদন করিলেন—"আপনার অবর্ত্তমানে পরবর্ত্তী ক্রমগুলি কাহার নিকট শিক্ষা করিব তাহার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা আপনি থাকিতে থাকিতে করিয়া যান।"

উত্তরে যোগিরাজ বলিলেন—"কত খড় ভেসে গেল আমি ত কোন ছার। যখন তোমার সময় হবে তখন সাহারা মরুভূমিতে থাকলেও ঠিক পাবে।"

যোগিরাজ কাহাকেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। ইহা তাঁহার প্রদর্শিত সাধন-পন্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিতেন—যে কোন ধর্ম্ম বা যে কোন মতাবলম্বী মানুষই হোক না কেন এই যোগসাধন

করিতে বাধা নাই। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সহ সকল হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এক কথায় সকল মানুষই এই যোগসাধন করিতে পারে, কোন প্রতিবন্ধ নাই। তিনি বলিতেন ইহা আত্মসাধনা। সব জীবদেহেই একই আত্মা বিরাজমান। সুতরাং আত্মসাধনায় কোন বাধা নাই। যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস, যাহার যে দেব-দেবীতে ভক্তি, যাহার যাহা ইষ্ট তাহাই থাকিবে। আপন আপন বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া চল। তাই দেখা যায় সকল প্রকার হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের ও শ্রেণীর মুমুক্ষু ও সত্যানুসন্ধানী ভক্তগণ তাঁহার পদাশ্রয় লাভ করিয়াছিল। আবদুল গফুল খাঁ নামে এক দরিদ্র মুসলমান ভক্ত তাঁহার নিকট যোগসাধন পাইয়া অনেক উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

যোগিরাজ স্বয়ং বহু ভক্তকে যোগক্রিয়া প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর করেন। তিনি ঠিক কতজনকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে পরবর্ত্তীকালে বিখ্যাত যোগিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তাঁহার ঋষিসম পুত্রদ্বয় তিনকড়ি লাহিড়ী ও দুকড়ি লাহিড়ী এবং পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, স্বামী প্রণবানন্দ গিরি, স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি, ভুপেন্দ্রনাথ সান্যাল, স্বামী কেশবানন্দ, স্বামী কেবলানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, কাশীনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, প্রসাসদাস গোস্বামী,[১] কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ সান্যাল,[২] রামদয়াল মজুমদার, হরিনারায়ণ পালধী প্রভৃতি মহাশয়গণ। ইহা ছাড়া শোনা যায় ভাস্করানন্দ সরস্বতী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী আপন আপন সাধনপথ ছাড়াও যেগিরাজ প্রদর্শিত যোগসাধন অনুশীলন করিয়াছিলেন। স্বপুত্রসহ তদানীন্তন কাশীরাজ, নেপালাধীশ, কাশ্মীররাজ, বর্ধমানরাজ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের মানবগণও তাঁহার নিকট যোগসাধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে সমাজের নিম্নস্তরের শত সহস্র মানুষও তাঁহার নিকট মুক্তিপথের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন গৃহস্থ অপেক্ষা বড় আশ্রম নাই, কারণ গার্হস্থ আশ্রমের উপর অপর আশ্রমগুলি প্রতিষ্ঠিত।

(১) প্রসাদদাস গোস্বামী ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃঃ যোগিরাজের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

(২) মহেন্দ্রনাথ সান্যাল ১৮ই অক্টোবর ১৮৮৮ খৃঃ যোগিরাজের নিকট দীক্ষা লাভ করেন।

ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিন আশ্রমকে সে ভরণ-পোষণ করে। তাই গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ আশ্রম।

পরবর্ত্তিকালে আরও দেখা যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য ও লালগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়ের[১] নিকট হইতে কাজী নজরুল ইসলাম ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এই মহান্ ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হইয়াছিলেন[২]। রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে ঠাকুর সীতারামদাস ওঁকারনাথ এই যোগদীক্ষা পাইয়াছিলেন। এই যোগই তাঁহাদের জীবনকে এত সুন্দর ও সর্ব্বদিকে সফলকাম করিয়াছিল। এই মহান্ যোগই ছিল তাঁহাদের জীবনের প্রধান গুপ্ত চাবিকাঠি। এই চাবিকাঠি দ্বারাই তাঁহারা আপন আপন হৃদয় মন্দিরের প্রধান ফটক খুলিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের জীবনকে উন্নত ও চরমোৎকর্ষ প্রদান করিয়াছিল। এই যোগকর্ম্ম করিয়াই তাঁহারা হৃদয়-দেবতার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই জগৎকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ মানুষ এই যোগকর্ম্ম করে না বলিয়াই তাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি অমার্জ্জিত থাকে, এবং ধর্ম্মের বাহ্য চটকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া আজ দেশে এত অন্যায়। তাই যোগিরাজ বলিতেন—এই যোগসাধন করিলে তবেই মানুষের জীবন সুন্দর ও মহিমময় হয়। আত্মার যে মান তাহার প্রতি হুঁস হয়, তখনই প্রকৃত মানুষ হয়। কিন্তু এই হৃদয় মন্দিরের প্রধান ফটক খুলিবে কেমন করিয়া? যোগিরাজ বলিয়াছেন—"উলট পবনকা ঠোকর মারে খোলে দরওয়াজা।" অর্থাৎ যে শ্বাসরূপী পবন উপর হইতে নিম্নগামী হইয়াছে অর্থাৎ বহির্ম্মুখী হইয়াছে তাহাকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া ঠোকর ক্রিয়ারূপ কৌশলের দ্বারা সেই হৃদয় মন্দিরের প্রধান ফটক খুলিতে হইবে। আবার লিখিয়াছেন—"ওঁ জোরসে ধক্কা দেনেসে তব দরওয়াজা খুলেগা।" (ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ে জোরে ধাক্কা দিলে তবেই হৃদয় মন্দিরের দরজা খুলিয়া যায়।) আরও লিখিয়াছেন—"ওঁ জেয়াদা জোরসে হৃদয়মে ঠোকর মারনেসে আপসে আপ নেসা হোয় ও ঠহর জেয়াদা হোয়।" পুনরায় লিখিয়াছেন—"জোরসে ওঁমে ঠোকর মারনেসে জেয়াদা স্থির হোতা হয়।" (ঠোকর ক্রিয়ারূপ ওঁকার ক্রিয়া বলপূর্ব্বক

(১) শোনা যায় ঋষি অরবিন্দ এই বরদাবাবু সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"The greatest yogi of modern Bengal."

(২) নেতাজীর দীক্ষা হইয়াছিল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন, সোমবার, বাংলা ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ সাল।

করিতে থাকিলে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয় আর তখনই কঠিন দরজা খুলিয়া যাওয়ায় অজ্ঞান দূরীভূত হয়। এই ঠোকর ক্রিয়া করিতে থাকিলে আপনা হইতেই গাঢ় নেশা হইবে এবং স্থির ঘরে অধিক সময় অবস্থান হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মন পরের দুঃখে কাতর হয়) তাই তিনি গাহিলেন—

দুখ দুসরেকা দেখ কর দয়া কর হৃদয়,
তবই পায়গে চৈতন্যরূপ জস চন্দ্রোদয়।
আপনে সামর্থ কোশিশ করো হোমত নিঠুর,
পরমাত্মা সন্তুষ্ট হুয়েসে মন হোত মধুর।
তরজাও আপ অমরপদ ওঁহা করো বাসা,
চলো রাহ সদ্‌গুরুকা করো ওহি উপদেশা॥

যোগিরাজ বলিতেন—সব মূর্ত্তি ত একেরই। মূর্ত্তি ভেদে স্বরূপ ভেদ কল্পনীয় নহে। এই প্রকার মূর্ত্তি দর্শন, উপদেশ শ্রবণ ও ভাব অনুসারে তাঁহার সহিত লীলা ও নানাপ্রকার ব্যবহার এসব অধ্যাত্মমার্গের বহিরঙ্গ মাত্র। চরমে অদ্বৈত ভূমি প্রাপ্ত হইতেই হইবে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ও পূর্ণ সার্থকতা অদ্বৈত স্থিতিতে, সেখানে ভক্ত ও ভগবানে ভেদ থাকে না। এক অব্যক্ত আত্মসত্তা স্বয়ং প্রকাশরূপে বিরাজ করে।

প্রাথমিক ভগবদ্ দর্শন বা শ্রবণ তেমন কঠিন নহে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ দর্শন দুরূহ ব্যাপার। বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়া এবং অতি কঠোর সাধনা করিয়া সাধনার প্রকৃত ভূমিতে উন্নীত হইলে প্রকৃত ভগবদ্ দর্শন লাভ করা যায়। যোগী জীবশিবে পরমশিবরূপী আত্মসাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষের মন যেরূপ বিশ্বাসহীন ও শ্রদ্ধাহীন তাহাতে এই প্রকার দর্শনও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মন বর্ত্তমান যুগে কেবল তর্ক ও সংশয়প্রবণ। সরল বিশ্বাস বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুর্লভ। তাই সহজলভ্য বস্তুও এখন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যোগদীক্ষা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাক্রমের উপর আধৃত। যেমন ২ + ২ = ৪ হয় তেমনি যৌগিক ক্রিয়াগুলির যথাযথ অভ্যাসলব্ধ অনুভূতি আনন্দলোকের এক একটি ক্রমিক দ্বার খুলিয়া দিতে থাকে। পৃথিবীতে যদি মানুষের আত্মধর্ম্ম নামক কোন তত্ত্ব থাকে, তাহা এই যোগধর্ম্ম—যাহার তাত্ত্বিক অংশ যোগদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং কালাতীত সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে এই সত্যের বেশকিছু স্থূল প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মানুষের সাধনপদ্ধতির মধ্যে যোগতত্ত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

সম্পর্ক দেখা যায়।[১] ভগবান্ গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে চালনা করেন এবং যখন তাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক সেই জ্ঞান, উপদেশ ইত্যাদি দান করিয়া থাকেন। এই গুরুই সদ্গুরু। এই সদ্গুরু একবার প্রাপ্ত হইলে আর গুরুর অভাবজনিত দুঃখ অনুভব হয় না।

যে সত্যকে ধারণ করিবে তাহার হৃদয় যদি বিশ্বাসহীন অথবা সংশয়গ্রস্ত হয় তাহা হইলে ভগবৎ কৃপাশক্তি প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরানুগ্রহ ভাবের মুখে পাওয়া সহজ, কিন্তু নিজ সাধন বলে বা ধারণাশক্তির দ্বারা ধরিয়া রাখা এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মশক্তির বিকাশ ঘটান অত্যন্ত কঠিন।

জ্ঞান বলিতে সাধারণ জ্ঞানকে বুঝায়, কিন্তু বিজ্ঞান বলিতে পুস্তকস্থ জ্ঞান বা বিচার তর্ককে বুঝায় না, ভাব বা কল্পনাও নহে। উহা প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রত্যক্ষ অনুভূতি অর্থাৎ বিশেষরূপ জ্ঞান যাহা তাহাই বিজ্ঞান। উহাকেই আত্মজ্ঞান বলে। দৃশ ধাতু জ্ঞানার্থক। অতএব দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থই জ্ঞান। যে বস্তু অনন্তাকারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুকে দর্শনই আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার। ইনিই পরমাত্মা, কিন্তু অনুভবীয়। জীবাবচ্ছেদে আমার তোমার সহিত একাকার হইয়া রহিয়াছেন। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"আত্মা হ বৈ গুরুরেকঃ"[২] ইত্যাদি। আত্মাই গুরু।

অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী ভক্তি, ভক্তি নহে। প্রয়োজন স্থায়ী ভক্তির। যে অবস্থায় ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ একাকার হইয়া যায় তাহাই প্রকৃত স্থায়ী ভক্তির অবস্থা। যে অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হইয়া যায় তাহাই বিজ্ঞানাবস্থা। ইহাকেই যথার্থ ভক্তি বলা যায় বা জ্ঞানও বলা যায়। যতক্ষণ মন বহির্দ্দেশে ঘুরিতে থাকে ততক্ষণ জ্ঞান ও ভক্তি আবৃত থাকে। মন অন্তর্মুখী হইলে ঈশ্বর কৃপায় ব্রহ্মাপথে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তখন আবরণ অপসৃত হয় এবং আত্মবান্ হওয়ায় ধর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ উদঘাটিত হয়— "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্, গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।"[৩] ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহার ভিতর নিহিত আছে। সেই গুহার ভিতর যাহা

---

(১) অধ্যাপক ডঃ শিবনারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের Elements of Indian Aesthetics গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিষয়টির ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক দিকে আলোকপাত করা হইয়াছে।

(২) কুলার্ণবতন্ত্র।

(৩) মহাভারত বনপর্ব্ব, বক-যক্ষ সংবাদ।

নিহিত আছে তাহাই শাশ্বত ব্রহ্ম। এই গুহা কি কোন পর্ব্বত গুহা? যদি তাহা হইত তাহা হইলে সেই পর্ব্বত গুহায় যাইয়া সকলেই ধর্ম্মতত্ত্বকে জানিয়া লইত। তাহা নহে। উহা সকল মানব শরীরে কূটস্থরূপে বিরাজমান। উহাকে গগনগুহাও বলে। কূটস্থের মধ্যবর্ত্তী যে বিন্দুরূপ গুহা সেই গুহার অভ্যন্তরে মনকে প্রবেশ করাইতে পারিলে চিন্ময় অনু প্রত্যক্ষ হয়, তখন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বা গূঢ় রহস্য উদ্ভাসিত হয়। একমাত্র প্রাণকর্ম্মের দ্বারাই উহা সম্ভব এবং যোগী মাত্রেই এই কূটস্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাই যোগিরাজ ২৯শে মার্চ (সাল নাই) লিখিয়াছেন—**"অন্তরভেদ খুলা স্থানে ভিতর ভিতর স্বাসা চলনেকা রাহ মিলা মন ধ্যান শব্দ এহী অসল হয়—ইসিকো যোগিলোগ গহ্বর কহতে হয়।"**—অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবার রাস্তা খুলিয়া গেল অর্থাৎ ভিতরে ভিতরে শ্বাস চলিবার (সুষুম্নাপথে) মত অবস্থা পাইলাম। এই অবস্থায় পৌঁছিয়া মনন, ধ্যান ও ওঁকার ধ্বনি যাহা শোনা যায় তাহাই আসল, ইহাকেই যোগিগণ গুহা বলেন। **"এসা সব বিন্দি চলতা দেখা বিচমে সফেদ যোনিকে ওহি বড়া চাঁদ ছোটা জব তব রহে তো উস্কা তারা কহতে হয় ওহি ছিদ্র হয়।"**—ত্রিকোন যোনির মধ্যে সাদা বিন্দু চলিতেছে দেখিলাম, উহা যখন বড় দেখায় তখন উহাকেই চাঁদ বলে এবং যখন ছোট দেখায় তখন তারা বলে। উহাই ছিদ্র, ঐ ছিদ্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই তত্ত্ব বিশ্বাস বা দার্শনিক রহস্য নহে। যিনিই নিয়ত যোগারূঢ় তিনি প্রতিদিনই একটি বিশেষ যৌগিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকালে এই কূটস্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—**"বালাগ্রসাহস্রং অর্দ্ধতস্য ভাগস্যভাগসঃ। তস্যভাগস্য ভাগার্দ্ধং তদজ্ঞেয়ঞ্চ নিরঞ্জনম্॥"**[1] অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে যে বিন্দুস্বরূপ অনু তাহার পরিমান একটি চুলের অগ্রভাগের হাজার ভাগের এক ভাগের অর্দ্ধেক, তাহার অর্দ্ধেক ভাগ অর্থাৎ চুলের অগ্রের চার হাজার ভাগের এক ভাগ। সেই ব্রহ্মের অনু এত সূক্ষ্ম যে বুদ্ধি দ্বারা তাহা স্থির করিবার উপায় নাই, তন্নিমিত্ত উহা অব্যক্ত পদ অর্থাৎ জীব শিব না হইলে নিজ বোধ হয় না। **"সূক্ষ্মত্বাত্তদ বিজ্ঞেয়ং"**।[2]—সূক্ষ্মত্ব জন্য অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি জীবগণের শরীরে কূটস্থ হইতে নীচে চঞ্চল প্রাণরূপে রহিয়াছেন এবং ভ্রূর উর্দ্ধে আদিত্য হৃদয়ে স্থির প্রাণরূপে রহিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গম সবই

---

(১) ব্রহ্মোপনিষদ ষষ্ঠ সূত্র।

২ গীতা ৩।১৬

তিনি। তিনি যখন ব্রহ্মানুরূপে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, তখন তিনি অবিজ্ঞেয়, তখন তাঁহাকে বিশেষরূপে জানা যায় না তাই তিনি 'জ্ঞানাতীতং নিরঞ্জনম্'। সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের তত্ত্ব অজ্ঞানিগণ জানে না বলিয়া তাহাদের কাছে তিনি দূরস্থ, কিন্তু জ্ঞানিগণ আত্মতত্ত্বপরায়ণ বলিয়া নিত্য-সন্নিহিত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, আবার সাধন দ্বারা তিনিই জ্ঞান-গম্য। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"উজিয়ালে মে সূক্ষ্মবস্তু কা দর্শন হোতা হয়, অন্ধিয়ালে মে নহি—জয়সে সূর্য্যকে জোত মে কোই ঘরকে ভিতর ছেদ হোকে আয় তো যো ধুল সব উড়তা হয় এক এক করকে সব দেখাতা হয়, লেকন ছাএ মে কুছ নহি—ব্রহ্ম সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হয়, ইস লিএ প্রথম জ্যোত মে দেখলাতা হয়—ফির জব অন্ধকার কে আঁখ হোতা হয় তব অন্ধকার সব চিজ দেখনে মে আতা হয়—য়ানে বিজ্ঞান পদ।" যিনি যে মার্গেই চলুন না কেন প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে তাঁহাকে এই ঋষি প্রদর্শিত পথে যাইতেই হইবে।[1]

যিনি মননশীল তিনিই মুনি।[2] মনের দ্বারা যাহা কৃত হয় তাহাই মত। প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে এমন এক নেশার উদয় হয় যখন আর কথা বলিতে ইচ্ছা থাকে না, তাহাই প্রকৃত মৌন অবস্থা। কিন্তু কথা বলিতে ইচ্ছা আছে অথচ কথা বলিব না, আড়ে-ঠারে প্রকাশ করিব, তাহা প্রকৃত মৌন নহে। ইচ্ছার নাশ হইলে মৌন অবস্থা আপনা হইতে আসিবে, কিন্তু ইচ্ছা থাকিতে মৌন পালন হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চঞ্চল মনকে অবলম্বন করিয়া সত্যের (আত্মার) সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অখণ্ড সত্যের দর্শনলাভ সুদূরপরাহত। সেই আত্মসত্যের ধারণা করিতে হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। সেই নিরুদ্ধ অবস্থায় আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক উদ্ভাসিত হয়। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন ঐ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। ইহা মনের স্বভাব। বিকল্পশূন্য পরম সত্যকে (আত্মসত্যকে) পাইতে হইলে মনের উর্দ্ধে যাইতে হইবে। এই অবস্থায় মতামতের কোন প্রশ্নই থাকে না। কারণ

(১) পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে যোগশাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় পরিমাণ বিজ্ঞানে সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ ধরা হইয়াছে অনুকে। দুইটি অনু= ১ দ্ব্যনুক, তিনটি দ্ব্যনুক=১ ত্রসরেণু, ৮ ত্রসরেণু=১ কেশাগ্রভাগ অথবা রথচক্রোৎক্ষিপ্ত-ধূলিকণা। মন অনুপরিমাণ, যাহার পরিমিতি কেশের অগ্রভাগ অপেক্ষা ৪৮ গুণ সূক্ষ্ম। কূটস্থের মধ্যবিন্দু কেশাগ্রভাগ অপেক্ষা ৪০০০ গুণ সূক্ষ্ম। অতএব সেখানে মনেরও গতি নাই। একমাত্র সর্বত্রগ আত্মাই সেখানে প্রবিষ্ট আছেন।

(২) মত, মনন ও মুনি সবই মন্ ধাতুর রূপান্তর।

মন যেখানে নাই সেখানে মত কোথায়? মন ও প্রাণ এই দুটি সত্তাকে একভাবে আত্মধ্যানে গতি ও স্থিতি করাইতে পারিলে প্রকৃত ভক্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু ইহা দীর্ঘ সাধনা ভিন্ন হইতে পারে না। ভগবৎ প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম স্বভাব-প্রকৃতি (আত্মভাব) অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ ঘটিবে। জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি আপনা হইতেই হইবে। তাই যোগিরাজ বলিতেন—**"গুড়ের ময়লা টানতে টানতে সাদা হয়, তেমনি প্রাণায়াম করতে করতে নির্ম্মল হয়।"** তিনি ভক্তদের শিক্ষা দিতে গিয়া আরও বলিতেন—**"উল্টো লিখে আয়না দিয়ে দেখলে সোজা দেখায়, তদ্রূপ দেহস্থ বায়ুকে উল্টাইলেও স্বরূপ দেখায়।"** শুদ্ধা ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। এই শুদ্ধা ভক্তি অজ্ঞান না কাটিলে পাওয়া যাইতে পারে না। তাই তিনি বলিতেন—**"ওষ্ঠ কণ্ঠ দন্ত প্রকৃতিতে বায়ুর জোর প্রাণায়ামে পড়িলে জ্ঞানের স্বানুভব হওয়ার নাম ভক্তি।"** কিন্তু অজ্ঞান কাটিবে কি করিয়া? যোগিরাজ বলিতেন—**"উত্তম প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে আপনা হইতেই অজ্ঞান দূরীভূত হইবে।"** ইহাই স্বধর্ম্ম। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥[১]

অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মাপেক্ষা দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে দোষযুক্ত হইবেই। ইহা অভ্যাসসাপেক্ষ। এই আত্মধর্ম্মরূপ স্বধর্ম্ম করিতে করিতে যদি নিধনও হয় অর্থাৎ দেহপাত হয় তাহাও ভাল; কিন্তু পরধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম সর্ব্বদাই আশঙ্কাজনক অর্থাৎ ভয়াবহ, কারণ প্রাণের চঞ্চল গতি ভগবৎ সান্নিধ্য হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখে। সে কারণ জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য্য।

যোগিরাজ বলিতেন—প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতিরেকে প্রেম ভক্তি ভালবাসা জন্মায় না; যেমন পুত্রহীনের পুত্র-প্রেম সম্ভব নহে। আবার পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার সাথে সাথে কি ঐ পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রেম-ভালবাসা জন্মায়? তাহা নহে। যতই পুত্রকে প্রতিদিন দেখিবে, লালন পালন করিবে ততই পুত্রের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ক্রমে ক্রমে মনের অজ্ঞাতে জন্মিয়া থাকে। যে ঈশ্বরকে কখনও দেখ নাই তাহার প্রতি আন্দাজে প্রকৃত প্রেম-ভক্তি কি প্রকারে সম্ভব? হয়ত বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের ফলে লক্ষ মানুষের

(১) গীতা ৩।৩৫

মধ্যে কাহারও তেমন প্রেম জন্মাইতে পারে। প্রতিদিন প্রাণকর্ম্মরূপ সুকৌশলযুক্ত যোগকর্ম্ম করিতে থাকিলে কিছু না কিছু আত্মজ্যোতিঃ অবশ্যই দর্শন হইয়া থাকে। যতই প্রতিদিন আত্মজ্যোতিঃ দর্শন হইতে থাকিবে ততই তোমার অজ্ঞাতে উহার প্রতি প্রেম-ভক্তি জন্মাইবে। কেবলই ইচ্ছা জাগিবে সেই অপরূপ চিরনির্ম্মল আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে যাহা দৃশ্যমান জগতে দেখা যায় না। এইভাবে প্রত্যক্ষ দর্শন যতই বাড়িতে থাকিবে, উহার প্রতি প্রেম-ভক্তিও ততই বাড়িতে থাকিবে। শেষে নির্নিমেষ নয়নে আত্মজ্যোতিঃ দর্শনে তন্ময় প্রাপ্ত হইলে প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ারা হইবে। তখনই অজ্ঞান কাটিয়া গিয়া প্রকৃত শুদ্ধাভক্তি জন্মাইবে। অতএব ঈশ্বর সত্তার দর্শন ব্যতিরেকে ঈশ্বরে প্রকৃত প্রেম-ভক্তি সম্ভব নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম্ম সাপেক্ষ।

প্রত্যেক মনুষ্যদেহে মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত আছেন। এই শক্তিকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যতক্ষণ জাগাইতে না পারা যায় ততক্ষণ সাধন-ভজন বাহ্য ব্যাপারে পর্য্যবসিত হয়। সাধনার উদ্দেশ্য মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়া সেখানকার আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য উপভোগ করা নহে। ঐ জাতীয় ভোগ বিনা সাধনাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা কৃত সুকর্ম্মের ফলভোগ মাত্র, প্রকৃত সাধনার ফল নহে। সাধনার দ্বারা জীব অনন্ত মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া, শিবত্ব বা স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ণতত্ত্বে উপনীত হয়। সেকারণে যোগীকে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতেই হইবে। জীবের আত্মা শিবস্বরূপ মঙ্গলময়, মোহ ও অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে। এই শিবরূপী আত্মা ব্যোমতত্ত্বে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে শবরূপে সুপ্ত অবস্থায় আছেন। এই সুপ্তাবস্থাকে জাগাইতে হইবে। প্রাণকর্ম্মের দ্বারা কণ্ঠে বায়ু স্থির হইলেই সুপ্তাবস্থা চলিয়া যায়। কণ্ঠে বায়ু স্থির হইলেই নীলকণ্ঠ। পাঁচ চক্র পাঁচটি তত্ত্বের কেন্দ্র। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। শক্তি সকল চক্রেই সমপরিমান। কিন্তু মূলাধার চক্রে শক্তি জাগরিত হইলে সেই বায়বী শক্তি সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে এবং ক্রমে সকল চক্রস্থ শক্তি জাগ্রত হইয়া চরমাবস্থায় পূর্ণ জাগরিত হইয়া পাঁচটি চক্রই মুক্ত হইয়া যায়। তখন আর অজ্ঞানের আভাসমাত্রও থাকে না। তখন আত্মার অজ্ঞান নিদ্রারূপ আবরণ ভাঙ্গিয়া যাইয়া শিব-শক্তির মিলন হয়। আজ্ঞাচক্রে ইহাই শিব-শক্তির বা প্রকৃতি-পুরুষের মহামিলন অর্থাৎ স্থিরত্বের সহিত চঞ্চলতার চিরসমাধি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাগুরু

প্রতিদিন সকালে যোগিরাজ রাণামহল ঘাটে স্নান করিতে যান, সঙ্গে থাকে তাঁহার অনুগত ভক্ত কৃষ্ণারাম। সেদিনও যোগিরাজ স্নান শেষে কৃষ্ণারাম সহ গলিপথ দিয়া ফিরিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন— "কৃষ্ণারাম কাপড়া ফাড়" (কাপড় ছেঁড়)।

কৃষ্ণারাম ঠিক বুঝিতে পারে না, কি বলিলেন তাঁহার গুরুমহারাজ।

কয়েক পা যাইতেই পাশের বাড়ির ছাদ হইতে একটি ইট আসিয়া পড়িল যোগিরাজের পায়ের উপর। একটি আঙ্গুল কাটিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তিনি নিজের কাপড় হইতে খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া আঙ্গুলটি বাঁধিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণারাম সাহায্য করিল।

তারপর কৃষ্ণারাম করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ, ইটটা পড়িবে ইহা যদি পূর্ব্ব হইতে আপনার জানা ছিল তাহা হইলে সরিয়া গেলেন না কেন? তাহা হইলে আর এই আঘাত পাইতে হইত না।"

যোগিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা হয় না কৃষ্ণারাম। যদি সরে যেতাম তাহলে ঐ ভোগ অন্য কোন সময় সুদ সমেত মেটাতেই হত। যা প্রাপ্য তা ত পেতেই হবে, বরং যত তাড়াতাড়ি মিটে যায় ততই ভাল।"

কৃষ্ণারামের দুই পুত্র ও এক কন্যা। রাত্রে আহারান্তে সকলে শুইয়াছে। স্ত্রী অনুযোগ করিয়া স্বামীর নিকট বলিল—"ছোট ছেলের পৈতার সময় অতিক্রম হতে চলেছে, তার পৈতার কোন ব্যবস্থা করলে না? যত তাড়াতাড়ি পার উপনয়নের ব্যবস্থা কর।"

কৃষ্ণারাম গরীব ব্রাহ্মণ, কোন রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পুত্রের উপনয়ন দিবার মত অর্থ কোথায়? সে গুরুমহারাজের একান্ত সেবক। কৃষ্ণারাম ওসব কিছু চিন্তাই করে না। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া বলে— "গুরুমহারাজের যখন কৃপা হবে তখন ঠিকই উপনয়নের ব্যবস্থা হবে। আমার ত পয়সা নেই। অহেতুক চিন্তা করে কি করব? যাঁর চিন্তা তিনিই করবেন।

কৃষ্ণারাম পরদিন সকালে উঠিয়া গুরুমহারাজকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য প্রতিদিনের ন্যায় যোগিরাজের বাড়ি গিয়াছে।

যোগিরাজ বসিয়া আছেন নিজ আসনে। কৃষ্ণারাম আসিয়া প্রণাম করিতেই যোগিরাজ নিজ আসনের তল হইতে তিরিশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—"এই টাকা দিয়া শাস্ত্রমতে তোমার পুত্রের উপনয়ন দাও। আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।"

কৃষ্ণারাম কুণ্ঠিত হইয়া বলে—"গুরুমহারাজ, আপনি আমায় সদাই কৃপা করেন। আমি আপনার ঠিকমত সেবাও করতে পারি না। আপনি আমায় টাকা দেবেন কেন?"

যোগিরাজ বলিলেন—"দেখ কৃষ্ণারাম, দেবার মালিক একজনই, তিনি ত কারো না কারো হাত দিয়েই দেন। এখন আমার হাত দিয়ে তিনিই দিচ্ছেন, তাহলে তুমি নেবে না কেন?"

কৃষ্ণারাম সাদরে গ্রহণ করে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যোগিরাজের এক প্রিয় ভক্ত, সাধনায় বেশ উন্নত। সংসারের পঙ্কিল পরিবেশে থাকিয়া ভগবৎ সাধনা করা খুবই কঠিন, তাই তাঁহার মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন সংসার ছাড়িয়া যাইবেন। কিন্তু গুরুদেবের অনুমতি ত চাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন যোগিরাজ সমীপে আসিয়া সন্ন্যাস লইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

যোগিরাজ সব শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তোমার পৈতার ভার বেশী না জটার ভার বেশী? তুমি কি সাধু বলে নিজেকে প্রচার করতে চাও যাতে তোমায় লোকে মান্য করে এবং কিছু অর্থ উপার্জ্জন হয়? দেখ, গেরুয়া পরলে লোকে যদি সাধু হতে পারে; তবে গাধা ঘোড়া সাধু হত। তাদেরও ত গেরুয়া রং, তবে তাদের সাধু বলবে না কেন? ওসব পাগলামি ছেড়ে দিয়ে সংসারে থাক, স্বোপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ কর, আর ঈশ্বর সাধনা কর। অপরের দান লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে না।"

অবনত মস্তকে চলিয়া যান পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।[১]

যোগিরাজ বলিতেন ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম জগতের কঙ্কালস্বরূপ মঠ, মিশন ও আশ্রমের অভাব নাই। মঠ-মিশন করিলে ঈশ্বর সাধনা হয় না, ঐগুলি ঈশ্বর সাধনার অন্তরায়। কেমন করিয়া মঠ-মিশন আরও বাড়িবে সেই দিকেই লক্ষ্য নিযুক্ত থাকে। তাই তিনি নিভৃত ও গোপন সাধনার উপর

(১) ইনিই পরে কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন

গুরুত্ব দিতেন বেশী। তিনি বলিতেন গেরুয়া পরিলে লোকে সাধু বলিয়া চিনিতে পারে, তাহাতে সাধনার ব্যাঘাত হয়। সাদা কাপড়ে থাকিলে লোকে চিনিতে পারে না, সাধনাও হয় ভাল। সন্ন্যাসী জীবন বড় কঠিন, সেজন্য তিনি কোন ভক্তকেই সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দেন নাই। অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসী এমন ভক্ত তাঁহার অনেকেই ছিলেন। তিনি গৃহীকে গৃহে থাকিতে বলিতেন এবং সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ ছিল যে যে আশ্রমে আছ সেই আশ্রমে থাকিয়াই আত্মসাধনা কর, পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। তিনি পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন রঙিন পোষাক পরিয়া সাধু হইলেই যে ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। যে যেমন পোষাকে আছ, যে যেমন পরিবেশে আছ তাহাই তোমার অনুকূল হইবে, সেইভাবে থাকিয়াই আত্মসাধনা করিয়া চল তাহা হইলেই জীবন সফল হইবে)

একবার তাঁহার জনৈক শিষ্য কেদারনাথ দের স্ত্রীর কলেরা হইল। স্ত্রী মরমর। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া সংসার, এ অবস্থায় স্ত্রীবিয়োগ হইলে বড়ই বিপদ। কেদারনাথ ছুটিয়া আসিয়া করজোড়ে প্রার্থনা জানায় গুরুচরণে—"ঠাকুর, আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিন, নইলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়ব।" কেদারনাথ কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন।

যোগিরাজ সামাজিক রীতি অনুযায়ী বলিলেন—"ভাল ডাক্তার দেখাও।"

কেদারনাথ কাঁদ কাঁদ স্বরে প্রার্থনা জানায়—"ডাক্তার ডেকে কোন লাভ নেই। আপনি কৃপা করুন নইলে স্ত্রীকে বাঁচান যাবে না। আমি আপনার শরণাপন্ন, যা করবার আপনিই করুন।"

মহাযোগীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। বলিলেন—"আমি যা বলব তা তুমি করতে পারবে?"

কেদারনাথের মনে আশার ঝিলিক জাগে। বলে—"আপনি যা আদেশ করবেন তাই করব।"

যোগিরাজ বলিলেন—"যাও এক শিশি গোলাপজল নিয়ে এস।"

কেদারনাথ অবিলম্বে দোকান হইতে এক শিশি গোলাপজল লইয়া আসেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"বাথরুমে যাও এবং নিজ দাস্ত অল্প একটু ঐ গোলাপজলে মিশিয়ে সত্বর গিয়ে রোগীকে খাইয়ে দাও।"

কেদারনাথ তাহাই করায় রোগী পুনর্জ্জীবন লাভ করিল।

যোগিরাজ সর্ব্বদা লৌকিক রীতি অনুযায়ী চিকিৎসকদের কাজের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ লইতেই বলিতেন। তাঁহার প্রদত্ত ঔষধগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল না, উহা এক একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

এই দেবতুর্লভ মহাযোগী সর্ব্বদা ভক্তদের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। সকল সময় তিনি ভক্তদের উপদেশ দিতেন, শিক্ষা দিতেন যাহাতে তাহারা সাধনায় উন্নতিলাভ করিতে পারে।

যোগিরাজ বলিতেন সকলেরই দেহে ছয়টি চক্র আছে, উহাকে ষট্‌চক্র বলে। ঐ ষট্‌চক্রই সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যদি তোমরা প্রাণকর্ম্মের দ্বারা অবলম্বনশূন্য হইতে পার অর্থাৎ শূন্যকে আশ্রয় কর তাহা হইলে উহারা কিছুই করিতে পারিবে না। তখন বুঝিবে ষট্‌চক্র ভেদ হইয়াছে। শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে, ঐ কিছুই নহে অবস্থায় অবস্থান করিলে কোন বাধা থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গকেই সৎসঙ্গ বলে। কারণ যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণই জীবের সত্তা (সৎ + তা) ; অতএব শ্বাসই সৎ। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সঙ্গ করিতে পারিলে শূন্যে স্থিতি হয়, তখন কর্ত্তৃত্ব, চিন্তা, পাপ, পুণ্য, ইচ্ছা সবই চলিয়া যায় ও স্বভাব (আত্মভাব) প্রাপ্তি হয়। কুণ্ডলিনী হইতেছেন আধার শক্তি ; ইনি সুপ্তা। ইনি স্থূলকে অবলম্বন করিয়া ধরিয়া আছেন। ইঁহাকে আধারচ্যুত করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইনি শিবকে অর্থাৎ শূন্যকে আশ্রয় করিয়া নিরাশ্রয় বা নিরালম্ব হইবেন—"নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।" জীব প্রথমে স্থূল তত্ত্বকেই আশ্রয় মনে করে। কিন্তু শূন্যতত্ত্ব যেখানে কোন অবলম্বন নাই তাহাই জীবের প্রকৃত আশ্রয়। কণ্ঠের ঊর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করিলে তবেই জীবের স্থায়ী রক্ষা হয়। আজ্ঞাচক্র হইতে দুই দিকে যাওয়া যায়—উপরে অব্যক্ত নীচে ব্যক্ত।

তাঁহার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি সব সময়ই অধ্যাত্ম কথাগুলির সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেন। সেজন্য উহা সাধকদের হৃদয় স্পর্শ করিত। তিনি বলিতেন—যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্থির হয় তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহাতে স্থির হয় না তাহাই অধর্ম্ম। কর্ম্ম কখনও বন্ধের কারণ নহে। কর্ম্মের ফল প্রত্যাশাই বন্ধের কারণ। কর্ম্মের কোন ভাল মন্দ ভেদ নাই। মোহের সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়া কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম মন্দ ফল প্রসব করে। যাহাতে কূটস্থে স্থিতি হয় তাহাই শুভ, যাহাতে

স্থিতি হয় না। তাহাই অশুভ। সাধারণ মানুষ আত্মকর্ম্ম করে না, তাই তাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি অমার্জ্জিত থাকিয়া যায়। কেবলমাত্র পাপ-পুণ্যের ফলভোগের জন্য মানবদেহ ধারণ করা হয় নাই। পাপ-পুণ্যের অতীত শুদ্ধ নিষ্কাম আত্মকর্ম্মের জন্যই এই মানবদেহ। যতদিন আত্মকর্ম্ম সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন মানবদেহ ধারণ করিতেই হইবে, উহার প্রয়োজন শেষ হইবে না। আত্মকর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে, তাহা ইহ জন্মেই কর অথবা পরজন্মেই কর। মানবদেহ ব্যতীত আত্মকর্ম্ম করিবার উপায় নাই। দেহকেই ক্ষেত্র বলে। 'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।'[১] হে কৌন্তেয়, (জ্ঞানের প্ররোহ ভূমি বলিয়া এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, কারণ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই দেহের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহা কিছু বাহ্য জগতে আছে সবই এই দেহে আছে। তাই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়) মন ও প্রাণের দ্বারা এই দেহকে কর্ষণ করিতে পারিলে অমৃত ফল উৎপন্ন হয়। তাই মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"এমন মানব জমীন্ রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।" এই দেহেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে জীব শিবে পরিণত হয়। ইহা পূর্ণ করিবার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ। যোগী আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সেই কর্ম্মের প্রভাবে তাহার সংঘাতগুলি ক্রমশঃ চলিয়া যায়। আত্মকর্ম্মের কখনও গতিরোধ হয় না এবং আত্মকর্ম্মের দ্বারা একবার দেহাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যু ও কালের অতীত হইয়া যায়। এই দেহই ধনুঃ, শ্বাস তীর। এই তীর-ধনুঃ যিনি চালনা করেন তিনিই আত্মারাম। সেই রাম অবিনাশী। তিনি দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট এই দেহরূপ রথের ভিতর অবস্থান করেন বলিয়া তিনিই দাশরথি। তাই যেগিরাজ লিখিয়াছেন—"জিহ্বা তালুকে ভিতর গড়ায় দিয়া—ওঁকার ধ্বনি যো শুনাতা হয় সোই মূলমন্ত্র রামনাম হয়।" —জিহ্বাকে তালুকুহরে বসাইয়া দিলাম। এই অবস্থায় আত্মকর্ম্ম করিতে করিতে এখন যে ওঁকারধ্বনি শুনিতেছি তাহাই মূলমন্ত্র রামনাম। পুনরায় লিখিয়াছেন—"অব বালম খিরা মিলা জিভ তালমূলমে লগনেসে ঠাণ্ডা মালুম হোতা হয়।"—খেচরী সাধন হইলে ব্রহ্মদর্শনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। বালম খিরা অর্থে কচি শশা। কচি শশার অভ্যন্তরে যেমন ফাঁকা জায়গা থাকে, তালুকুহরেও ঠিক সেই প্রকার থাকে। তাই যোগিরাজ বলিতেছেন

(১) গীতা ১৩২

খেচরীর সঠিক রাস্তা পাইলাম এবং এই প্রকারে খেচরী সাধন হইলে তালুকুহরে ঠাণ্ডা অনুভব হয়।

যোগীর কর্ম্মই প্রধান। গীতাতেও শ্রীভগবান্ তাহাই বলিয়াছেন—"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।"[১]—জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদের সিদ্ধি।

সাংখ্য অর্থাৎ যাহার দ্বারা "আমি কে" ইহা বিদিত হওয়া যায় তাহাই সাংখ্য। 'আমি' শব্দ আমি নহে, এই দেহও আমি নহে। এই দেহের ভিতরে যিনি চিৎস্বরূপে বর্ত্তমান তিনিই প্রকৃত আমিপদবাচ্য। এই দেহের অস্তিত্ব নির্ভর করে অজপারূপ (শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ) কর্ম্মের বিদ্যমানতায়। এই কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীত অবস্থায় জ্ঞানের অবস্থা লাভ হইলে "আমি কে" ইহা জানা যায়, ইহাই সাংখ্য। উক্ত কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অজপারূপ সাংখ্যের অর্থাৎ সংখ্যার স্থিতি হইয়া থাকে। সংখ্যা বা সাংখ্য কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাল অনন্ত, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সেই কাল ঘটস্থ হইয়া অর্থাৎ দেহস্থ হইয়া অজপারূপে সংখ্যায় পরিণত হইতেছে এবং এই সংখ্যা দেহমধ্যে দিবারাত্রে ২১৬০০ বার হইয়া থাকে। এই অজপারূপ (শ্বাস-প্রশ্বাস) সংখ্যার অবস্থাই জীবের বর্ত্তমান অবস্থা। এই সংখ্যার প্রতি জীবের লক্ষ্য নাই। জীব কেবল ইহার অবস্থায় মুগ্ধ হইয়া মায়ায় জড়িত হইয়া থাকে। ঐ অজপারূপ সাংখ্যে লক্ষ্য করিলে ইহার অতীতাবস্থা লাভ করিয়া প্রকৃত 'আমিকে' বিদিত হওয়া যায়। এইজন্য ইহার নাম সাংখ্য-দর্শন। উক্ত সাংখ্যে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ শ্বাসের গতিতে লক্ষ্য করিয়া প্রাণের গতির সংখ্যা করিতে করিতে ঐ গতির অতীতাবস্থায় জ্ঞানাবস্থা লাভ হইয়া সাংখ্যদিগের (যাঁহারা ঐ সংখ্যা করেন তাঁহাদিগের) মনের স্থিতি হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের স্থিতি। আর কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের স্থিতি—কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম—প্রাণের উর্দ্ধাধোগতির ক্রিয়ারূপ আত্মকর্ম্ম। যাঁহারা যোগী তাঁহাদের এই আত্মকর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের মিলনরূপ ইড়া ও পিঙ্গলার গতি এক হইয়া সুষুম্নামার্গে লয় হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি হইয়া থাকে। ইহাই কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের স্থিতি। "জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের স্থিতি" ইহা বাহ্যভাবে

---

(১) গীতা ৩।৩

শুনিলে মনে হয় যে ভগবান্ দুই রকমের কার্য্য দ্বারা স্থিতির কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা একই কর্ম্ম এবং উভয় অবস্থা একই অবস্থা, কারণ ভগবান্ ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"[১]—লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম বা প্রাণকর্ম্ম ব্যতিরেকে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

* * *

মূর্ত্তিপূজা বা স্থূল পূজায় অবিশ্বাসী ইন্‌জিনিয়ার ভূতনাথ সেন চাকরী করেন আসামে। সেখানেই তিনি এই গৃহিযোগীর নাম শুনিয়াছেন। ভারতীয় যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ ভূতনাথের প্রবল। সেজন্য তিনি অনেক গ্রন্থও পড়িয়াছেন। শেষে তিনি বুঝিয়াছেন গ্রন্থ পড়িয়া প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব এবং যোগশাস্ত্র জানা যায় না। ঐ অঞ্চলে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট গেলেন, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না কিছুতেই। আরও কিছু যেন জানিতে ও পাইতে চান ভূতনাথ। তাই তিনি একসময় কাশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন যোগিরাজ সমীপে।

ভূতনাথ প্রণাম করিয়া বসিতেই যোগিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাশী এসেছ, গঙ্গা স্নান এবং বিশ্বনাথ দর্শন করেছ ?"

নিরাকারবাদী ভূতনাথ বলিলেন—"আমি শিলাময় বিশ্বনাথ দর্শন করতে আসি নি, চিন্ময় বিশ্বনাথ দর্শন করতে এসেছি।"

যোগিরাজ বলিলেন—"এ বিষয়ে তোমার সঠিক জ্ঞান নেই। তুমি প্রথমে গঙ্গাস্নান এবং বিশ্বনাথ দর্শন কর, তারপর এখানে এস।"

ভূতনাথ গঙ্গাস্নানান্তে বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়া পূজা দিবার সময় বিশ্বনাথের মূর্ত্তির স্থলে যোগিরাজেরই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল।

এইভাবে তিনি প্রচলিত নিয়মগুলি সকলকেই মানিয়া চলিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন—আত্মকর্ম্ম দ্বারা স্থিতি প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা ভাল।

---

(১) গীতা ৩।৪

পরদিন ভূতনাথ পুনরায় উপস্থিত হন যোগিরাজের নিকট।

যোগিরাজ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভূতনাথ প্রণাম করিয়া বসিলেন।

যোগিরাজ কয়েকটি তত্ত্বকথা শুনাইলেন ভূতনাথকে। গল্পেরছলে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলেন।

এতক্ষণ ভূতনাথ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। যোগিরাজ যখন থামিলেন, ভূতনাথ করজোড়ে বলিলেন—"আমার যাহা যাহা জানিবার ছিল সেগুলি পাছে ভুল হইয়া যায় সেজন্য একটি কাগজে লিখিয়া পকেটে রাখিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল একে একে সেগুলি জানিয়া লইব। কিন্তু আপনি এতক্ষণ আমার সেই সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিয়াছেন। আমার আর জানিবার কিছু নাই, সব উত্তর পাইয়াছি।

ভূতনাথ মুগ্ধ হন এবং যোগিরাজের নিকট যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

যোগিরাজ দীক্ষা প্রদানকালে ভক্তদের নিকট হইতে মাত্র পাঁচটি টাকা এবং বিধবাদের নিকট হইতে দশ টাকা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। তিনি সারাজীবন এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার উত্তর সাধকদেরও ঐ নিয়ম পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে কোন গরীব ভক্ত দীক্ষা লইতে চায় কিন্তু পাঁচ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, সেক্ষেত্রে তিনি নিজে তাহাকে পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার এক ধনী ভক্ত, যিনি কাশীধাম হইতে অনেক দূরে বাস করিতেন, তিনি কাশীস্থ এক ভক্তের নিকট একশত টাকা রাখিয়া দিয়াছিলেন, প্রয়োজনে গরীব ভক্তকে সাহায্য করিবার জন্য। যোগিরাজ ঐ দীক্ষার টাকা আলাদা করিয়া রাখিতেন। তাঁহার গুরু বাবাজী মহারাজ তাঁহার দলের কোন ভক্ত সন্ন্যাসীকে মাঝে মাঝে যোগিরাজের নিকট পাঠাইয়া ঐ টাকা লইয়া যাইতেন। ঐ টাকা তাঁহার সন্ন্যাসী দলের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইত। দীক্ষা লওয়ার পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত করিবার শাস্ত্রীয় বিধান আছে, তাহাতে অনেক ঝামেলাও আছে। সেকারণে যোগিরাজ ঠিক করিয়াছিলেন শিষ্যদের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উক্ত অর্থ তাঁহার গুরুদেবের ও তাঁহার সাধুভক্তদের সেবায় লাগিলে সেই ফল হইবে।

যোগিরাজ তাঁহার এক ভক্তকে লিখিয়াছিলেন—"আমি আরও কিছুতেই নই তন্নিমিত্ত বিরক্তও নই। শ্রীযুক্ত রামদাস মৈত্র আমার বন্ধু তাহাকে এই পত্র আমার দেখাইয়া তাহার প্রতি ভক্তি হয়। তাহার নিকট উপদেশ লইতে পাঁচ টাকা তাহাকে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত দিয়া পরে

সাবকাশ মত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমার প্রতি দক্ষা ক্রিয়ার দ্বারায় যার নাম ধর্ম্ম—গুরুবাক্যে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যদিকে মন থাকিলে পাপ—নতুবা পাপ নাই। গুরু ভক্তির দ্বারায় সমুদায় হইতে পারে কিন্তু তাহা দুর্লভ। বিনা মন স্থির ও সংযম না হইলে সুকঠিন সংসারে থাকিয়া সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান হইতে পারে না, আত্মাই পরমাত্মা নারায়ণ ইহা দেখা ও বোধ হওয়া সতত ধ্রুব ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহার আর পাপ পুণ্য কিছু নাই কারণ সে সকলেতেই ব্রহ্ম দেখিতেছে। সমরূপে স্থিতি—এইটি কাজে হওয়া চাই, কথায় হইলে কথার কথা—সকল ব্রহ্ম——আমি সকল অপেক্ষায় ছোট।"

বাবাজী মহারাজ অনেক সময় তাঁহার দলের সাধুদের নিকট তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্যামাচরণের প্রশংসা করিতেন। ইহাতে একবার তাঁহার দলের এক সন্ন্যাসী ভক্তের মনে অসূয়ার উদ্রেক হয়। তিনি বাবাজী মহাশয়কে বলেন—"শ্যামাচরণ গৃহী মানুষ, আপনি তাঁর এত প্রশংসা করেন কেন?"

বাবাজী কোন উত্তর না দিয়া কিছুদিন পর সেই সন্ন্যাসী ভক্তকেই শ্যামাচরণের নিকট পাঠাইলেন দীক্ষার টাকা লইবার জন্য। সন্ন্যাসী শ্যামাচরণের নিকট আসিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন এই সুযোগে শ্যামাচরণকে পরীক্ষা করিতে হইবে। শ্যামাচরণও ইহা বুঝিতে পারিলেন। শ্যামাচরণের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া উভয়ের মধ্যে অনেক তত্ত্বকথা হইতে লাগিল। পাশে একটি টবে বিশল্যকরণী গাছ ছিল। সেখান হইতে একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া সেই পাতাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এবং মায়া ও ব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। আলোচনা এত গভীরে প্রবেশ করিল যে কখন রাত্র পোহাইয়া গেল তাহা কাহারও খেয়াল নাই। হঠাৎ যোগিরাজ বলিলেন—"সকাল হইয়া গিয়াছে, চলুন এবার গঙ্গা স্নান করিয়া আসি।"

যোগিরাজের জ্ঞানের গভীরতায় সন্ন্যাসী ভক্তটির ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন কেন বাবাজী মহারাজ তাঁহার এই গৃহী ভক্তটির এত প্রশংসা করিতেন।

যোগিরাজের বাড়ির অনতিদূরে তাঁহারই ভক্ত গোয়ালা জয়পালের বাড়ি। জয়পালের এক পুত্রের হঠাৎ কলেরা রোগ হয়। পুত্রের জীবনের আশা খুবই কম। গরীব পরম ভক্ত জয়পাল আসিয়া উপস্থিত হইল

গুরুমহারাজের নিকট। আসিয়া দেখিল তাহার গুরুমহারাজ প্রতিদিনের ন্যায় বসিয়া আছেন নিজ আসনে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে। জয়পাল কিছুটা দূর হইতে প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পর মহাযোগী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। জয়পাল কম্পিত কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইল—তাহার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য।

তখন কাশীতে তিখুরের জিলাপি পাওয়া যাইত। তিখুর পানিফল জাতীয় একপ্রকার ফল। যোগিরাজ বলিলেন—"পেটভরে তিখুরের জিলাপি এখনই খাইয়ে দাও।"

জয়পাল অবিলম্বে তাহাই করায় পুত্রটি আরোগ্যলাভ করিল।

যোগিরাজ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা হরিমোহিনীর এবং কনিষ্ঠ পুত্র দুকড়ির বিবাহ দিয়াছিলেন বিষ্ণুপুরে। সেই উপলক্ষ্যে তিনি মাত্র দুইবার বিষ্ণুপুর গিয়াছিলেন এবং তখন সেখানে অনেকেই তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। এইরূপে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি প্রথম বিষ্ণুপুর আসেন। তিনি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সাল রাত্রি নয়টার সময় কাশী হইতে ট্রেনে রওয়ানা হইয়া পরদিন বৈকাল পাঁচটার সময় পানাগড় ষ্টেশনে নামেন এবং সেখান হইতে গরুরগাড়ী করিয়া বিষ্ণুপুর পৌঁছান। কলিকাতা হইতে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পানাগড়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি পুনরায় বিষ্ণুপুর আসেন। সে সময়েও পানাগড় ষ্টেশনে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

বিষ্ণুপুরে কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শিবদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাজ করিতেন। কৈলাসবাবু যোগিরাজের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু দীক্ষার জন্য যে পাঁচটি টাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহার নাই। তাই তিনি শিবদাসবাবুর নিকট গিয়া পাঁচটি টাকা অগ্রিম চাহিলেন। শিবদাসবাবু সব শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন—"তুমি যে দীক্ষা পাবে তা যদি আমাকে সব বল তাহলে টাকা দেব।"

কৈলাসবাবু তাহাতে রাজি হইলেন এবং পাঁচ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করিলেন।

কৈলাসবাবু দীক্ষা লইতে আসিয়াছেন যোগিরাজের নিকট। হঠাৎ

যোগিরাজ বলিলেন—"তুমি দীক্ষার বিষয় সব বলিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছ, তোমাকে দীক্ষা দিব না।"

কৈলাসবাবু অঙ্গীকার করিলেন তিনি কাহাকেও বলিবেন না। কিন্তু তাহাতেও যোগিরাজ সম্মত হইলেন না। শেষে কৈলাসবাবু শিবদাসবাবুর নিকট গিয়া বলিলেন—"যোগিরাজ সব জানিতে পারিয়াছেন, তিনি দীক্ষা দিবেন না।"

শিবদাসবাবু হাস্য করিয়া বলিলেন—"তোমাকে দীক্ষার বিষয় কিছুই বলিতে হইবে না। আমি পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম। তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর।"

তারপর কৈলাসবাবু দীক্ষা পাইলেন। এই কৈলাসবাবু পরে বিখ্যাত যোগী হইয়াছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দুকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। কাশীর বহু চিকিৎসককে দেখাইয়াও কিছুমাত্র উপশম হইল না। অনেকে বর্দ্ধমানের তিরোলের কালীবাড়ি হইতে ঔষধ আনিয়া দিতে বলিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও সাধারণ লোকাচার সম্পূর্ণরূপে মান্য করিতেন। তাই তিনি তাঁহার এক ভক্ত তারকেশ্বরের ষ্টেশন মাষ্টারকে পত্র লিখিয়া জানিলেন যে তারকেশ্বর হইতে তিরোল প্রায় নয় ক্রোশ দূর এবং রাস্তাও ভাল নহে। অপরদিকে তিনি জানিলেন যে বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে তিরোল প্রায় সাত আট ক্রোশ দূর এবং রাস্তাও ভাল। সেকারণে তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাশী হইতে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামিলেন। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব হইতেই পালকি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পালকি করিয়া যোগিরাজ তিরোল যান এবং সেখানকার কালীবাড়ি হইতে ঔষধ লইয়া কাশী ফিরিয়া যান। কিন্তু সেই ঔষধেও পুত্র আরোগ্যলাভ করিল না দেখিয়া কাশীমণি দেবী বলিলেন—"তুমি থাকতে অন্য ঔষধের প্রয়োজন কি?" ইহার পর যোগিরাজ একটি শিকড় দিয়াছিলেন। তাহা খাওয়াইলে পুত্র আরোগ্যলাভ করিল।

* * * *

স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে কাশীধাম পরিক্রমার নিয়ম আছে। ইহাকে "পঞ্চক্রোশী যাত্রা" বা "পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা" বলে। প্রায় ৫০।৬০ মাইল

পথ নগ্নপদে হাঁটিতে হয় এবং তাহাতে সাধারণতঃ ৫।৬ দিন সময় লাগে। খাদ্যদ্রব্য সহ বহু যাত্রী মিলিত হইয়া "জয় শিব শম্ভো" ধ্বনি দিতে দিতে পথ চলিতে থাকে। প্রতি বৎসরই এই পরিক্রমা হইয়া থাকে।

একবার যোগিরাজের পরম ভক্ত উকিল রামপ্রসাদ জয়সোয়াল ঐ "পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা" করিবেন ঠিক করিলেন। তিনি প্রতিদিনই অন্ততঃ একবার তাঁহার গুরুমহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসেন। তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন ঐ পাঁচ-ছয়দিন তাঁহার গুরু দর্শন হইবে না। তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহার গুরুমহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন যাহাতে তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া আবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারেন।

(প্রকৃত "পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা" কাহাকে বলে তাহা যোগিরাজ জয়সোয়ালকে বুঝাইয়া দিলেন, বলিলেন—এই শরীরই পঞ্চকোষাত্মিকা কাশী। পঞ্চকোষযুক্ত এই দেহকে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারায় পরিক্রমা করাই প্রকৃত পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। এই পরিক্রমা করিতে পারিলে প্রাণবায়ু সহস্রারে স্থিতিলাভ করে। উহাই ব্যোমতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব। তখনই প্রকৃত কাশীর অধিষ্ঠাতা দেবাদিদেবের সাক্ষাৎকার হয়। বাহিরে যে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা উহা বাহ্য ব্যাপার। উহাতে আত্মদর্শন হয় না। কিন্তু তিনি কখনও কাহাকেও ধর্ম্মের বাহ্য ব্যাপারগুলি অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিতেন না। বলিতেন ঐগুলি করা ভাল, উহাতে মনের শুদ্ধতা আসে। তাই তিনি জয়সোয়ালকে পরিক্রমায় যাইতে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন)

গুরুমহারাজের আশীর্ব্বাদ লইয়া পরদিন প্রত্যূষে জয়সোয়াল পরিক্রমায় রওয়ানা হন এবং যথারীতি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার গুরুদর্শন করেন।

সদ্‌গুরুর আশীর্ব্বাদ এইভাবেই ভক্ত জয়সোয়ালের জীবনে সার্থক হইয়াছিল।

তিনি বলিতেন একমাত্র আত্মকর্ম্মই কর্ম্ম, অপর সবই অকর্ম্ম। কিন্তু জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কিছু কর্ম্ম করিতেই হইবে। তাই কর্ম্মকে কখনও সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা যায় না। তিনি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই, তিনি নিজেও তাহা করেন নাই। বরং বলিতেন সংসারী মানুষের অর্থও চাই পরমার্থও চাই, কোনটাই বাদ দিলে চলিবে না। সংসারকে যাহারা ত্যাগ করিয়া যায় তাহারা দুর্ব্বল। সকলের মাঝে থাক

এবং এমন কর্ম্ম কর যাহাতে ঐগুলির প্রতি আসক্তি চলিয়া যায়। আসক্তিই বাধা, আসক্তি না থাকিলে কিছুই বাধা সৃষ্টি করে না। আসক্তির উৎপত্তি ইচ্ছা হইতে, ইচ্ছার উৎপত্তি চঞ্চল মন হইতে এবং চঞ্চল মনের উৎপত্তি চঞ্চল প্রাণ হইতে। কিন্তু স্থির প্রাণে কোন ঢেউ থাকে না। অর্থাৎ মন, ইচ্ছা, আসক্তি কিছুই থাকে না। তখনও কামিনীকাঞ্চন থাকিবে কিন্তু তাহার প্রতি ইচ্ছা বা আসক্তি না থাকায় ঐগুলি আর বাধার সৃষ্টি করিবে না। এককথায় ইচ্ছাতীত বা নিষ্কাম হইতে হইবে। যতক্ষণ ইচ্ছার অধীনে থাকিবে ততক্ষণ আসক্তি ও বাধা থাকিবেই। অতএব আত্মকর্ম্মের দ্বারা প্রথমে ইচ্ছা বা কামনার নাশ কর। ইচ্ছার নাশ হইলে আসক্তিশূন্য অবস্থা আসিবে, তখন কামিন-কাঞ্চন এবং সংসার কিছুই বাধা নহে। তাই তিনি জোর দিয়া বলিতেন—**'খেচরী করণে সে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হয়।'**

তিনি বলিতেন—নারী কখনও পুরুষের নিকট বাধাস্বরূপ হইতে পারে না। যদি নারী পুরুষের প্রতি বাধাস্বরূপ হয়, তাহা হইলে পুরুষরাও নারীর প্রতি বাধাস্বরূপ হইতে বাধ্য। উভয়েই ঈশ্বর সৃষ্ট, ঈশ্বরের সৃষ্টি বজায় রাখিতে হইলে উভয়কেই প্রয়োজন। উভয়েরই আত্মসাধনা করিবার সমান অধিকার আছে। অতএব কেহই কাহারও প্রতি বাধাস্বরূপ নহে। ভগবানের বাণীকে লক্ষ্য কর, তিনি বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥[১]

খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি সবকিছুরই জন্য অর্থ প্রয়োজন। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত, কিন্তু কোন প্রকারেই অর্থের কীট বা অর্থের দাস হওয়া উচিত নহে। তোমরা ভাব অনেক অর্থ রোজগার করাটাই পুরুষার্থ। তাহা নহে। কতটা তেজস্বী হইয়া আত্মসাধনা করিতে পারিলে তাহাই প্রকৃত পুরুষার্থ। যে মনকে অর্থ রোজগারের দিকে সর্ব্বদা নিয়োজিত রাখ সেই মনকেই যদি কিছুটা ঈশ্বর সাধনায় রাখিতে পার তাহার চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। ঈশ্বর সাধনার জন্য তোমরা সময় পাও না বল, তাহা ঠিক নহে। কিছুটা সময় বাহির করিয়া লইয়া সকলেরই আত্মসাধনা করা উচিত। তাই মরমী সাধক বলিয়াছেন—

যবতক্ জিন্দেগী রহেগী, ফুরসৎ না মিলেগী কামসে ;
কুছ সময় এ্যায়সা নিকালো, লগন লগা লো রামসে।

(১) গীতা ৯।৩২

আত্মারামের সহিত যোগসূত্র স্থাপন কর, কূটস্থে তাঁহাকে ধরিয়া থাক।

বর্ত্তমান চঞ্চল মনের দ্বারা আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইতে পারে না। কারণ যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ মনও চঞ্চল থাকিবে। যতক্ষণ মন চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ আসক্তিও থাকিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চিন্তা, ভাবনা, আসক্তি, প্রেম, ভালবাসা, অহংভাব, দেহবোধ ইত্যাদি যতপ্রকার শারিরীক ও মানসিক বৃত্তি এবং ধর্ম্ম আছে সবই চঞ্চল প্রাণ হইতে জাত। এক কথায় জীবিতাবস্থার যাহা কিছু লক্ষণ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয়। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে প্রাণ চঞ্চল হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসও চালু থাকিবে, জীবও জীবিত থাকিবে। তাই যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকিবে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবে ততক্ষণ উপরিউক্ত সকল প্রকার শারিরীক-মানসিক বৃত্তি ও ধর্ম্মগুলিও থাকিবে। আবার যতই প্রাণকর্ম্ম করিবে ততই প্রাণ স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হইবে। যতই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হইবে ততই ঐ বৃত্তি ও ধর্ম্মগুলি কমিতে থাকিবে। এইভাবে যখন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া যাইবে অর্থাৎ স্পন্দন রহিত হইয়া যাইবে তখন উহারা কেহই থাকিবে না। কারণ স্থির প্রাণে কোন বৃত্তি বা দেহবোধ থাকে না। উহাই প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। চঞ্চলতার অবসানে পঞ্চভৌতিক এই দেহ তখনই শুদ্ধ হয়। সেইজন্য মৃতের কোন জাতি থাকে না। আবার উহাই প্রকৃত উপবাস। উপ অর্থাৎ সমীপে। প্রাণ স্থির হইলেই আত্মসমীপে বাস করা হয়। খাদ্য ত্যাগকরারূপ উপবাস প্রকৃত উপবাস নহে। আবার তিনিই পুরোহিত। কারণ এই দেহরূপ পুরে একমাত্র তিনিই বাস করেন এবং তিনি স্থির হইলেই জীবের প্রকৃত হিত হয় অর্থাৎ মঙ্গল হয়, তাই তিনিই জীবের হিতকারী পুরোহিত। প্রাণের দুই দিকে দুইটি পাল্লা, একটি চঞ্চল অপরটি স্থির। একদিক বাড়িলে অপর দিক্ কমিবে।

তাই এক ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই চঞ্চল মন কি উপায়ে বেশ ভাল থাকে?"

যোগিরাজ বলিলেন—"মনের অস্তিত্ব না থাকিলে।"

প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা এ সবই নির্ভর করে দেহে প্রাণের চঞ্চল অবস্থার অস্তিত্বের উপর। মাতা-পুত্রের ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, ঈশ্বরের

প্রতি ভক্তের ভালবাসা; এই সবের মূলে সেই প্রাণ। দেহ দেহকে ভালবাসে না। প্রাণ প্রাণকেই ভালবাসে। কারণ ভালবাসার উৎসস্থলই প্রাণ। প্রাণহীন দেহে প্রেম-ভালবাসা নাই। যাহার দ্বারা স্ত্রীকে আলিঙ্গন কর, তাহারই দ্বারা কন্যাকে আলিঙ্গন কর। তাই তোমরা প্রথমে নিজ প্রাণকে ভালবাস, তাঁহার সেবা কর (প্রাণকর্ম্ম করাই তাঁহার সেবা করা), তাঁহাকে দেখ (প্রাণকর্ম্ম করিলেই তাঁহাকে দেখা যায়)। তাহা হইলেই বিশ্বপ্রাণকে জানিতে পারিবে, তখন সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে সমদর্শন করিবে। যেমন সমুদ্রের যে কোন এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সমুদ্র দর্শন করিলে সমুদ্রের জ্ঞান হয়, সমস্ত সমুদ্র দেখিবার প্রয়োজন হয় না। তেমনি নিজ দেহস্থ প্রাণকে দেখিলেই মহাপ্রাণের জ্ঞান হয়।

* * * *

যোগিরাজ প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও কৃষ্ণারাম সহ গঙ্গাতীরে রাণামহল ঘাটে বৈকালিক ভ্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মাঝিমাল্লারা ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কিয়ৎ দূর দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে। সুউচ্চ বাঁধান ঘাটের উপরে অনতিদূরে কোন দেবালয়ে মিলিত ভক্ত কণ্ঠে শিব-স্তোত্রম্ পাঠ হইতেছে। একজন আগন্তুক আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া যোগিরাজের সহিত আলাপ জমাইল। আগন্তুক বলিল—"পূর্ব্বেই আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মত সৌভাগ্য এতদিন হয় নাই।"

যোগিরাজ মৃদু হাসিয়া, কি নাম, কোথায় নিবাস ইত্যাদি মধুর বাক্যে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা আগন্তুক বলিল—"যদি অভয় দেন একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?"

যোগিরাজ বলিলেন—"অনায়াসে করিতে পার।"

আগন্তুক বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করে—"শুনিয়াছি আপনি ঘরে বসিয়া ধ্যান করেন। কিন্তু কোন্ দেবতার ধ্যান করেন ?"

যোগিরাজ স্মিত হাস্য সহকারে বলিলেন—"তাহা ত জানি না।"

আগন্তুক পুনরায় বলিল—"শিব, কৃষ্ণ, কালী নিশ্চয়ই এইসব দেব-দেবীর কারও ধ্যান করেন ?"

যোগিরাজ বলিলেন—"শিব, কৃষ্ণ, কালী, তুমি, আমি সকলের মধ্যে যিনি তাঁহারই ধ্যান করি।"

আগন্তুক বিস্মিত হইয়া বলিল—"আপনার কথা ঠিক বুঝিলাম না।"

যোগিরাজ বলিলেন—"আমিও বুঝাইতে পারিব না, তুমিও বুঝিবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লীলাপ্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী।

যোগিরাজ প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগসাধন যাঁহারা করেন তাঁহাদের ক্রিয়াবান্ বা ক্রিয়ান্বিত বলা হয়। তিনি ক্রিয়াবানদের সহিত তাঁহাদের জীবনের নানা দিক্ আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে তিনি বলিতেন সাত্ত্বিক আহারই শ্রেয়। (সাত্ত্বিক আহারে শরীর মন শান্ত থাকে। যোগকর্ম্ম করিতে হইলে অল্পাহারী ও সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। অধিক ভোজনে যোগসাধনায় ব্যাঘাত হয়। অতি গরম, অতি ঠাণ্ডা, অতি কটু, অতি ঝাল, অতি তেতো, বাসি প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। পুরা খাদ্য গ্রহণের তিন ঘণ্টা পর ক্রিয়াসাধন করা উচিত। প্রতিদিন পাঁচ ছয় ঘণ্টা নিদ্রা অবশ্যই যাওয়া উচিত। বিবাহিত ব্যক্তিগণের মাসে দুইবার স্ত্রীগমন করা ভাল। তাহাতে মন শান্ত থাকে, সাধনও ভাল হয়। তবে কোন প্রকারেই যথেচ্ছ জীবন যাপন করা উচিত নহে। কাম আক্রমণ করিলে জোরে তিন চারটি প্রাণায়াম করিবে। প্রতিদিন নিয়মিত দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রাণকর্ম্ম করা উচিত। বলপূর্ব্বক প্রাণকর্ম্ম করিলে সত্বর প্রাণ স্থির হইয়া যায়। তাই তিনি পুনঃপুনঃ সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেন—**"কস্‌কে প্রাণায়াম করনা চাহিয়ে।"** উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু প্রধান। প্রাণকর্ম্মের দ্বারা মুখ্য প্রাণবায়ু স্থির হইলেই অপর সকল বায়ুই স্থির হয়। তখন ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই থাকে না।)

তিনি বলিতেন ক্রিয়া করিবার দিক্ দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই। এ বিষয়ে বেদান্ত বলিতেছেন—**"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ"**[১] অর্থাৎ ক্রিয়া করিবার দিক্ দেশ কালের কোন নিয়ম নাই। (যাহার যে সময়ে বা যখন শরীর মন সুস্থ থাকে তখনই ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। একই সময়ে যে ক্রিয়া করিতে হইবে তাহার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, তবে প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে নিয়ম করিয়া করিলে চিত্তের প্রসাদ হয়। কিন্তু ক্রিয়াতে স্থিতিলাভ করিলে কোন নিয়ম নাই। ক্রিয়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়াও উচিত। কোমর, হৃদয় ও কণ্ঠ এই তিন স্থান উন্নত করিয়া সমান বায়ুর

---

(১) বেদান্ত চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ ১১ সূত্র।

প্রবাহে ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। যোগাভ্যাসী অতি প্রত্যূষে স্নান করিবে না, অধিক ভার বহন করিবে না, অধিক দ্রুত চলিবে না, কঠোর উপবাস করিবে না, অধিক রাত্রি জাগরণ করিবে না, এক কথায় এমন কাজ করিবে না যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত ও লম্বা হয়। মেঘ গর্জ্জনের সময় ক্রিয়া করিবে না। সকালের ক্রিয়াতে রাত্রির পাপ নাশ হয় এবং সন্ধ্যার ক্রিয়াতে দিবার পাপ নাশ হয়। শীত ও বসন্তকালে অধিক ক্রিয়া করিবে। অধিক ক্রিয়া করিলে নেশা হয় এবং মাথার পশ্চাতে শব্দ শোনা যায়, তাহাকেই নাদব্রহ্ম বলে। "প্রাণায়ামমনুমত্বা উন্মত্তবৎ চরন্তি।"[১] অধিক প্রাণায়ামের নেশায় বুদ হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া অনাসক্তভাবে এই সংসারে বিচরণ করিবে। প্রাণকর্ম্ম করিলেই দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এই ক্রিয়াযোগের পাঁচটি অঙ্গ—তালব্য, প্রাণায়াম, নাভিক্রিয়া, যোনিমুদ্রা ও মহামুদ্রা। এই পাঁচ অঙ্গের সমষ্টিই ক্রিয়াযোগ। অবশ্য এই গুহ্যতম ক্রিয়াযোগসাধনরহস্য গুরুবক্ত্রগম্য। তালব্য দ্বারা জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হয়, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ু স্থির হয়, নাভিক্রিয়া দ্বারা সমান বায়ু সাম্যাবস্থা লাভ করে, যোনিমুদ্রা দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার এবং মহামুদ্রা দ্বারা ব্যান ও উদান বায়ু স্থিতাবস্থা লাভ করে। এই প্রকারে পঞ্চপ্রাণকে জয় করিয়া যোগী ঊর্দ্ধমার্গে শূন্যতত্ত্বে অবস্থান করিয়া, কর্ম্মের অতীতাবস্থায় পৌঁছিয়া আত্মরাজ্যে বিচরণ করিতে সক্ষম হন।

যোগিরাজ উপদেশ দিতেছেন। ভক্তগণ যাহাদের যাহা জানিবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে?"

যোগিরাজ বলিলেন—"যে কর্ম্ম ঈশ্বরের সহিত মিলন ঘটায় তাহাই কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকাই কর্ম্মযোগ। অপর সবই অকর্ম্ম। ঈশ্বর কোন আকাশ হইতে নামিয়া আসা বস্তু নহে, উহা একটি অবস্থা। উহা প্রাণের স্থির অবস্থা। স্থির প্রাণ জীবদেহে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহাতেই মোহিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা জীবের আপন স্বরূপ হইতে বিচ্যুত অবস্থা অর্থাৎ স্থির প্রাণ হইতে চঞ্চল প্রাণে অবতরণ অবস্থা।

(১) জবলোক উপনিষদ্।

স্থিরত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। চঞ্চলতাই জীব, স্থিরত্বই শিব। তাই যে কর্ম্ম সেই চঞ্চলতার অবসান ঘটাইয়া পুনরায় স্থিরত্বে পৌছাইয়া দেয় অর্থাৎ জীবত্বের অবলুপ্তি ঘটাইয়া শিবত্বে উন্নীত করে তাহাকেই কর্ম্মযোগ বলে। কর্ম্ম ছাড়া কিছুই হয় না। যাহা কিছু আমরা পাইতে চাই, দিতে চাই সবই কর্ম্ম পদবাচ্য। বিনা কর্ম্মে কিছু পাওয়া যাইবে না, অতএব বিনা কর্ম্মে ঈশ্বরকেও পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ স্থিরকে পাওয়া যাইবে না। ঈশ্বরকে পাইতে হইলেও অবশ্যই কিছু কর্ম্ম করিতে হইবে। জাগতিকভাবে আমরা যত প্রকার কর্ম্ম করি সেই কর্ম্মগুলির মাধ্যমে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে? তাহা নহে। কারণ সে রকম কর্ম্ম সকলেই কিছু না কিছু করিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে পায় না কেন? (জপ, ব্রত, উপবাস, সংকীর্তন, সৎকর্ম্ম, তীর্থভ্রমণ, পরোপকার, অতিথিসেবা, জীবেদয়া ইত্যাদি কর্ম্মগুলি সকলেই কিছু না কিছু করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে পায় না কেন? অতএব এই কর্ম্মগুলির দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে না, কারণ এই কর্ম্মগুলি আত্মসাক্ষাৎকার ঘটাইতে সক্ষম নহে। কিন্তু এইগুলি করিলে মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়, এইগুলি সাধনপথের সহায়ক। অতএব এইগুলি করণীয়। কর্ম্ম ফল উৎপন্ন করিবেই, উহা কর্ম্মের ধর্ম্ম। কুকর্ম্ম করিলে কুফল এবং সুকর্ম্ম করিলে সুফল পাইতেই হইবে। যে কর্ম্মের যে ফল। যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য অন্ন গ্রহণরূপ কর্ম্ম প্রয়োজন, অন্য প্রকার কর্ম্ম করিলে হইবে না, সেইরূপ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে আত্মকর্ম্ম প্রয়োজন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"[১] কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত কর্ম্ম যাহা করিলে আত্মার সহিত যুক্ত হওয়া যায় তাহা বোঝা খুবই কঠিন) তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

> কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
> তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥[২]

অর্থাৎ কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন; অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্ম্মে আসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব। কারণ "সংন্যাসস্তু মহাবাহো

(১) গীতা ৪।১৭
(২) গীতা ৪।১৬

দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ॥"[১] হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস (ত্যাগ) পাওয়া অসম্ভব। কর্ম্মের অতীত অবস্থাই প্রকৃত ত্যাগ পদবাচ্য। তখন কর্ম্ম থাকে না! সেই সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগরূপ অবস্থাকে পাইতে হইলে কর্ম্ম করিয়াই তাহা পাইতে হইবে। বিনা কর্ম্মে কিছুই পাওয়া সম্ভব নহে।

তাই যোগিরাজ ১৮৭৩ খৃঃ ১৯শে জুন লিখিয়াছেন—"**অব বড়া মজাসে বেকাম হয় সোই কাম হুয়া—য়ানে কুছ নহি করনা এহি কাম হুয়া—বড়া আশ্চর্য্য কি বাতেঁ ইসিমে হমেসা গরক রহনা চাহিএ।**" এখন আনন্দের সহিত অকর্ম্ম হইল, সেই অকর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম হইল অর্থাৎ কিছুই না করা ইহাই এখন আমার কর্ম্ম হইল। বড় আশ্চর্য্যের কথা যে সেই অকর্ম্মতেই সব সময় থাকা চাই। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ জাগতিক যে সকল কর্ম্মকে কর্ম্ম মনে করে যোগিগণ তাহাকেই অকর্ম্ম মনে করেন এবং সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার দরুন যাহাকে অকর্ম্ম মনে করে যোগিগণ তাহাকেই কর্ম্ম বলিয়া জানেন। সাধারণ মানুষ ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্ম্মের অতীতাবস্থা কি তাহা জানে না, তাই সেই স্থিরাবস্থা তাহাদের নিকট অকর্ম্ম ; কিন্তু যোগীর কাছে তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম। যোগিরাজ ২৫শে জুন ১৮৭৩ খৃঃ এ বিষয়ে আরও লিখিয়াছেন—"**তিন কোনা আউর ৪ লকির—তিন কোনা য়ানে তিনো নাড়ি ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—চার লকির য়ানে ক্ষিতি অপ তেজ মরুত—ইহ সবকো ছোড়কে সূন্যমে ধ্যান লগানা—এহি অসল কাম হয়—আজ তো বিলকুল স্বাসা গয়া—বড়া ভারি নেসা হুয়া।**"—তিন কোনা এবং চার লকির অর্থাৎ তিন কোনা অর্থে—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ি এবং চার লকির অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত ; অর্থাৎ এই তিন নাড়ি এবং চার মহাভূত এই সকলকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম মহাভূতরূপী মহাশূন্যে অর্থাৎ শূন্যের ভিতর যে শূন্য তাহাতে ধ্যান করা, ইহাই আসল কার্য্য। প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে আজ শ্বাসের গতি সম্পূর্ণরূপে থামিয়া গেল এবং এই প্রকার কুম্ভক অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত নেশা হইল। এই প্রকার সাধন করিতে করিতে তাঁহার কি অবস্থা হইল? ২৩শে আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"**আজ অভয় সব কর্ম্মমে—অকর্ম্ম যো সোই মেরা কর্ম্ম হয়।**" কোন কর্ম্মেই আর তাঁহার ভয় নাই তাই সকল কর্ম্মেই তাঁহার অভয়

---

(১) গীতা ৫।৬

হইয়াছে ; কারণ সাধারণ মানুষের নিকট যাহা অকর্ম্ম সেই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্ম্মের অতীতাবস্থাই এখন তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও তাহাই বলিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্মঃ যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥[১]

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনিই ব্রহ্মে সংলগ্ন। অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত যে সকল জাগতিক কর্ম্ম সেই কর্ম্মকে যিনি অকর্ম্ম বলিয়া দেখেন এবং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যে নিষ্কাম প্রাণকর্ম্ম, তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণের নিকট অকর্ম্ম বলিয়া মনে হইলেও সেই অকর্ম্মরূপ নিষ্কাম প্রাণ-কর্ম্মকে যিনি কর্ম্ম বলিয়া দেখেন তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনি সকল কর্ম্ম করিয়াও ঐ নিষ্কাম প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে সদা যুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি ঐ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যুক্ত বুদ্ধিশালী হইয়া সদা ব্রহ্মে যুক্ত থাকিয়া অনাসক্তভাবে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার সমস্ত আসক্তি চলিয়া যায়। অর্থাৎ যখন নাসাপথে প্রাণের আগম নিগমরূপ কর্ম্মের স্থিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি হয় তখনই প্রকৃত কর্ম্মত্যাগরূপ অবস্থা। তাই যোগিরাজ ১৮৭৩ খৃঃ ১৯শে জুন লিখিয়াছেন—**"হওয়া অয়সা উপর চঢ়া কি বড়া জোর সাঙ্গে উঠানেকেলিএ। আব বড়া মজা সে বেকাম হয় সোই কাম হুয়া—য়ানে কুছ নহি করনা এহি কাম হুয়া—বড়া আশ্চর্য্যকি বাতেঁ ইসিমে হমেসা গরক রহনা চাহিএ।"**—প্রাণবায়ু এমনভাবে উপরে উঠিয়া গেল যে মনে হইল শরীরকে জোর করিয়া উপরে উঠাইয়া দিবে। এখন বড়ই আনন্দের সহিত অকর্ম্ম হইল অর্থাৎ কর্ম্মহীন হইলাম এবং সেই কর্ম্মহীন অবস্থায় থাকাই এখন আমার কাজ অর্থাৎ কিছু না করাই এখন আমার কাজ। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে ঐ বেকাম অবস্থায় সর্ব্বদা থাকা চাই অর্থাৎ ইহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা, এই পরাবস্থায় সর্ব্বদা থাকা চাই।

(১) গীতা ৪।১৮

জাগতিক কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা যায় না। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥[১]

তুমি অবশ্য-কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম কর, কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা করা ভাল। সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই অজপারূপ প্রাণকর্ম্মই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃকই শরীর রক্ষিত হয়, সুতরাং প্রাণবায়ুই জীবের আয়ু। সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম চলিবেই। উহা না করিয়া উপায় নাই। ঐ কর্ম্ম না থাকিলে দেহ থাকে না। উহা প্রাণ হইতে জাত, উহা না থাকিলে জীব বাঁচিতে পারে না। উহাই প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যতপ্রকার কর্ম্ম করে সবই সকাম। কামনা বাসনা তাহার সহিত অবশ্যই জড়িত থাকে। একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম, কারণ কোন প্রকার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উহার সহিত জড়িত থাকে না। ইচ্ছা করি বা না করি শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম্ম চলিবেই। চঞ্চল প্রাণ হইতে জাত যে চঞ্চল মন উহা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সকাম কর্ম্ম থাকিবেই। মনের সংযোগে যে কর্ম্ম হয় তাহা সকাম হইতে বাধ্য। কিন্তু যে কর্ম্ম মনের সংযোগ ছাড়াই হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে, যখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয় প্রকারই থাকে না তখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম্ম চলিতে থাকে। 'ঘুমাইব' ইহা যেমন ইচ্ছা, 'ঘুমাইব না' ইহাও তেমনি ইচ্ছা। এই উভয় প্রকার ইচ্ছা যখন নাই তখনও যে কর্ম্ম হইতেছে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। অতএব এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। আর সকল কর্ম্ম মন হইতে জাত বলিয়া সকাম। মন স্বয়ং ইন্দ্রিয়, তাই ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত কর্ম্ম কখনই নিষ্কাম হইতে পারে না। গীতায় শ্রীভগবান্ এই নিষ্কাম প্রাণকর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। কারণ প্রাণবায়ু যাহা জীবদেহে চলিতেছে উহাই জীবের বর্ত্তমান অবস্থা, উহাই অজপারূপ হংস। উহার বহির্মুখ গতিরূপে হংসের বিরুদ্ধ ক্রিয়া হওয়ায় বিকার হইয়া থাকে, তাই জীব সর্ব্বদা বিকারগ্রস্ত রহিয়াছে। উহার বহির্মুখী গতিহেতু আয়ুঃক্ষয়ের সহিত দেহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু

(১) গীতা ৩।৮

অজপারূপ হংসের অন্তর্মুখ গতি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক হংসের ক্রিয়া (প্রাণক্রিয়া) করিলে বহির্গতিরূপ বিরুদ্ধ-ক্রিয়া নিবারণ করা যায় এবং আত্মভাব বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সকল প্রকার বিকার কাটিয়া যায়। তাই যোগিরাজ ১৮৭৩ খৃঃ ২১শে জুলাই তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছেন— **"আজ আউর বড়া স্থির ঘরকা হাল মিলা আখ আপ বন্দ হুয়া জাতা হয় আউর ব্রহ্ম সাফ দর্শন হোনে লগা—ত্রিকুটা য়ানে জিহ্বামূল—উপর তালুকা ছেদ বন্দ করতা হয় আউর জিহ্বাকা অগ্রভাগ তালু মধ্যমে লগতা হয় আউর জিহ্বাকা মূল তালুকে নিচে লগতা হয় ইসি তরহসে বিলকুল বাহরকা শ্বাসা বন্দ হোতা হয় ধন্যভাগ উসকা জিসকো ইহ হোয়"**— অর্থাৎ আজ আরও অধিক স্থির ঘরের হদিস পাইলাম, চক্ষুদ্বয় আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং ব্রহ্ম আরও পরিষ্কার দর্শন হইতে লাগিল। ত্রিকুট অর্থে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত বা প্রসিদ্ধ তীর্থ। কিন্তু যোগিরাজ বলিতেছেন— ত্রিকুট অর্থাৎ জিহ্বামূল, এই জিহ্বা ঊর্দ্ধে উঠিয়া তালুকুহরের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয়, জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর মধ্যভাগে প্রবেশ করে এবং জিহ্বামূল তালুর নীচে লাগিয়া থাকে, এই প্রকারে খেচরী অবস্থায় রেচক পূরকরূপ প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে বাহিরের আগম-নিগমরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়া "কেবল কুম্ভক" প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই তিনি বলিতেছেন ধন্য ভাগ্য তাহার যাহার এই রকম "কেবল কুম্ভক" হয়। এই কেবল কুম্ভক কখন সিদ্ধ হয়? ইহার নিখুঁত হিসাব দিয়া বলিয়াছেন—**"দশলাখ একষট হাজার প্রাণায়াম মে কেবল কুম্ভক সিদ্ধ হোতা হয়।"** যোগী প্রতিদিনই প্রাণায়াম করিতে করিতে যখনই উক্ত সংখ্যক প্রাণায়াম সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন তখনই তাঁহার 'কেবল কুম্ভক' আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ ঐ কেবল-কুম্ভক অবস্থাই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। তাহা ইহ জীবনেই কর অথবা দুই তিন জীবনে কর।

এই কর্ম্মটি কে করিবে? ভগবান্ বলিয়াছেন—

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥[১]

যিনি শরীরের দ্বারায় এই "কেবল" নামক কর্ম্ম করেন তিনি নিষ্কাম যতচিত্তাত্মা ও ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ হওয়ায় পাপ প্রাপ্ত হন না।

---

(১) গীতা ৪।২১

তাহা হইলে ইহা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভগবান্ ঐ "কেবল কর্ম্মকেই" প্রকৃত "কর্ম্মযোগ" বলিয়াছেন। ইহাকেই অপর জায়গায় "সহজ কর্ম্ম" বলিয়াছেন। অতএব যাহা "কেবল কর্ম্ম" তাহাই "সহজ কর্ম্ম" এবং উহাই "কর্ম্মযোগ।" শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের মাধ্যমে সকল মানবকে এই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই কর্ম্ম কেমন করিয়া করিতে হয়? ইহার স্বরূপ কি? এ বিষয়ে ভগবান্ মোটামুটি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। মোটামুটি বলিবার উদ্দেশ্য ইহা গুরুমুখী বিদ্যা, পুস্তক পড়িয়া জানা যায় না।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষুজুহ্বতি ॥[১]

কেহ কেহ প্রাণ বায়ুকে অপানবায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন। এইরূপ করিতে করিতে 'কেবল' নামক কুম্ভকের দ্বারায় প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ ঐ প্রকারে প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম করিয়া প্রাণকে প্রাণেতেই হোম করেন অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়া করেন। ইহাই প্রকৃত হোম। এইরূপ করিতে করিতে তিনি—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥[২]

রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় সমুদয়কে বাহিরে রাখিয়া, চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া (শাম্ভবী অবস্থায়) নাসাভ্যন্তরচারী হন। প্রাণের যে কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম, যাহা নাসাপথে অজপারূপে অবিরাম চলিতেছে, প্রাণকর্ম্মের দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ সেই বায়ু সকলকে স্থির করিয়া, উহার ঊর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত করিয়া নাসামধ্যেই সঞ্চরণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ আষাঢ় শুক্লপক্ষ নবমীতে যোগিরাজ তাঁহার সাধনার উপলব্ধির কথা লিখিয়াছেন— **"আঁখ উপর স্থির হোগিয়া ব্রহ্ম দেখনে লগা—স্বাসা ভিতর ভিতর চলেনে লাগা মন স্থির ভয়া—প্রণাম করিয়া বিন্দি আঁখকে উপর ২হাত তফাৎকে থড়ি পিছেকে প্রণামকে বখত্ খালি আঁখসে দেখা**

(১) গীতা ৪।২৯
(২) গীতা ৫।২৭

সবেরে দেখা, সবেরেকে বখত্ আব প্রণাম করেনেকা এরাদা নাহি করতা আপকে আপ প্রণাম হোতা হয়—ভিতর ভিতর জিহ্বা গলেকে ভিতর বৈঠ গয়া।"—এখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় উপরে স্থির হইয়া গিয়াছে, স্পন্দন রহিত হইয়াছে (শাম্ভবী অবস্থা), এই অবস্থায় তিনি ব্রহ্ম দেখিতেছেন। এখন শ্বাসের গতি সুষুম্নায় চলিতেছে তাই মন নিরোধ হওয়ায় স্থির হইয়া গিয়াছে। সকালবেলায় প্রণাম করিবার সময় খালি চোখে দুই হাত তফাতে বিন্দু দেখিলেন ; কিন্তু এখন তাঁহার মন মনেতে অবস্থান করায় আর প্রণাম করিতেও ইচ্ছা নাই, আপনা হইতেই নিজেই নিজেকে প্রণাম হইতেছে। কণ্ঠকূপে তালুকুহরে জিহ্বা বসিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কোন প্রকার ইচ্ছা বা চিন্তা না থাকায় দুই নাই এবং দুই না থাকায় কে কাহাকে প্রণাম করিবে? সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হইয়া যাওয়ায় নিজেই নিজেকে আপনা হইতেই প্রণাম হইতেছে। প্রণাম করিতে হইলেই দুই হইল। তাহা হইলে প্রাণকর্ম্ম বা আত্মকর্ম্মকেই প্রকৃত কর্ম্মযোগ অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার যে কার্য্য সর্ব্বদা জীবদেহে চলিতেছে তাহার বহির্মুখ গতিকে অন্তর্মুখ করিয়া উহার মিলন ঘটানই কর্ম্মযোগ। এইরূপে **"সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে"**[১] অর্থাৎ সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগকেই যোগ বলে। অপর জায়গায় ঋষি বলিয়াছেন **"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"**[২] চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তির নিরোধ অবস্থাই যোগ। প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে বায়ু স্থির হইলে চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়। প্রাণ স্থির হইলেই বর্ত্তমান চঞ্চল মনও স্থির হইয়া মনেতে মন অবস্থান করে। সেই অবস্থায় বর্ত্তমান চঞ্চল মন না থাকায় কোন প্রকার চিন্তা থাকে না। সেই চিন্তা শূন্য অবস্থাকেই যোগ বলে। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগী হইতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥[৩]

অর্থাৎ আমার মতে যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। কারণ

(১) **জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।**
(২) **পাতঞ্জল যোগসূত্র সমাধিপাদ ২ শ্লোক**
(৩) **গীতা ৬।৪৬**

একমাত্র যোগীই ইড়া-পিঙ্গলার মিলন ঘটাইয়া স্থির সাম্যাবস্থা বা কর্ম্মের অতীতাবস্থা লাভ করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্বরূপ বিজ্ঞানপদে সততযুক্ত বা অবস্থিতি লাভ করিতে সক্ষম হন। এই আত্মকর্ম্মের দ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটাইবার জন্য অর্থাৎ স্থিতিলাভের অভ্যাসক্রিয়াই অভ্যাস যোগ।

অপর এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"শাস্ত্রে আছে জীবের প্রতি দয়া করিলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। কি প্রকারে জীবের প্রতি দয়া করা সম্ভব, ইহা কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

যোগিরাজ বলিলেন—জীবে দয়া করিলে যে ঈশ্বরের সেবা করা হয় ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তোমরা জীবে দয়া বলিতে যাহা বোঝ তাহা প্রকৃত দয়া নহে এবং ঐ প্রকারে দয়া করিলে আত্মলাভ হয় না। সাধারণতঃ তোমরা দীন, দুঃখী, অনাথ, আতুর ব্যক্তিকে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা দয়া বা সেবা প্রদর্শন কর। এই প্রকারে জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া বা সেবা করা হয় না কারণ তাহা অস্থায়ী ; এবং যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করিল তাহারও আত্মলাভ হয় না। ইহাতে জীব-দেহের প্রতি সাময়িক দয়া প্রদর্শন করা হয় মাত্র। জীবের দেহটা ত আর জীব নহে। তাহা ছাড়া আজ যাহাকে যে প্রয়োজনে দয়া করিলে, ভবিষ্যতে তাহার সেই প্রয়োজন পুনরায় হইতে পারে। যেমন ক্ষুধার্ত্তকে একবার অন্ন দিলে পুনরায় তাহার ক্ষুধা লাগিবে। তাহা ছাড়া ক্ষুধা ত দেহের ধর্ম্ম। এই প্রকারে সেবা করিলে দেহের সেবা করা হয়, ঈশ্বরের সেবা হয় না। তিনি এই দেহমধ্যে বাস করেন সত্য, কিন্তু দেহের সেবা করিলে দেহাভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের সেবা করা হয় না। যেমন জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার সাধন করিলে সেই মন্দিরস্থ দেব-দেবীর পূজা করা হয় না। এই প্রকার দয়ায় তাহার ভবরোগ দূরীভূত হইবে না। তবে সামাজিক রীতি অনুযায়ী এই প্রকার দয়া অবশ্য করা উচিত। কিন্তু শাস্ত্র এই প্রকারে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে বলেন নাই। শাস্ত্রোক্ত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে অর্থাৎ প্রকৃত জীবে-দয়া কি তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে 'জীব' কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। প্রাণ মূলতঃ স্থির। সেই স্থির প্রাণ যখন চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি জীব পদবাচ্য অর্থাৎ দেহমধ্যে প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলা হয়। সেই জীবন যতক্ষণ বর্ত্তমান অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা যতক্ষণ বর্ত্তমান ততক্ষণই জীব জীবিত। তাহা হইলে জীবে-দয়া বলিতে প্রাণের ঐ চঞ্চল অবস্থার প্রতি দয়া করিলেই ঈশ্বর সেবা করা হয় অর্থাৎ প্রাণ-কর্ম্মের দ্বারা চঞ্চল অবস্থার প্রতি দয়া প্রদর্শন

করিয়া উহাকে স্থিরপ্রাণে পুনরায় রূপান্তর ঘটাইলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। কারণ স্থির প্রাণই ঈশ্বর। সেই স্থির প্রাণের সেবা করিতে হইলে চঞ্চল প্রাণকে ধরিয়াই করিতে হইবে। যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। প্রাণের সেবা প্রাণের দ্বারাতেই সম্ভব, বাহ্য বস্তু দ্বারা প্রাণের সেবা সম্ভব নহে। "তনমন বচন কর্ম্ম লাগাওএ—ইসিকো অহিংসা কহতে হয়।" —দেহ, মন, বচন ও কর্ম্ম এই চারটিকে একত্র করিলে অর্থাৎ স্থির করিলে যে অবস্থার উদয় হয় তাহাকে অহিংসা বলে। বচন=ব শব্দে কণ্ঠ, চ শব্দে চক্ষু, ন শব্দে নাসিকা। নাসিকা দ্বারায় যে শ্বাস আসিতেছে তাহা কণ্ঠের দ্বারায় লক্ষ্য করিয়া বলা। কর্ম্ম অর্থে প্রাণকর্ম্ম। এই প্রকার অহিংসা প্রাণকর্ম্ম সাপেক্ষ, তখন কায়মনোবাক্যে সকল কর্ম্মে হিংসার অভাব হওয়ায় অহিংসা।

তিনি যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিতেন সে বিষয়ে দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"...এয়সা ছায়া পুরুষ ঘটমে ঘট্ দেখা...।" ছায়াপুরুষ অর্থাৎ উত্তমপুরুষ, তিনিই পুরুষোত্তম নারায়ণ, তিনিই পুরাণ পুরুষ—তিনি সকল ঘটে অর্থাৎ সকল দেহে বর্ত্তমান। যোগিগণ তাঁহাকে অপলক দৃষ্টিতে দেখেন। ১৮৭৩ খৃঃ ১২ই আগষ্ট লিখিয়াছেন—"এক আদি পুরুষ খড়া দেখা। আদি পুরুষ সুন্যমে।"—মহাশূন্যে এক আদি পুরুষ দণ্ডায়মান দেখিলাম। তাহার পর লিখিয়াছেন—"চাঁদমে ওহি পুরুষোত্তমকা রূপ রাতভর দেখা কভি হাত পএর ভি হয়।"—কূটস্থে যে চন্দ্র দেখা যায় সেই চন্দ্রমধ্যে ঐ পুরুষোত্তমের রূপ সারারাত্র ধরিয়া দেখিলাম, কখনও কখনও হাত পা আছে তাহাও দেখিলাম। "নক্ষত্র এক আদমিকে ছাতিকে ভিতর দেখা"—এক ব্যক্তির বুকের ভিতর সেই ধ্রুবতারাকে দেখিলাম।

"ওকে ভজন করে সাধন করে কে কার কিবা করে,
ওকি সাদা মানুষটি, ওকি কাল মানুষটি,
ওজে সাদার উপর কালো সাজে এমন মানুষটি।"

"ভেলকী লাগে দেখলে তারে,
তারে তারে ডাকো তারে।
ওঁ কারের পর জ্যোতি আকারে,
সে যে আছে সাকার নিরাকারে।"

সাদা-কালোর উর্দ্ধে, যাহাকে দেখিলে ভেলকি লাগে সেই মানুষটিকে

কিভাবে জানা যায় ? যোগিরাজ বলিয়াছেন—**"স্থির বুদ্ধিসে মালুম হোতা হয়—জ্যোতি স্বরূপ বড়া নেসা বড়া আনন্দ। ওঁকার দ্বারা যাহা জানিতে ইচ্ছা করে তাহা তার হয়।"**

তাঁহার গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি কখনও গুরুর নিকট গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাঁহার দীক্ষার সময় ব্যতীত স্থূল শরীরে তাঁহার গুরুর দর্শন লাভ করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার লেখা চৌদ্দ বছরের দিনলিপিতে স্থূল শরীরে তাঁহার প্রিয় গুরু বাবাজী মহারাজের সহিত মিলিত হইয়াছেন এমন কোন উল্লেখ নাই। যিনি দৈনন্দিন ডায়েরিতে প্রতিদিনের প্রায় সকল ঘটনাই লিখিয়া রাখিতেন, তিনি যদি স্থূল শরীরে বাবাজীর সহিত নিজ বাড়িতে অথবা অন্য কোন জায়গায় মিলিত হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি উহা লিখিয়া রাখিতেন ইহাই সম্ভব। বরং তিনি সাধনার মাধ্যমে তাঁহার প্রিয় গুরুর (বাবাজীর) সহিত মিলিত হইতেন এমন বহু ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব যদি বাবাজী স্থূল শরীরে তাঁহাকে দর্শন দিয়া থাকিবেন তাহা হইলে একবারও তিনি নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু কোথাও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তিন নম্বর ডায়েরীতে একটি মনুষ্য মুখাকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহার নীচে লিখিয়াছেন—**"বাবাজীকে রূপ, এহি জম ও ধর্ম্ম"** —ইহা বাবাজীর রূপ, ইনিই যম, ইনিই ধর্ম্ম। উহার কয়েক মাস পূর্ব্বে ঐ তিন নম্বর ডায়েরীতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর দানাপুরে থাকাকালে লিখিয়াছেন—**"জব প্রাণবায়ু সিরকে উপর চঢ়া তব বাবাজিসে মিলা, জব বাবাজীসে মিলা তব কেয়া নহি কর সকতা হয়……।"** অর্থাৎ সাধনা করিতে করিতে যখন প্রাণবায়ু মস্তকোপরি উঠিল তখন বাবাজীর সহিত মিলিত হইলাম। যখন বাবাজীর সহিত মিলিত হইলাম তখন কি না করিতে পারি এইরূপ অনুভব হইল অর্থাৎ অসাধ্য কাজ আর কিছুই রহিল না।

তাঁহার গুরু অর্থাৎ বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া তিনি তিন নম্বর ডায়েরীতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছেন—**"জো কিস্সুন সো বুড়ুয়া বাবা"** অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই বুড়াবাবা অর্থাৎ বাবাজী মহারাজ। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহার গুরু সাধারণ সাধক মাত্র নহেন। তিনিই সাক্ষাৎ **শ্রীকৃষ্ণ**।

নয় নম্বর ডায়েরীতে ১৮৭১ খৃঃ পৌষ শুক্লপক্ষ অষ্টমীতে (তারিখ নাই) কাশীধামে থাকাকালে লিখিয়াছেন—"খোদ বাবাজী কালডণ্ড লিএ উপর সূর্য্য চন্দ্রমাকে ভিতর দেখলাই দিয়া...... ।" অর্থাৎ স্বয়ং বাবাজী কালদণ্ডসহ উপরে সূর্য-চন্দ্রের (আত্মসূর্যের) ভিতর দৃষ্ট হইলেন।

ঐ নয় নম্বর ডায়েরীতে ১৮৭২ খৃঃ চৈত্র কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমীতে (তারিখ নাই) কাশীতে থাকাকালে সাধনার মাধ্যমে তিনি যে তাঁহার প্রিয় গুরুদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে এক অপূর্ব্ব বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"গুরুকা আদরভাও সুষম্না জাগা বিচবিচমে আওত হেয় কভি কভি জ্যোৎ মালুম হোত হেয় খালি আখসে সুসুম্না দেখা জাগরিত সপন সুষুপ্তি গুরু সে বাতচিত ভয়া।" অর্থাৎ গুরুর আদরভাব সুষুম্না জাগিল, মাঝে মাঝে আসিতেছে, কখন কখন জ্যোতিঃ অনুভব হইতেছে, খালি চোখে সুষুম্না দেখিলাম, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, গুরুর সহিত কথাবার্ত্তা হইল।

যোগিরাজের শ্যালকপুত্র প্রফেসর তারকনাথ সান্যাল তাঁহারই নিকট ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হইয়া সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনার গুরুদেব মহাযোগী বাবাজী মহারাজকে একবার আনান, আমরা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

উত্তরে যোগিরাজ বলিয়াছিলেন—"বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব।" কয়েকদিন পর তিনি তারকনাথবাবুকে জানাইয়াছিলেন—"বাবাজীর আসিবার ইচ্ছা নাই।"

এইসব প্রমাণ হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাবাজী মহারাজ স্থূল শরীরে কখনও যোগিরাজের নিকট আসেন নাই। বাবাজী তাঁহার দলের কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে মাঝে মাঝে যোগিরাজের নিকট পাঠাইতেন দীক্ষার টাকা লইবার জন্য। সেজন্য অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে বাবাজী স্থূল শরীরে যোগিরাজের নিকট আসিতেন। বরং যোগিরাজের লিখিত ডায়েরী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বাবাজী মহারাজ কৃষ্ণ-সদৃশ অবতার বিশেষ। তেমন মহাযোগীর স্থূল শরীরে আসিবার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করিয়া শ্যামাচরণকে দীক্ষা প্রদানকালে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যখন প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিকভাবে দর্শন দিবেন। অতএব তিনি যে শ্যামাচরণকে সাধনার মাধ্যমে বহুবার দর্শন দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন ইহাই ঠিক।

শ্যামাচরণও তাঁহার চৌদ্দ বছরের লিখিত ডায়েরীতে সে কথা বারবার স্বীকার করিয়াছেন।

যোগিরাজের লিখিত ডায়েরীগুলির মধ্যে তাঁহার স্বরচিত ৪৬টি গান, কবিতা বা দোঁহা লিখিত আছে। ঐগুলির উপরে অথবা নীচে কখনও 'শ্যামাচরণ' কখনও 'শ্যামা' এবং কখনও বা কেবল 'শ্যা' লিখিয়া লেখকের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। সেখান হইতে কয়েকটি অবিকল তুলিয়া দেওয়া হইল।

প্রকৃত গুরুভক্তি কাহাকে বলে ও গুরুনাম কি সে বিষয়ে তিনি একটি সুন্দর গীত রচনা করিয়াছেন, যাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলে সম্পুর্ণ সাধনতত্ত্বকে বোঝা যায়—

"গুরুনাম সদা নিএজা মজা
দেখে যা সদা ধ্বনি সুনেজা
চোর কুঠরীর ভিতর মজা
লুটেজা বুকের জোরে
আত্মারামকে রামনাম
সুনাইএজা—যে জাবার সে
জাক বএ তুই আপন কর্ম্ম করেজা—
তোর হবে ভাল শেষে তুই স্থির
ঘরে চলে যা।"

সংসাররূপ অরণ্যে থাকিয়া মহাযোগীদেরও কখন কখন নিজের মনকে শাসন করিতে হয়। যোগিরাজও তাঁহার মনকে শাসন করিয়া এক অপূর্ব্ব গীত রচনা করিয়াছিলেন—

"যেথায় আছে বড় মজা
আনন্দেরই উড়াইয়া ধ্বজা
লোট তুমি সর্ব্বাঙ্গে মজা
তাহার নাই অন্ত
মন চলে যা তুই আগে বেড়ে চলে যা
সুখ নিশ্চয় হবে অভয় পদ পাবে
দেখে শুনে পাবে বড় মজা।
শ্রীশ্যামাচরণ ভনে সদা
রেখো সবায়্ মনে
ইহাতেই অন্তে হবে মজা।"

সাধারণ মানুষ যোগী বলিতে বোঝেন যে যোগীগণ সাধারণতঃ কাঠখোট্টা বা নিরস হন, তাঁহারা প্রেমের ধার ধারেন না। শ্যামাচরণ তেমন যোগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক মহান্ প্রেমিক-যোগী। সেই ঈশ্বর প্রেম কেমন এবং কিভাবে তাহা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে তিনি এক মনোরম গীত রচনা করিয়াছেন—

"প্রেমের ঘর কোথায়
বল দিকিন।
প্রেম কি অমনি মেলে
মেহনত কর কিছুদিন॥
হাতে হাতে চাঁদ পাবে
মিলন হবে যেদিন।
দীনভাবে থেকো সদা
আনন্দে রাতদিন॥
আনন্দের নাইক সীমা,
তাকাও যেমন মীন।
কালাচাঁদের প্রেমে পড়ে
হবে নাকো ক্ষীণ ;
কেন বেড়াও এদিক ওদিক
ওরে বুদ্ধিহীন॥"

কাশী কি, কাশীর স্থিতি কোথায় এবং বিশ্বনাথ কি এবিষয়ে তিনি যে দুইখানি গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা যে কতখানি সুন্দর ও আধ্যাত্মিক অর্থবোধক তাহা পাঠ করিলেই বোঝা যায়—

"সাধের প্রেমেশ্বরী দীপ্যমান হরি,
আসেন যান খুসী যখন দেখান চমৎকারী।
হরি বিনা নাইক গতি ব্রজেশ্বরি,
জগৎময় দেখি আমি ব্যাপক হরি,
হরি জানেন কত রঙ্গ ভবের কাণ্ডারী।
হরির উপর হর আছেন ত্রিপুরারি,
ধন্য ত্রিপুরারি কাশীর স্থিতি ত্রিশূলোপরি
যেখানে সব কিছু নাই দিবাশর্ব্বরী।"

"মেরো মন আনন্দ কানন কাশী,
যাহাঁ বিরাজে সদা আনন্দ শশী।
অধঃ ঊর্দ্ধ বিচ স্থির ঘর হয়,
যহাঁ খড়ে বিশ্বনাথ অবিনাশী।"

যোগিরাজ অনেক সময় কবীরদাসের নানা দোঁহা উল্লেখ করিয়া ভক্তদের অনেক তত্ত্বকথা বুঝাইতেন। কবীরদাসের যে সাধনতত্ত্ব এবং যোগিরাজের যে সাধনতত্ত্ব তাহা প্রায় একই রকম দেখা যায়। সেজন্য সে সময় জনশ্রুতি ছিল যে কবীরদাসই উত্তম ব্রাহ্মণকুলে ইহ দেহে শ্যামাচরণ লাহিড়ী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তিনি স্বয়ং ডায়েরীতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—**"যো কবিরা সোই সূর্য্য সোই ব্রহ্ম সোই হম্।"** অর্থাৎ যিনি কবীর তিনিই আত্মসূর্য্য তিনিই ব্রহ্ম তিনিই আমি। আবার লিখিয়াছেন— **"জো কবিরা সূর্য্যকা রূপ সোই অবিনাশি ব্রহ্ম সোই হম।"**—যিনি আত্মসূর্য্যরূপী কবীর তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম, আবার তিনিই আমি। অপর জায়গায় লিখিয়াছেন—**"কায়াকে বীর কবীর য়ানে শ্বাসা।"** কায়া অর্থাৎ দেহ। এই দেহের প্রধান শক্তিই হইল শ্বাস, সেই শ্বাসরূপী শক্তিই হইল কবীর। আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন—**"সত্যযুগমে কবীর সাহেব কা নাম—সত্য স্থকৃত; ত্রেতামে—মুনীন্দ্র; দ্বাপরমে—করুণাময়; কলিযুগমে কবীর।"** অতএব তাঁহার এই সমস্ত নিজস্ব উক্তি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে ঐ জনশ্রুতি ঠিকই ছিল। যিনি কবীর তিনিই শ্যামাচরণ। অবশ্য পরবর্ত্তিকালে অনেকেই কবীর শব্দটি জীবাত্মা অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি যে তাঁহার অতীত অতীত জন্মের সমস্ত ঘটনা জানিতেন তাহার আরও প্রমাণ মেলে তাঁহার ঐ ডায়েরীগুলি হইতে। যেমন এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—**"আমার স্ত্রীর পূর্ব্বজন্মে ভগিনি চিলে তাহাতে আপনকে ভালবাস।"** অর্থাৎ আমার স্ত্রী পূর্ব্বজন্মে ভাগিনী ছিলেন, তাঁহার মধ্যে নিজেকে ভালবাস।

* * * *

যোগিরাজ প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও নিজ কক্ষে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি সাধারণতঃ কাহারও সহিত সকালে দেখা করিতেন না। কিন্তু সেদিন এক ভক্ত খুবই প্রয়োজনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে

আসিলেন এবং দ্বার হইতে তাঁহার ধ্যানমগ্ন অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই দশাশ্বমেধ বাজারে বাজার করিতে চলিয়া গেলেন। ভক্তটি বাজার করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন অনতিদূরে তাঁহার গুরু যোগিরাজও বাজার করিতেছেন। ভক্তটি ভাবিলেন তিনি হয়ত ভুল দেখিতেছেন। ভাল করিয়া দেখিলেন—না ভুল নহে, ইনিই তাঁহার সেই আরাধ্য গুরু মহাত্মা শ্যামাচরণ। কিন্তু মন অত সহজে মানিতে চাহে না। তাই তিনি সন্দেহ দূর করিবার জন্য পুনরায় গুরুগৃহে গমন করিলেন। পৌঁছিয়া দেখিলেন পূর্ব্বের ন্যায় তিনি ধ্যানমগ্ন বসিয়া আছেন। ভক্তটি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন —"ঠাকুর, তোমার লীলা বোঝা ভার, তোমার লীলা তুমিই জান। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির তাহা জানিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।" যোগিরাজ যে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিতেন, এরকম বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সিদ্ধ, মুক্ত, সদা ব্রহ্মে যুক্ত মহাযোগিদের পক্ষে ইহা কোন অসম্ভব কাজ নহে[১]।

এক ভক্ত কাশী হইতে কয়েক মাইল দূরে বাস করেন। একদিন তিনি সপরিবারে গোরুরগাড়ী করিয়া কাশী রওয়ানা হইলেন তাঁহার গুরুদেবকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। মাঝখানে গাড়ীর চাকা ভাঙিয়া গেল, আর গাড়ী চলে না। চালক বহু চেষ্টা করিয়াও গাড়ী সারাইতে পারিল না। ভক্তটি স্ত্রী পুত্র কন্যাদের লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। কারণ কাশী পৌঁছাইতে আরও তিন চার মাইল পথ যাইতে হইবে। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে না পৌঁছাইতে পারিলে দস্যুভয়ও আছে। তাই তিনি ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহার দয়াল গুরুর নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ গোরু দুইটি গাড়ী টানিতে শুরু করিল। সকলে দেখিলেন গাড়ী বেশ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সকলে আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু সেদিকে আর কেহ দৃক্‌পাত না করিয়া সন্ধ্যার সময় যোগিরাজের বাড়ির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর তাঁহারা গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া পথবিভ্রাটের কথা গুরু সমীপে বারবার বলিতে লাগিলেন। প্রতিবারই যোগিরাজ বলিলেন—"হুঁ"। ভক্তটি

(১) যোগদর্শনের ব্যাস ভাষ্যে এই যোগজ কায়ব্যূহের প্রমাণ ও যুক্তি দেখান আছে।

ভাবিলেন হয়ত তাঁহার গুরুদেবের এদিকে খেয়াল না থাকায় তাঁহার কথা ঠিকমত শুনিতেছেন না। তাই তিনি অধিক জোর দিয়া পুনরায় তাঁহার পথবিভ্রাটের কথা নিবেদন করিলেন। তখন যোগিরাজ বলিলেন—"দেখতে পাচ্ছ না, কত ঘামছি? একটু হাওয়া কর। কে তোমার গাড়ী ঠেলে ঠেলে আনল?"

বিপদাপন্ন ভক্তের প্রতি গুরুদেবের অপরিসীম করুণার কথা ভাবিয়া ভক্তের চোখে জল আসিল এবং উপস্থিত অন্যান্য ভক্তগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। সঙ্কটাপন্ন ভক্তদের তিনি নানাভাবে সঙ্কট মোচন করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞানী পতিতপাবন মহাযোগিগণ যে কোন অসাধ্য সাধন করিতে পারেন ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহারা সব সময় সেইসব অলৌকিক বিভূতি দেখাইতে চাহেন না। কিন্তু প্রয়োজনবোধে বা দীন আর্ত্ত পদাশ্রিত শিষ্যদের কাতর স্মরণে এইসব ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষেরা পরদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের চেষ্টা করেন। যোগিরাজকেও তাহা বহুবার করিতে দেখা গিয়াছে।

আর এক দিনের কথা, প্রকৃতিজয়ী এই মহাপুরুষ সংসারাশ্রমে থাকিয়াও জগৎ, সংসার ও দেহবোধ হইতে সর্ব্বদা নির্লিপ্ত থাকিতেন। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও সকালে তিনি গঙ্গায় স্নানান্তে গৃহে ফিরিতেছেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিল—"আপনার পা কাটিয়া গিয়াছে রক্ত ঝরিতেছে।"

যোগিরাজ এক খণ্ড কাপড় লইয়া ক্ষত স্থানটি বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং যথারীতি বাড়ি আসিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। বাড়ির লোকেরা তাঁহার ঘরের পাশ দিয়া যাতায়াতের সময় লক্ষ্য করিলেন রক্তের একটা ক্ষীণ রেখা নালা দিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহারা দেখিলেন যে ঘরে মহাযোগী সমাধিস্থ আছেন সেই ঘর হইতে রক্তধারা আসিতেছে। তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বহু ডাকাডাকি করিয়া তাঁহার সমাধি ভাঙ্গাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার শরীরে কোথাও কাটিয়া গিয়াছে কিনা।

যোগিরাজের কিছুই মনে নাই, তাই তিনি বলিলেন—"কোথাও ত কাটে নাই।" কিন্তু বাড়ির লোকেরা তখনও চিন্তিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হলে এ রক্ত আসছে কোথা থেকে?"

অকস্মাৎ মহাযোগীর মনে পড়িল। তিনি বলিলেন—"গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় পা কাটিয়াছিল, কিন্তু তাহা ত বাঁধিয়াছি।" তাহার পর

ক্ষতস্থানে দেখা গেল এক পায়ের আঙ্গুল কাটিয়াছে, আর তিনি অপর পায়ের আঙ্গুল বাঁধিয়াছেন এবং ক্ষতস্থান হইতে যথারীতি রক্ত ঝরিতেছে। এমনই তাঁহার দেহাতীত অবস্থা লাভ হইয়াছিল।

এবিষয়ে তিনি ভক্তদের বলিতেন—"প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে প্রাণবায়ু যখন সর্ব্বদার জন্য মাথায় চড়িয়া বসে তখন যোগীদের দেহবোধ থাকে না। তখনই যোগী কূটস্থে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সদা ব্রহ্মে যুক্ত হন এবং জগৎ সংসার হইতে নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তোমরাও চেষ্টা করলে পারবে।" তাই তিনি সকলকে বলিতেন—"ক্রিয়ার পরাবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থেকে সব কাজ কর। যেমন রাজস্থানী মহিলারা মাথায় কলসী নিয়ে হাসি-তামাসা করতে করতে যায়, কিন্তু মনটি থাকে কলসীতে, তেমনি কূটস্থে মনটি রেখে সকল কর্ম্ম কর। কিন্তু জেনে রেখো বিনা অনুশীলনে মহিলারা যেমন মাথায় কলসী নিয়ে ঐ প্রকারে যেতে পারে না, তেমনি বিনা সাধনায় কূটস্থে মন রেখে সকল কর্ম্ম করা যায় না। উহা প্রাণকর্ম্ম সাপেক্ষ।"

যোগিরাজের বাড়ির অনতিদূরে থাকেন তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য। শিষ্যের বড় ইচ্ছা গুরুদেবকে স্বীয় বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান। একদিন তাঁহার সেই ইচ্ছা গুরুদেবকে জানাইলে তিনি রাজি হইলেন। শিষ্যটি সেইমত বহুবিধ খাদ্যদ্রব্যের সহিত মাছের তরকারী করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিলেন। যোগিরাজও আনন্দ সহকারে যাহা খাইবার খাইলেন এবং অবশিষ্ট পাত হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ভক্তটির ইচ্ছা ছিল গুরুদেবের পাতে কিছু প্রসাদ থাকিবে এবং সেই গুরুপ্রসাদ বাড়ির লোকেরা সকলে পাইবে। সেজন্য তিনি বেশী বেশী খাদ্য থালায় দিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুদেব অবশিষ্ট খাদ্য ফেলিয়া দিয়াছেন দেখিয়া সকলে চুপ করিয়া রহিল। হাত-মুখ ধুইবার পর যোগিরাজ হঠাৎই বলিলেন—"পাতের প্রসাদ খাইয়া লাভ নাই। দেখ, ভগবান্ এবিষয়ে পরিষ্কার বলিয়াছেন—'প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।'[১] প্রকৃত প্রসাদে সর্ব্ব দুঃখের নাশ হয়। সেই প্রসাদ কি জান? সেই প্রসাদ হল আত্মপ্রসাদ। প্রাণ চঞ্চল বলিয়াই জীবের যত হানি, দুঃখ, কষ্ট। প্রাণকর্ম্মের দ্বারা প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ চঞ্চলতা রহিত হইলে

(১) গীতা ২।৬৫

কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ (কর্ম্মের নিবৃত্তি অবস্থা) স্থিরত্ব লাভ হয়, তাহাই আত্মপ্রসাদ। সেই আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে তবেই জীবের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হইয়া প্রসন্নভাব হয়। তোমরা সেই প্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা কর।" তিনি কখনও কাহাকেও উচ্ছিষ্ট খাইতে দিতেন না। দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"গলেমে মিঠা রস উপরসে নিচে গিরতা নাকসে লছ্‌গি গলেকে ভিতরসে খোকিকে সাত—ইসিকা নাম অমৃত—ইসিকো পিনেসে অমর হোতা হয়।"—জিহ্বা উপরে উঠাইয়া, তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে গলমধ্যে মিষ্ট রস অনুভব করিলাম যাহা উপর হইতে অর্থাৎ সহস্রার হইতে নীচে আসিতেছে, যাহা গলা ও নাকের মধ্যদেশে কাশিবার সময় প্রবেশ করে, ইহারই নাম অমৃত। এই অমৃত পান করিলে অমর হয়। দেবতাগণ সমুদ্রমন্থনে এই অমৃত পান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ অর্থাৎ ক্রিয়াবানগণ উত্তম ক্রিয়া করিয়া এই অমৃত পান করিয়া অমরপদ লাভ করিয়া থাকেন।

সেখানে তাঁহার অপর এক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা হইল গুরুদেবকে নিজ বাসভবনে একদিন মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবেন। গুরুদেব রাজি হওয়ায় শিষ্যটি নানাপ্রকার মৎস্য ইত্যাদি রন্ধন করিয়া ভক্তিসহকারে খাইতে দিলেন এবং পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। যোগিরাজও মহানন্দে সব খাইতে লাগিলেন। শিষ্যটি গুরুদেবের মনোরঞ্জনের জন্য বারবার বলিতে লাগিলেন—"বাবা, ইলিশ মাছের ঝালটা খান, রুই মাছের কালিয়াটা খান ইত্যাদি।" দু'চারবার বলিবার পর যোগিরাজ হঠাৎ খাওয়া ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। হয়ত কোন অপরাধ হইয়াছে এই ভাবিয়া শিষ্যটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, সব খাবার যে পড়ে রইল ?"

যোগিরাজ বলিলেন—"আমি কি মাছ খাই ? আমাকে মাছ দিলে কেন ?"

শিষ্যটি কৃতাঞ্জলিপুটে সভয়ে বলিলেন—"বাবা, আমি যে সেদিন অমুকের বাড়িতে আপনাকে মাছ খেতে দেখেছিলাম, তাই সাহস করে মাছের আয়োজন করেছিলাম।"

যোগিরাজ অবাক হইয়া বলিলেন—"আমি আবার কবে মাছ খেলাম ? আমি ত নিরামিষাশী।"

সবকিছু হইতে এমনিভাবে তিনি সর্ব্বদা নির্লিপ্ত থাকিতেন।[১]

কলিকাতার রাজবৈদ্য ৺গঙ্গাধর সেনের ছাত্র ছিলেন কবিরাজ পরেশনাথ রায়। পরেশবাবু পরে কাশী আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসা শুরু করিয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল কবিরাজী চিকিৎসাতেই বিখ্যাত ছিলেন তাহা নহে, তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতেও প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার যথেষ্ট দম্ভও ছিল।

যোগিরাজের শ্যালক রাজচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। সেই সূত্রে যোগিরাজের সহিত পরেশবাবুর পরিচয় ঘটে। পরেশবাবু চরকের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। একদা যোগিরাজের সমক্ষে সেই টীকার আলোচনা হয়। সেখানে বেশ কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। টীকার অংশবিশেষ পাঠের পর তিনি সকলের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিলে পণ্ডিতগণ উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যোগিরাজকে মৌন দেখিয়া পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন হয়েছে, আপনি কিছু বললেন না?"

যোগিরাজ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"সবই ভুল হয়েছে।"

---

(১) শ্রীভগবান্ এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ (গীতা ৫/৮-১০)

অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে যুক্ত এবং আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ায় বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞ এরূপ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া 'আমি কিছুই করি না' ইহা মনে করিয়া থাকেন এবং অনভিমান বশতঃ কর্ম্মে লিপ্ত হন না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ করিতেছে এই ভাব দৃঢ় হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া এবং সর্ব্বদা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থাকার দরুন ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনি সর্ব্বদা স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মে যুক্ত থাকায় পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না; যেমন পদ্মপত্র জলে থাকিলেও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না।

বিখ্যাত দাম্ভিক পরেশবাবুর মুখের উপর এইভাবে প্রতিবাদ করিতে পারেন এমন সাহস কাহারও ছিল না, তাই সকলে হতভম্ব হইয়া মুখ চাওয়া চাওই করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পরেশবাবু নিজেকে কিছুটা সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনি চরক সম্বন্ধে কি জানেন ?"

যোগিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"যাহা সঠিক তাহা জানি।"

শরাহত পরেশবাবু ব্যথিত চিত্তে কয়েকদিন কাটাইয়া শেষে একদিন যোগিরাজ সমীপে আসিয়া বলিলেন—"আমার শিক্ষক অধ্যাপক কবিরাজ ৺গঙ্গাধর সেন চরক পড়াইবার সময় বলিয়াছিলেন যে তিনি চরক সম্বন্ধে যাহা জানেন তাহা পড়াইলেন বটে তবে ইহার প্রকৃত অর্থ একমাত্র যোগিপুরুষগণই জ্ঞাত আছেন। যদি কোনদিন তেমন যোগিপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ কর তখনই ইহার নিগূঢ়ার্থ জানিতে পারিবে।[১]

ইহার পর পরেশবাবু যোগিরাজের অনুগত শিষ্যে পরিণত হন। পরেশবাবু অনেককেই বলিতেন যে তিনি কেবলমাত্র তিন জনের কাছে মস্তক নত করিয়াছেন—তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে পরমেশ্বর যাঁহাকে তিনি জানেন না, দ্বিতীয় তাঁহার বৈদ্যগুরু ৺গঙ্গাধর সেন এবং তৃতীয়জন শ্যামাচরণ লাহিড়ী। আর চতুর্থ জনের নিকট তাঁহার মাথা কখনও নত হইবে না।

এই পরেশবাবু শেষে যোগসাধনায় এত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন যে প্রায়ই তাঁহার সমাধি হইত এবং সেই সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য স্বয়ং যোগিরাজকে তাঁহার বাড়ি যাইতে হইত। পরেশবাবু ভাবিলেন ইহাতে তাঁহার গুরুর কষ্ট হইতেছে, তাই তিনি যোগিরাজের বাড়ির নিকটে একটি বাড়ি ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

পরেশবাবু দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশ গুরুপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়কে স্বেচ্ছায় উইল করিয়া দান করিয়া যান।

যোগিরাজের এক ভক্ত শিষ্যা একদিন যোগিরাজের কাছে তাঁহার একটি ফটো চাহিলেন। যোগিরাজ একটি নিজের ফটো দিয়া বলিলেন—"যদি মনে কর এটা ফটো তবে কেবলই ফটো, আর যদি মনে কর রক্ষাকবচ তবে তাহাই।"

কয়েকদিন পর উক্ত স্ত্রীলোকটি অপর এক ভক্ত শিষ্যার সহিত টেবিলের উপর গীতা রাখিয়া পড়িতেছিলেন। সামনে দেওয়ালে যোগিরাজের সেই

(১) যোগিরাজ পরে চরকের এক নিগূঢ় ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

ফটোটি টাঙান ছিল। এমন সময় প্রচণ্ড বজ্রপাত সহ জল ঝড় শুরু হওয়ায় মহিলা দুটি ভয়ে কাতর হইয়া ফটোর সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"ঠাকুর, এই বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

হঠাৎ নিকটেই একটি বাজ পড়িল এবং মহিলা দুইটির মনে হইল তাঁহারা যেন ঝলসিয়া গেল। পরে মহিলা দুইজনেই বলিয়াছিলেন যে বরফের চাঁই দিয়া কেহ যেন তাঁহাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

এইভাবে তিনি শরণাপন্ন ভক্তদের সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন।

যোগিরাজের আর এক প্রিয় শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশী আসিয়া যোগিরাজের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তখন যোগক্রিয়ায় খুব উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া মানুষ চিনিবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

তিনি একদিন সকালে গঙ্গায় স্নান করিয়া গুরুগৃহে ফিরিতেছেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন তাঁহার কিছুটা অগ্রে একজন লোক যাইতেছেন যিনি বেশ উচ্চ পর্য্যায়ের সাধক হইবেন। তাই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধিক জোরে হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিও পিছন ফিরিয়া তাঁহার দিকে না তাকাইয়া অনুরূপ জোরে হাঁটিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে ধরিবার জন্য দৌড় শুরু করিবা মাত্র সেই ব্যক্তিটি অদৃশ্য হইলেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে বড়ই অনুতাপ হইল। তিনি ভাবিলেন তাঁহার গুরু বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি অপর মহাত্মার পিছনে ধাবিত হওয়ায় ব্যভিচার দোষে দোষী হইয়াছেন। মনে মনে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে যোগিরাজের নিকট পৌঁছিবামাত্র যোগিরাজ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ধরিতে পারিলেন না?"[১]

অনুতপ্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে আরও লজ্জিত হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"কাঁদিবেন না, তিনি আপনারই এক গুরুভাই। আপনি যদি, তাঁহাকে দেখিতে চান তাহা হইলে বলুন, আমি স্মরণ করিলেই তিনি আসিবেন।"

---

(১) যোগিরাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া অনেক সময় দীর্ঘদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়িতে থাকিতেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শান্ত হইয়া বলিলেন—"আমি আর দেখিতে চাই না।"

যোগিরাজ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—তিনি আপনারই এক মুসলমান গুরুভাই, তিনিও কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহেন না, পাছে হিন্দুদের মধ্যে কোন অসন্তোষ হয়।"

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া কাশীতে বাস করিতেন এবং অধিকাংশ সময় পূজা পাঠ লইয়াই থাকিতেন। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া যোগিরাজ সমীপে আসিয়া করজোড়ে যোগদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"এখন আপনি যাহা করিতেছেন তাহাই করুন। সময় হইলেই পাইবেন।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েকদিন পর এক বৃদ্ধা আসিয়া যোগিরাজকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন যে তিনি ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রার্থী।

যোগিরাজ বলিলেন—"কাল সকালে স্নান করিয়া আসিবেন।"

উভয় দিনই উপস্থিত ছিলেন এমন এক ভক্ত, মহিলাটি চলিয়া গেলে যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পূর্ব্বের ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খুব ধার্ম্মিক বলিয়া জানি, কিন্তু তিনি দীক্ষা পাইলেন না, অথচ ঐ মহিলাটি দীক্ষা পাইবেন ইহার কারণ কি?"

যোগিরাজ প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"ঐ ব্রাহ্মণের এই জন্মে সবেমাত্র ধর্ম্মভাব হইয়াছে সেজন্য উহার এখন বাহ্যিক পূজা পাঠ লইয়া থাকাই ভাল, কিন্তু মহিলাটি পূর্ব্বজন্মে যোগক্রিয়া পাইয়াও অবহেলা করিয়াছিল। এই জন্মে পূর্ব্ব কর্ম্মফল শেষ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তাহাকে যোগদীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।"

যোগিরাজের এক ভক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাশীতে ডাক ও তার বিভাগে চাকরী করিতেন। তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী কালীবাবু ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কুপথগামী ছিলেন। সেজন্য হরিনারায়ণবাবুর বড়ই দুঃখ হইল এবং তিনি বন্ধুকে কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য বহু বুঝাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন তিনি ভাবিলেন বন্ধুকে যদি কোন প্রকারে তাঁহার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে সে আর কুপথে যাইতে পারিবে না। তাই একদিন তিনি বন্ধুকে বলিলেন—"চল, যোগিরাজের সহিত দেখা করে আসি।"

বন্ধুটি কিছুতেই রাজি হইলেন না, বরং যোগিরাজ সম্বন্ধে নানান বিরূপ কথা বলিতে লাগিলেন।

হরিনারায়ণবাবু তাঁহার বন্ধুর বড় হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস কোন প্রকারে বন্ধুকে একবার তাঁহার গুরুদেবের নিকট হাজির করিতে পারিলে আর সে ভুল পথে যাইতে পারিবে না। তাই তাঁহার গুরু সম্বন্ধে নানান বিরূপ কথা শোনা সত্ত্বেও তিনি বিফল মনোরথ না হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন চেষ্টা চালানর পর বন্ধুটি একদিন রাজি হইলেন এবং সন্ধ্যার সময় উভয়ে গেলেন যোগিরাজের নিকট।

যোগিরাজ তখন বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন। উভয় বন্ধু আসিয়া প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। নানান জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বন্ধুটির বেশ ভাল লাগিল এবং সেদিনের মত চলিয়া গেলেন।

পরদিন কালীবাবু নিজেই তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন—"চল, আজও যোগিরাজকে দর্শন করে আসি।"

হরিনারায়ণবাবু আনন্দিত হইয়া বন্ধুকে লইয়া পুনরায় তাঁহার গুরুর নিকট গমন করিলেন। এইভাবে কয়েকদিন বন্ধুকে লইয়া সেখানে যাইতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে কালীবাবু আর কুপথে না গিয়া সৎ জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিন পর যোগিরাজের নিকট হইতে যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সাধন পথে প্রবেশ করিলেন।

এইভাবে দেখা যায় কত বিপথগামী ব্যক্তি তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবামাত্র তাহাদের মনের গতি বদল হইত, তাহারা সৎ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত।

উক্ত হরিনারায়ণবাবু বিখ্যাত ধ্রুপদ সঙ্গীত গায়ক ছিলেন। যোগিরাজের লীলা-সংবরণের বহু বৎসর পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাড়িতে যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেইখানে তাঁহার এক মর্ম্মর মূর্ত্তি[১] প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে সেখানে একটি উৎসবেরও আয়োজন করা হইয়াছিল। যোগিরাজ পৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় সেই উপলক্ষ্যে হরিনারায়ণবাবুকে

---

(১) বর্ত্তমানে যোগিরাজের ঐ মর্ম্মর মূর্ত্তি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি 'সত্যলোক, ডি২২/৩, চৌষট্টিঘাট, বারাণসীতে' স্থাপিত রহিয়াছে।

নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন সঙ্গীত পরিবেশন করিতে। কিন্তু হরিনারায়ণবাবু নাক কান মলিয়া জিহ্বা কাটিয়া বলিয়াছিলেন—"এখানে গান গাইতে বোল না, এখানে ফক্কুড়ি করা উচিত নয়।" কারণ জিজ্ঞাসা করায় হরিনারায়ণবাবু বলিয়াছিলেন—"একদিন আমার গানের গুরু ও যোগিরাজের শিষ্য শ্রীরামপুরের রামদাস গোস্বামী মহাশয় সহ উভয়ে যোগিরাজকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাদের সহিত গানের সুর, তাল, লয় সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তিনি মুখ বন্ধ করিয়া এমন কতকগুলি নাদ স্বরের ধ্বনি করিলেন, যাহা আজও কানে লেগে আছে। সে সুরের কাছে আমার সুর কিছুই নয়। কোন্ সুর, কোন্ ধ্বনি, কোন্ স্থানীয় প্রযত্ন হইতে উৎপন্ন, তাহা সেদিন তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। সেজন্য এখন তাঁহার সামনে গান গাহিবার সাহস করি না।"

পাতা মুড়িবেন না।
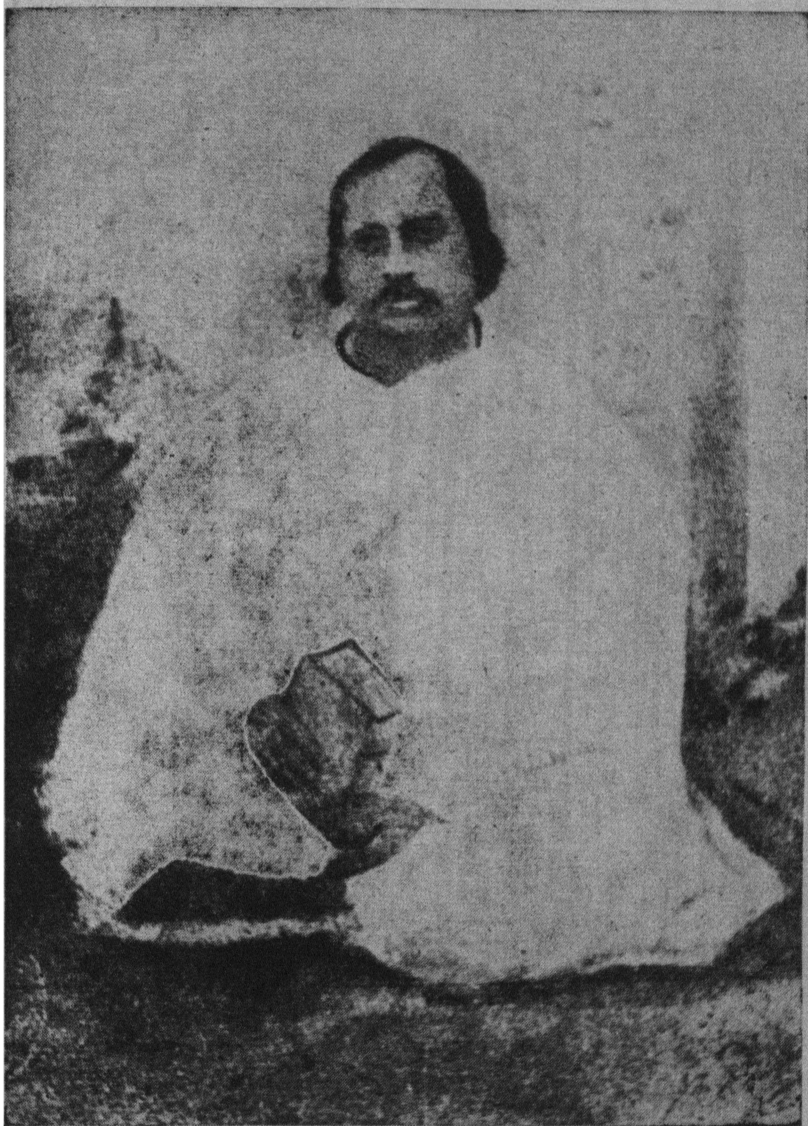
যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

(মধ্যবয়স)

যোগিরাজপৌত্র শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী

নবম পরিচ্ছেদ

যোগসাধন-রহস্য।

ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন মহাগুরু, উপদেশ দিতেছেন। এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতা-পিতা ও নিকট গুরুজন ছাড়া আর কে কে প্রণম্য? আর কাহাদের প্রণাম করা উচিত এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রণাম পাইবার উপযুক্ত?"

যোগিরাজ বলিলেন—"মাতা-পিতা শ্রেষ্ঠ গুরু, তাঁহারা অবশ্য প্রণম্য। এছাড়া মনু বলিয়াছেন—

"চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়োবরস্য চ॥"[১]

মনু বলিয়াছেন যিনি গাড়ি চড়িয়া যাইতেছেন অর্থাৎ কুটস্থেতে থাকিয়া চলিতেছেন, যিনি গলা হইতে দশ অঙ্গুলি উপরে উঠিয়া প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিয়া আছেন, যাঁহার আপন চক্ষে জোর দৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যাঁহার মস্তক ভারি হইয়াছে, যাঁহার মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর স্থিতি হওয়ায় মস্তকে ঘোমটার মত টান বোধ হইতেছে, যিনি কুটস্থে সদা সর্ব্বদা ডুবিয়া আছেন, যাঁহার জিহ্বা তালুতে পৌঁছিয়া গিয়াছে, আর যিনি ওঁকার ক্রিয়ারূপ প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে চলিয়াছেন এমন ব্যক্তিরা সকলেই প্রণম্য। ইঁহাদের সকলকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এমন ব্যক্তিদের অগ্রে বসিবে না। মনু এবিষয়ে আরও বলিয়াছেন—

"তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতকপার্থিবৌ।
রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্॥"[২]

ইঁহারা সকলে একত্র হইলে ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার জিহ্বা তালুতে গিয়াছে এবং যিনি কুটস্থে ডুবিয়া মগ্ন হইয়া আছেন এই দুই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। আবার তাঁহাদের মধ্যে যিনি কুটস্থে সর্ব্বদা ডুবিয়া আছেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তাই এই সকল ব্যক্তিদের সহিত কখনও বৈরিতা করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও এই প্রকার ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান দিয়া চলিবে।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের দেশে মহাত্মার অভাব

(১) (২) মনুরহস্য ২য় অধ্যায়

নাই। অনেকেই মহাত্মা সাজিয়া বসিয়া আছেন। এ অবস্থায় মহাত্মা চিনিবার সহজ উপায় কি? এবং কোন্ ব্যক্তির নিকট হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারা যায়? কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিবার যোগ্য?"

যোগিরাজ বলিলেন—"উপরিউক্ত ব্যক্তি সকল ধর্ম্মোপদেশ দিবার যোগ্য বলিয়া জানিবে। যাঁহার জিহ্বা রাজিকাতে পৌঁছিয়াছে সহজ উপায়ে তাঁহাকেই মহাত্মা বলিয়া চিনিবে।"

ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রোবৃদ্ধস্য পিতাভবতি ধর্ম্মতঃ॥[১]

আত্মধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি উপদেশদাতা এবং যিনি ক্রিয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ স্বধর্ম্ম নিমিত্ত শাসন করেন, তিনি বালক হইলেও তাঁহাকে পিতাস্বরূপ জানিবে। তাই ক্রিয়ার নিমিত্ত উপদেশদাতা ও শিক্ষাদাতাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিবে।

অপর এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা না জানিয়া অনেক সময় পাপ কার্য্য করিয়া থাকি। যেমন রাস্তা চলিতে চলিতে অনেক সময় না জানিয়া পদদলিত হইয়া অনেক প্রাণী মারা যায়। এইভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সব পাপ হয় তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি?"

যোগিরাজ বলিলেন শাস্ত্রে মনু এবিষয়ে পরিষ্কার বলিয়াছেন—

অহ্না রাত্র্যা চ যাঞ্জন্তুন্ হিনস্ত্যজ্ঞানতো যতিঃ।
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাণায়ামান্ ষড়াচড়েৎ॥[২]

যে যতি না জানিয়া জীব হত্যারূপ পাপ করে, মাত্র ছয়বার বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়ামেতেই সেই পাপ হইতে বিশেষরূপ শুদ্ধ হয়। কারণ ষট্‌চক্রপথে অন্তর্মুখী প্রাণায়ামই পরমতপ।

প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎকৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমন্তপঃ॥[৩]

ব্যাহৃতি ও প্রণবযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক তিনবার[৪] প্রাণায়াম করিলে তাহাই পরমতপ।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥[৫]

---

(১) মনুরহস্য ২য় অধ্যায়।
(২) (৩) এবং (৫) মনুরহস্য।
(৪) তিনবার বলিবার উদ্দেশ্য হইল ন্যূনপক্ষে।

(অগ্নি দ্বারা যেমন ধাতু শুদ্ধ হয়, প্রাণায়াম দ্বারা তেমনি ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়। বর্ত্তমান চঞ্চল মনই পাপ কার্য্যে রত থাকে। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে বর্ত্তমান মনও স্থির হইয়া যায়। বর্ত্তমান চঞ্চল মন স্থির হইলে সকল ইন্দ্রিয়ও স্থির হইয়া যায়, তখন তাহারা কার্য্য রহিত হওয়ায় সকলেই শুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই ইন্দ্রিয়দের শুদ্ধাবস্থা। কারণ তাহাদের কার্য্য না থাকিলে আর পাপ কার্য্য করিবে কে? তাই তিনি বলিতেন—"জিহ্বা উঠনেসে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হয়।" ইহাকেই খেচরী অবস্থা বা জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ বা গোমাংস ভক্ষণ বলে। ইহা যোগসাধনার প্রধান অঙ্গ। শাস্ত্র কখনও গোবৎসকে যজ্ঞে আহুতি দিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিতে বলেন নাই; অবশ্য বাহ্যভাবে তাহাই মনে হয়। যজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণযজ্ঞ; প্রাণকর্ম্মের দ্বারা চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে আহুতি দেওয়া বা লয় করা। এই প্রাণযজ্ঞই প্রকৃত যজ্ঞ। ইহা করিতে হইলে গোমাংস ভক্ষণ করিতে হয়। গো শব্দে জিহ্বাকে বুঝায়।)

> গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্।
> তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ॥
> গোশব্দেনোদিতা জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি।
> গোমাংসভক্ষণং তত্তু মহাপাতকনাশনম্॥[১]

অর্থাৎ যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ ও চন্দ্র হইতে যে সুধা ক্ষরণ হয়, সেই সুধা পান করেন, তিনিই কুলীন, অন্যে কুলঘাতক। গো শব্দে জিহ্বাকে বুঝায় এবং তালুমূলে তাহা প্রবেশ করানই গোমাংস ভক্ষণ। এই গোমাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাপীরও পাপ নাশ হয়। আবার ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> গো ভোজনে মহাপুণ্য,
> জায়া থাকিতে গৃহ শূন্য।
> গুরু মেরে স্বর্গবাস,
> হরি ভজলে সর্ব্বনাশ।

অর্থাৎ এই প্রকারে গোভোজন করিলে মহাপুণ্য হয়; জায়া সহ সকল প্রকার বিষয়ের প্রতি আসক্তি চলিয়া যায়; চঞ্চল প্রাণই গুরু, সেই গুরুকে হত্যা করিয়া অর্থাৎ স্থিরপ্রাণে লয় করিলে স্বর্গবাস এবং এই প্রকারে যিনি হরির উপাসনা করেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জীব

---

(১) হঠপ্রদীপিকা।

বিষয় ভোগ করে তাহারা কার্য্য রহিত হয়। হরিই (স্থিরপ্রাণ) তখন সাধকের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়াভিমুখী মনের হরণপূর্ব্বক নাশ করেন।

পুরাকালে সকল ঋষিই এই প্রকারে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। শাস্ত্রপ্রণেতারা সর্ব্বজীবে ঈশ্বর দর্শন করিতেন এবং জীবহত্যা মহাপাপ এই উপদেশ দিয়াছেন। ঋষিগণ সর্ব্বজীবে ঈশ্বরকে দেখিয়া কোন জীবকে হত্যা করার উপদেশ দিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ আকারে ইঙ্গিতে সবই বলিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহা সবই বাহ্য ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তিনি যোগসাধন শিক্ষা দিতে গিয়া সকল ভক্তকে বলিতেন—"ক্রিয়াযোগ অত্যন্ত সূক্ষ্ম কর্ম্ম, তাই সকলেরই উচিত পুনঃ পুনঃ গুরুসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্রিয়াযোগ দেখাইয়া লওয়া এবং উক্ত বিষয়ে গুরুর উপদেশ বারংবার গ্রহণ করা। নচেৎ সূক্ষ্ম ক্রিয়াযোগকে বোঝা সকলের পক্ষে প্রথম প্রথম অসুবিধা হয় এবং ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। কেহ যদি মনে করে প্রথমবারেই সব বুঝিয়া গিয়াছে তাহা ভুল। সকল ভক্তের উচিত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুরুসমীপে সমর্পণ করা। নিজেকে যত সমর্পণ করা যায় ততই গুরুর নিকট হইতে যোগপ্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি অনুধাবন করা যায়। সমর্পণ ছাড়া গুরুর নিকট হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। গুরু ও দেবতা সন্নিধানে কখনও রিক্ত হস্তে যাইবে না। গুরুসমীপে সর্ব্বদা বিনীতভাবে গমন করিবে। তাঁহার অগ্রে বসিবে না। তিনি কুপিত হইলেও নিজ ক্রোধ ব্যক্ত করিবে না। আমি বড় পণ্ডিত বা অনেক শাস্ত্র জানি এই ভাব প্রদর্শন করিবে না। শাস্ত্র লইয়া গুরুর সহিত তর্ক করিবে না। আত্মজ্ঞান বিষয়ে তিনি যাহা বলেন অবনত মস্তকে তাহা অবধারণ করিবে।"

তিনি আরও বলিতেন—"যাহারা নিয়মিত ক্রিয়া করে তাহাদের প্রায় রোগ হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারের মূল আরোগ্য হইতেছে; কিন্তু রোগ সকল আরোগ্যকে নষ্ট করে এবং মুক্তি ও জীবনকে নষ্ট করে। অতএব ক্রিয়াবানেরা গুরুপদেশে যথোচিত ক্রিয়া করিলে তাহাদিগের নিরোগ, বৃদ্ধি এবং পরিণামে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। অতএব শরীর রক্ষার্থে গুরু আজ্ঞা সদা পালন করিবে। বায়ুই ভগবান্ হইতেছেন, ক্রিয়া করিলে সেই ভগবানের রক্ষা হয়। এই প্রকারে শরীর ও আত্মাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ক্রিয়াবানেরা আপদে বিপদে পড়িলে ক্রিয়া

করিলেই তাহা হইতে রক্ষা পাইবে। জিহ্বা সদা ঊর্দ্ধে রাখা উচিত এবং জিহ্বা উঠাইয়া সম্পূর্ণ ক্রিয়া করিবে। জিহ্বা উঠাইয়া স্ত্রী গমন করিবে। মহিলারা ঋতুকালীন ক্রিয়া করিবে না। খাইবার পর বাম কাতে শুইবে। এই বায়ুক্রিয়া উত্তমভাবে করিলে কখনও হৃদরোগ হয় না।”

সদ্‌গুরু কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে যোগিরাজ বলিতেন—“গু শব্দে অন্ধকার এবং রু শব্দে আলোক। যিনি অজ্ঞানতিমিররূপ অন্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই গুরু। শ্বাস-বায়ুই এই অন্ধকার নাশ করিতে পারেন, তাই অন্ধকার হইতে আলোক প্রদর্শনকারী শ্বাস-বায়ুই প্রকৃত সদ্‌গুরু। অন্ধকার নিরোধকরণের জন্যই তাঁহাকে গুরু বলা হয় এবং কূটস্থই শ্রীগুরু।”

শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরই এই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপ্রদ এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ আত্মক্রিয়ায় রত হওয়া উচিত। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

জপেচ্ছাক্তশ্চশৈবশ্চ গাণপত্যশ্চবৈষ্ণবঃ।
সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্॥[১]

যোগিরাজ বিবাহিত ব্যক্তিদের সস্ত্রীক ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রদান করিতেন। কারণ তিনি বলিতেন সস্ত্রীক যোগসাধন প্রাপ্ত হইলে সাধনায় বিঘ্ন কম হয়। তিনি আরও বলিতেন এই ক্রিয়াযোগ সকল প্রকার সংস্কারের ঊর্দ্ধে।

*　*　*　*　*

যোগিরাজের সামনের বাড়িতে বাস করিতেন হারাণচন্দ্র রায়। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নিজ বাড়ির ছাদের উপর হইতে রাস্তার দিকে মূত্র ত্যাগ করিতেন। ইহাতে যোগিরাজের বাড়ির লোকদের বড়ই অসুবিধা হইত। একদিন যোগিরাজ হারাণবাবুকে ঐ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু যাহার কাল ঘনাইয়া আসিয়াছে সে মহাপুরুষের কথাতেও কর্ণপাত করে না।

হারাণবাবু বলিলেন—“আমার বাড়িতে আমি যাহাই করি না কেন

---

(১) গুরুগীতা।

তোমার দেখার প্রয়োজন নাই।" ইহা ছাড়া অনেক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

যোগিরাজ সবকিছু শুনিয়া বড় ব্যথিত হইলেন এবং কোন কথা না বলিয়া পরদিন ঐদিকে একটি দেওয়াল তুলিয়া দিলেন।

অল্প কিছুদিন পর হারাণবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় হারাণবাবুর বংশে আর কেহ জীবিত রইল না।

মনু বলিয়াছেন—

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥[১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানরহিত হইয়া পরমাত্মার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্থিরত্বকে জানিয়া পৃথিবীতে সুখে চরণ করেন, তেমন ব্যক্তিকে যে অপমান করে, তাহার বিনাশ হয়। তিনি নিজে কিছুই করেন না, কারণ তিনি মানাপমানের উর্দ্ধে উঠিয়া ঈশ্বরের উপর পরম নির্ভরশীল হইয়া অবস্থান করায় তাঁহার ভাল-মন্দ সকল দিক্ ঈশ্বরই দেখিয়া থাকেন। অতএব তেমন ব্যক্তিকে কেহ অপমান করিলে বা ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিলে ঈশ্বরই তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। তাই যোগিরাজ সকল ভক্তকে বলিতেন—"**জো ভগবান কো হামেসা ধ্যান করে উস্কো কাম উহ করতা হয়।**"

সমাধিকালে দেশ-কাল বা নাম-রূপ থাকে না। তখন সব মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। নাম-রূপের সীমার ভিতর যাহা কিছু তাহা নিত্যবস্তু হইতে পারে না। তাই তিনি বলিতেন আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও এবং সমাধির মাধ্যমে সেই স্থির অবস্থায় অবস্থান কর। তাহা হইলে দেখিবে নাম-রূপাত্মক জগৎ আর নাই। ক্ষুদ্র অহংবোধ স্তব্ধ হইয়া অখণ্ড স্থির সত্ত্বাকে নিজ স্বরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিবে। যে জ্ঞান দুই দেখে তাহা তুচ্ছ, উহা ইন্দ্রিয় জাত জ্ঞান। আমি ভক্ত, তুমি ভগবান্ ইহাও তুচ্ছ জ্ঞান। কিন্তু যে জ্ঞান সকলের ভিতর সেই এক আত্মসত্ত্বাকে দেখে তাহাই যথার্থ জ্ঞান। যে আত্মসত্ত্বা সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে বর্ত্তমান চঞ্চল মন ও বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় না। বেদান্ত প্রতিপাদ্য অনুভূতি বা জ্ঞান লাভ হইলে আর কেবল মাত্র ব্যক্তি, স্থান বা মূর্ত্তি বিশেষে

(১) মনুরহস্য

ঈশ্বরত্ব আরোপ করা যায় না। তখন সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন হয়। তখন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মণ, শূদ্র, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাকে না। তখন সর্ব্বত্র মহাপ্রাণকে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ হইয়া যায়। তাই দেখা যায় উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যোগিরাজের কাছে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, গরীব কোন প্রকার ভেদাভেদ ছিল না। তিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সকল রকমের কুসংস্কার এবং সঙ্কীর্ণ আচারের উর্দ্ধে উঠিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মূল সত্যকে তিনি এক জায়গায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সকলেই অমৃতের পুত্র, কেহ ছোট নয় কেহ বড় নয়। আর দেখা যায় মাত্র কয়েকজন মহামানব যেমন চৈতন্য, কবীর, নানক, দয়ানন্দ প্রভৃতি এইভাবে ভেদাভেদশূন্য হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে যোগিরাজের প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা ছিল অপূর্ব্ব। তিনি সাধনার মাধ্যমে সেই অবস্থায় পৌঁছিয়া পাঁচ নম্বর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—"জ্যোতকে ভিতর নিলা নিলাকে ভিতর এক সফেদ বিন্দি দেখা উসকে ভিতর আদমি ওহি বহুত কিস্‌ম কে হিন্দু ইংরেজ হোতা হয়।" অর্থাৎ (কূটস্থের জ্যোতির ভিতর নীল, নীলের ভিতর এক সাদা বিন্দু দেখিলাম, তাহার ভিতর এক মানুষ দেখিলাম। তিনিই পুরুষোত্তম। তিনিই সকল রকমের হিন্দু ইংরেজ প্রভৃতি হইয়াছেন। অপর জায়গায় লিখিয়াছেন—"দম পর দম অল্লা—দমকে পরে জো দম হয় সো অল্লা য়ানে স্থির ঘর।" অর্থাৎ প্রতি শ্বাসের টানা ও ফেলা ইহার মাঝে একবার স্থিরত্ব আছে অর্থাৎ শ্বাস টানা শেষ ফেলা শুরু এই সময় এবং ফেলা শেষ টানা শুরু এই উভয় সময়েই একবার করিয়া স্থিরত্ব আসে এবং সেই স্থির অবস্থাই আল্লা। কিন্তু সেই স্থিরত্বের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। আল্লা অর্থাৎ খোদা,[১] যাহা খুদ বা আদি তাহাই খুদা। খুদ অর্থে স্বয়ং বা মূল। উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে প্রাণের যে স্থির অবস্থা হয়; তাহাই মূল বা আদি বা স্বয়ং, যাহা সর্ব্ব জীবে বর্ত্তমান এবং সেই খুদ বা খোদস্বরূপ স্থির প্রাণ চঞ্চল হইলেই জীবভাব। স্থির প্রাণ হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি, তিনিই আদি পুরুষ ব্রহ্ম, তিনিই খুদা। পূরকের শেষে ও রেচকের আরম্ভে এবং রেচকের শেষে

(১) খোদ—ফার্সী 'খুদ'-শব্দজ।

ও পূরকের আরম্ভে যে স্থির অবস্থা উপলব্ধি হয়, যাহা কেবলমাত্র যোগিগণই জ্ঞাত আছেন, তাহাকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা বাড়াও এবং তাহাতেই অবস্থান কর, তাহাই মূল বা খুদ, তাহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। "খোদা য়ানে খোদ—আ জব আপনেসে আতা হয়। অল্লা—আল্লা বড়া যো সবসে বড়া।" —প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে আপনা হইতেই যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় তিনিই মূল বা খোদা এবং সেই স্থিরাবস্থারূপ মহাকাশ তিনিই সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় সর্ব্ব বৃহৎ, তাই তিনিই আল্লা। তাই তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন— "বেদমমে জো দম হয় সোই অসল দম হয়।"—বেদম অর্থাৎ দম বিহীন অবস্থা। শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আটকাইয়া না রাখিয়া অন্তর্ম্মুখী প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে আপনা হইতে যখন কেবল-কুম্ভক অবস্থা লাভ হয় তাহাই বেদম ; তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্ম্মুখী গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হইয়া যায়। ইহা প্রাণকর্ম্ম সাপেক্ষ। সেই বেদমই অর্থাৎ দম বিহীন অবস্থাই আসল দম (গুরুবক্ত্রগম্য)। এই অন্তর্ম্মুখী প্রাণায়ামে বাহিরের বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম্ম নাই। এই প্রাণায়ামের আরম্ভেই ইড়া ও পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ুকে লইয়াই কর্ম্ম; বাহিরের বায়ু বাহিরে, ভিতরের বায়ু ভিতরে। কুটস্থের ভিতর যে খুদ স্বরূপ পুরুষোত্তম তাহা সকল মনুষ্য শরীরে একই ভাবে বর্ত্তমান। তিনি হিন্দু, ইংরেজ, মুসলমান প্রভৃতি রূপে পৃথক নহেন। মূলে সকলেই এক, পার্থক্য কেবল দ্বৈতভাবে। অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ স্থিরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন পার্থক্য থাকে না। তাই দেখা যায় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ, বহু মুসলমান—যেমন আমির খাঁ, রহিমুল্লা খাঁ, আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি, কুর্গ রাজ্যের কমিশনার এক ইংরেজ সাহেব, হাজারিবাগের পুলিশ সুপার স্পেন্সর সাহেব সহ বহু ইংরেজ ভক্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার ডায়েরীতে লেখাও আছে। বিশ্ববরেণ্য পতিতপাবন অন্যান্য মহাগুরুদের মত তিনিও পতিত, সমাজনিন্দিতদের প্রতিও অকৃপণ ছিলেন।

* * * *

যোগিরাজ শিষ্য অবিনাশবাবু বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে[১] চাকরী করেন। গুরুদেবকে একবার দর্শন করিবার ইচ্ছা হওয়ায় এক সপ্তাহের

(১) বর্ত্তমানে South Eastern Railway.

ছুটি চাহিয়া তাঁহার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। তখন তাঁহার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ছিলেন পরমহংস যোগানন্দজীর পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ। ভগবতীবাবু অবিনাশবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—"ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল হলে চাকরিতে উন্নতি করা যায় না, অফিসের কাজে ভাল করে মন দাও।"

অবিনাশবাবু বিষন্নমনে পদব্রজে বাড়ি ফিরিতেছেন। পথে দেখিলেন ভগবতীবাবুও পালকি করিয়া যাইতেছেন। নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ভগবতীবাবু পালকি হইতে নামিয়া একসঙ্গে পদব্রজে পথ চলিতে লাগিলেন। সান্ত্বনা দিবার ছলে এবং পার্থিব উন্নতি যাহাতে হয়, সেজন্য ভগবতীবাবু অবিনাশবাবুকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু উদাসীনভাবে কথাগুলি শুনিতেছিলেন এবং মনে মনে তাঁহার দয়াল গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন যাহাতে তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ পান।

তাঁহারা উভয়ে মাঠের রাস্তা ধরিয়া চলিতেছেন। অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ তখন চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া এক উদ্দীপনাময় মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে। হঠাৎ কয়েক গজ দূরে তাঁহারা দেখিলেন যোগিরাজ অপার্থিব শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—"ভগবতীবাবু, আপনি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর বড়ই নির্দ্দয়।" এই কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। অবিনাশবাবু করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভগবতীবাবু বিস্মিত হইলেন। কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কাল থেকে আপনার ছুটি, আপনি আপনার গুরুদেবকে দর্শন করিতে চলিয়া যান। আর যদি আমাকেও আপনার সাথে লইয়া যান ভাল হয়। আমি সেই মহাযোগীকে দর্শন করিতে চাই।"

পরদিন ভগবতীবাবু সস্ত্রীক অবিনাশবাবুর সহিত ট্রেনে করিয়া কাশী রওয়ানা হইলেন। যোগিরাজের বাড়িতে পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহারা প্রণাম করিলেন।

যোগিরাজ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু দুইটি উন্মীলন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কাহাকেও ধর্ম্মপথে বাধা দেওয়া উচিত নয়।"

এরপর ভগবতীবাবু সস্ত্রীক যোগিরাজের নিকট ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই ভগবতীবাবু তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দলালের জন্মের কিছুদিন পর শিশুপুত্রকে লইয়া সস্ত্রীক কাশী আসিয়াছেন গুরু সমীপে। ধ্যানমগ্ন

নিজের মোটামুটি আর্থিক স্বাধীনতা ছিল। তিনি সরকারী চাকরী করিয়াছেন, পেনশন লইয়াছেন, ছাত্র পড়াইয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় অন্যান্য গুরুগণ, যাঁহাদের নিজস্ব রোজগার বা আর্থিক স্বাধীনতা থাকে না, তাঁহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শিষ্যদের ঐশ্বর্য্যের উপরে নির্ভরশীল হইয়া থাকেন। কিন্তু যোগিরাজ স্বকীয় উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করায় তাঁহাকে পরান্নজীবী হইতে হয় নাই। তিনি অপরের আনুকুল্যের প্রত্যাশী ছিলেন না। তাঁহার স্থাপিত আদর্শের মধ্যে ইহা বৃহত্তম আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি সকল ভক্তকে সেইভাবে চলিতে বলিতেন।

(তিনি বলিতেন, যে যোগসাধনার দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবের উদয় হয় না, সে যোগ যোগই নহে। সঠিক এবং উত্তম যোগসাধনা করিলে অন্তরে ঈশ্বরভাব বা প্রেম অবশ্যই হইবে। কামনা, বাসনা, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, পরশ্রীকাতরতা সহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও মনধর্ম্ম আপনা হইতেই দমন হইবে। তাই উহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যোগ সাধনার দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবকে প্রাপ্ত হইলে বাহিরে সবকিছুতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। অন্তরদেবতাকে পাইবার জন্য যাহার আগ্রহ হয় নাই, সে যদি সকল তীর্থ ঘুরিয়া বেড়ায় কিছুই লাভ হইবে না।)

শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি লাভের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন নাই। স্বতন্ত্র চেষ্টার মাধ্যমে ঐগুলি যদিও লাভ করা যায় তবে তাহা অস্থায়ী হইবে। কিন্তু উত্তমরূপে প্রাণকর্ম্ম করিতে থাকিলে ঐগুলি আপনা হইতেই অর্জ্জিত হইবে এবং তাহা স্থায়ী হইবে। সেই স্থায়ী ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি এবং স্থায়ী জ্ঞানই বিজ্ঞান। অপরদিকে কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মোহ ইত্যাদি যতপ্রকার আসুরিক বৃত্তি আছে, যাহারা সাধনপথের অন্তরায় স্বরূপ, সেগুলিকেও মনের দ্বারা চেষ্টা করিলে ত্যাগ হইবে না। যতটুকু ত্যাগ হইবে তাহা অস্থায়ী। কিন্তু উত্তমরূপে প্রাণকর্ম্ম করিতে থাকিলে ঐগুলি আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঐ জায়গায় শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি অর্জিত হইবে। এই প্রাণকর্ম্মের এমনই মহিমা যে ইহা করিতে থাকিলে একাধারে আসুরিক বৃত্তির ত্যাগ ও সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয় এবং কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার জন্য স্বতন্ত্র অর্থাৎ মনের দ্বারায় চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না, ঐগুলি আপনা হইতেই যাইবে ও আসিবে। আসুরিক বৃত্তিগুলি যাইলেই সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলি আপনা হইতেই আসিবে। মন বা

ইচ্ছার দ্বারা চেষ্টা করিয়া ত্যাগ করিতে গেলে সঠিক ত্যাগ আসিবে না। কারণ যতক্ষণ বর্ত্তমান চঞ্চল মন আছে ততক্ষণ সঠিক ত্যাগ সম্ভব নহে। অতএব উত্তম প্রাণকর্ম্মের দ্বারা ইচ্ছা বা মনের নাশ করিতে হইবে। সেই ইচ্ছাতীত অবস্থায় কোন কিছুই থাকিবে না, তাহাই সঠিক ত্যাগ বলিয়া জানিবে। তাই তিনি সকলকে বলিতেন—**"ক্ষুধার্ত্তের নিকট অন্ন যতখানি প্রয়োজন, মুমুক্ষুর নিকট ক্রিয়া ততখানি প্রয়োজন।"**

অনেক সময় দেখা গিয়াছে অপরের সঞ্চিত রোগ বা পাপরাশি ধ্বংস করিবার জন্য তিনি নিজে তাহা গ্রহণ করিতেন। সেজন্য মাঝে মাঝে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। উন্নত যোগিগণ আধ্যাত্মিক উপায়ে অপরের পাপ বা রোগকে নিজ শরীরে গ্রহণ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ হন। এইভাবে যোগিগণ শিষ্যদের কর্ম্মফল প্রয়োজনবোধে খণ্ডন করিয়া থাকেন। মহাযোগিগণ যখন দেখেন যে তাঁহার কোন উন্নত শিষ্যের অতি দ্রুত আরও উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন কেবল তখনই তাঁহারা এইপ্রকার করিয়া থাকেন। ইহাতে যোগিদের সাময়িক কিছুটা ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন আধ্যাত্মিক ক্ষতি করিতে পারে না বরং উপকারই সাধিত হয়।

তাঁহার কোন কোন উন্নত শিষ্যদিগকে যে সব পত্র দিতেন তাহাতে এরকম কথা তিনি অনেকবার নিজেই লিখিয়াছেন। কখনও লিখিয়াছেন—**"আমি আর কত করিব। আমার লোকের জন্য অসুখ করিয়াছে, তাহার উপর সব কাজ আছে। ক্রিয়া করুন, ভয় নাই।"** আবার কাহাকেও লিখিয়াছেন—**"নিজের এই শরীরে তাঁহার কতক রোগ ভোগ করিয়াছিলাম। প্রদীপে তৈল না থাকিলে তাহার নির্ব্বাণলাভ হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দেহে কতক্ষণ জীবন থাকিতে পারে। আত্মার মৃত্যু নাই কারণ আত্মাই মহাকালস্বরূপ। স্থিতিপদ কালেরও উপরে। মহাকাল সমুদ্রস্বরূপ গতিহীন, জীব নদীর ন্যায় সেই সমুদ্রে পড়ে। কালে সতর্ক থাকিলে মৃত্যু ঘটে না।"** আবার কোন শিষ্যকে লিখিয়াছেন—**"অকালমৃত্যু বলিয়া শোক করিও না, জীবের পক্ষে কালাকাল মনে হয়, কালের অকাল নাই, এজন্য জীবের কর্তব্য সমস্ত কালেই কালরূপী হংসের[১] শরণাপন্ন হইয়া থাকা।"**

(১) **শ্বাস-প্রশ্বাসই কালরূপী হংস। তাহার শরণাপন্ন হইলে কালাতীত অবস্থায় যাওয়া যায়।**

মহান্ যোগিগণ তাঁহাদের অনুগত শিষ্যের উপকারার্থে অনেক সময় তাহাদের রোগ নিজ শরীরে টানিয়া লইয়া অনুগতকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা বলিতে হইবে। যোগিরাজকেও এইভাবে ভক্তের উপকারার্থে বহুবার করিতে দেখা গিয়াছে। তাই তিনি বলিতেন অনন্ত মহাকাল যাহা অবিচ্ছেদ্যভাবে চলিয়াছে তাহা অখণ্ড। কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের টানাফেলার মাধ্যমে সেই অখণ্ড কালকে খণ্ড বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা খণ্ড নহে। সেই মহাকাল ঘটস্থ হইয়া অর্থাৎ দেহস্থ হইয়া হংসরূপে (শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে) জীবদেহে বিরাজমান। তাই তিনি সকলকে বলিতেন সেই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ হংসের শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আর কালাকাল থাকে না অর্থাৎ মৃত্যু থাকে না।

কাশী হইতে দূরে থাকিতেন যে সব ভক্তশিষ্যরা তাঁহাদের মধ্যে উৎসুক অনেক শিষ্য মাঝে মাঝে কাশী আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুমতি চাহিয়া পত্র দিলে যোগিরাজ উত্তরে অনেককেই লিখিয়াছেন—"তোমাদের কূটস্থের মধ্যেই যখন আমি সর্ব্বদা আছি, তখন এই হাড়মাংসের দেহটাকে দেখতে আসার কোন্ প্রয়োজন"? এরকম বহু পত্রের মধ্যে দেখা যায় কাহাকেও লিখিয়াছেন—"দেখা করার জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমার এই হাড়-মাস দেখিয়া লাভ কি? কূটস্থে লক্ষ্য রাখুন, তাহাই আমার রূপ, আমি হাড়মাস বা 'আমি' এই শব্দও আমি নহি, আমি সকলের দাস।" কাহাকেও লিখিয়াছেন—"গুরু সব চালাইতেছেন। আমি কূটস্থরূপে সর্ব্বদা সঙ্গে আছি।"[১] অপর এক শিষ্যকে লিখিয়াছেন—"মায়া কর্তৃক হাড়মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাল মন্দ তথায় নাই। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা গুরুকে অর্পণ করা চাই। অর্পণ হইলে তাহাতে আর স্বত্ব থাকে না। যখন দেহ অর্পণ করেছেন তখন নিজের দেহ দেখলেই ত আমাকেই স্থূলেতে দেখা হয়। এইরূপ ভাবে আমার দেহ সব। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন।"

ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন—"যোগী হইতে গিয়া এত দুর্ব্বল হৃদয় কেন? গাছতলা ত কেহ লয় নাই, নদীর জল ত কেহ লইবে না। অনিত্য বিষয়ের জন্য এত ভাবনা কেন? আপনার কর্ত্তব্য ভবিষ্যৎ ও

(১) বিভিন্ন ভক্তকে লেখা পত্র হইতে তাঁহার এই উক্তিগুলি অবিকল তুলিয়া দেওয়া হইল। অনুচিত ভাবিয়া ভক্তদের নাম প্রকাশ করা হইল না।

অতীতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের চিন্তার সহিত বর্ত্তমানের সমস্ত কার্য্য করা। অর্থে সুখ কাহারও হয় নাই, হইবেও না। মনের কর্‌করানিতে অর্থের চেষ্টা। এত ভবিষ্যতের ভাবনা কেন? সব পুতুল নাচের পুতুল, হায়রে পয়সারে এই বোল্ নিয়ে সবাই চিঁ চিঁ করছে। জগৎ পরীক্ষার স্থল। সকল দিকেই দক্ষ হওয়া চাই, কোন বিষয়েই অভাব বোধ করা চাহি না। এক্ষণে মনের বল যাহাতে না কমে তাহা করা চাহি, বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, কোন বিষয়ে ভীত হওয়া চাহি না। শয়তান সর্ব্বত্র মনের মধ্যে ঘেরিয়া আছে, আত্মা ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে মন না যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। ক্রিয়ার অভ্যাসই বেদপাঠ। এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে করিতে যখন ক্রিয়ার অতীত অবস্থায় লক্ষ্য হইবে, তাহাই বেদান্ত দর্শন।[১] তাহা ক্রিয়া করিয়া দেখা উচিত। পুস্তক দেখিয়া কি হইবে? ক্রিয়াই যজ্ঞ। ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। এই যজ্ঞ সকলের করা উচিত। মনের ত্রাণ অবস্থার নাম মন্ত্র। কেহই ম্লেচ্ছ নহে, মনই ম্লেচ্ছ। নারায়ণ সকল ঘটেই বিরাজ করিতেছেন। কেহই কিছু করে না, সমস্তই ভগবান করেন, জীব উপলক্ষ্য মাত্র। সেই গুরু-ভগবানে লক্ষ্য রাখিতে বিধি-পূর্ব্বক চেষ্টা করুন, ইহাতেই মঙ্গল। আত্মাই গুরু। মনের এই প্রকার বল লইয়া ক্রিয়া করিতে হইবে—আমি কাহারও নহি, কেহ আমার নহে। একদিন নিশ্চয় সকলকে সব ছাড়িতে হইবে। সেদিন যে কাহার কবে হবে নিশ্চয় নাই। লোকে নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু সে অবস্থা যখন হঠাৎ আসে তখন সব হায় হায় করে। অতএব লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলকার সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বস্তুতঃ তাঁহার জন্য প্রাণ না কাঁদিলে তাঁহাকে অন্তরে ডাকিবার শক্তি হয় না। অব্যয় অবিনাশী গুরুই (আত্মা) অহৈতুকী প্রেমের উদাহরণ। তিনি অতি নিকটে সর্ব্বদা সকলের কাছে আছেন, ইহাতেও কেহ তাঁহার অন্বেষণে যত্নবান্ নহে। ভাল যে কি তাহা জীব জানে না, জানিলেই ত শিব হল। ভাল কি তাহা না জানায় সময়ে ভালকে মন্দ বলিয়া মনে করে। ক্রিয়ার পরাবস্থার পর যে অবস্থায় (কর্ম্মের অতীত অবস্থায়) শ্বাস টানা ফেলার ইচ্ছা স্বতঃ থাকে না তাহাতে মন রাখা চাই। উক্ত অবস্থাই

(১) বেদ অর্থাৎ জ্ঞান। যিনি কূটস্থকে জানিয়াছেন তিনিই বেদজ্ঞ। জ্ঞানের অন্ত অবস্থাই বেদান্ত। তখন কোন প্রকার ক্রিয়া বা কর্ম্ম না থাকায় তাহাই কর্ম্মের অতীতাবস্থা, তাহাই বেদান্ত। তখন জ্ঞানও নাই অজ্ঞানও নাই। শ্বাসই বেদমাতা গায়ত্রী।

কৃষ্ণপদবাচ্য। কৃষ্ণ শব্দের অর্থও তাহাই।[১] শ্বাসের টানাফেলার নিবৃত্তির অবস্থা যাহা স্বতঃ হইয়া থাকে তাহাই স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ। যাহারা গোপনে সাধন করে তাহারাই গোপী। গোপী শব্দের অর্থও ঐ।[২] গোপীর নিজ শরীররূপ বৃন্দাবনে এই জীবনকৃষ্ণের প্রকাশরূপ আগমন প্রতীক্ষা সর্ব্বদা করিয়া থাকে। গুরুকৃপা চাহিতে হয় না, তাহা গুরুর আজ্ঞামতে কার্য্য করিলে আপনা আপনি না চাহিতে পাইয়া থাকে। অতএব গুরুবাক্য দৃঢ় করিয়া গুরুর উপদেশ মত নিজ স্থিরপ্রাণে ভগবান বোধ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে একদিন তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা অতীব নিশ্চয়। মনের জোর না থাকিলে যে স্থানে থাকিলে মনের বল হয় সেই স্থানে থাকা উচিত এবং সেই স্থানে থাকিয়া ক্রিয়া করা উচিত। ভয়ের সহিত ক্রিয়া করিলে ক্রিয়া করা হয় না এবং সেই ক্রিয়া দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা যায় না। ক্রিয়া করিলেই নিজেকে রক্ষা করা যায়। ক্রিয়াবানকে খাওয়াইবে। ক্রিয়াবানকে খাওয়াইলেই সকল দেব-দেবীকে খাওয়ানো হয়। ক্রিয়াবানই দেবতা, সকল দেবতা এই ক্রিয়াই করিতেছেন। এই দেহেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া করা চাই, তবেই গুরুকৃপায় যাহা প্রার্থনীয় তাহা ঘটে। যাহারা বলে কেবল সুখ ও দীর্ঘায়ু চাই, মুক্তি চাই না, তাদের সব ফাঁকিবাজী। তারা আশীর্ব্বাদ চায় ইহা কিন্তু হইবার নহে।

অনেক সময় তিনি নানাভাবে নির্দ্দিষ্ট ভক্তদের আকর্ষণ করিয়া আনিতেন। তাহাদের পার্থিব ও পারমার্থিক উভয় ভারই অনেক সময় গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদের সাধন জীবনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিতেন।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী—সুন্দর। শ=শ্বাস, প্রাণবায়ু; র=বহ্নিবীজ—তেজস্তত্ত্ব (যাহা চক্ষুতে আছে); ঈ=শক্তি। অর্থাৎ শক্তিপূর্ব্বক প্রাণকর্ম্মের দ্বারা চক্ষুতে বায়ু স্থির হইলে চক্ষুর যে স্পন্দনরহিত (দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্—ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র) অবস্থা হয় সেই সুন্দর অবস্থার নাম শ্রী। কৃষ্ণ—কৃ ধাতু কর্ষণ করা, ণ—নিবৃত্তিবাচক। অর্থাৎ এই দেহরূপ ক্ষেত্রকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা কর্ষণ করিতে করিতে যে স্পন্দনরহিত নিবৃত্তিরূপ শাশ্বত স্থিরত্বপদ লাভ হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী, সকল দেহেই বর্ত্তমান।

(২) তাই তিনি সকলকে হৈ চৈ না করিয়া গোপীভাবে অর্থাৎ গোপনে আত্ম-সাধন করিতে বলিতেন। মহাত্মা রামপ্রসাদও তাহাই বলিয়াছেন—"জাঁক জমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে, লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা জানবে নাকো জগৎজনে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে এই জাঁকজমকই সর্ব্বস্ব।

ভক্তদের তিনি শিখাইতেন কেমন করিয়া আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া জীবনে আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটাইতে হয়। তাঁহার করুণাধারা অনেক সময় স্নেহ-ভালবাসার মধ্য দিয়া অথবা কোন অলৌকিক দর্শনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। তাঁহার এইসব অলৌকিক করুণালীলা দেখিয়া ভক্তদের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। তিনি ছিলেন সকলের প্রকৃত কল্যাণকামী ও পথপ্রদর্শক। তাই তিনি সর্ব্বদা ভক্তদের ঈশ্বর কথা ও গভীর যোগসাধনতত্ত্ব সকল সহজ সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদে মানুষ প্রকৃত কল্যাণ পথের সন্ধান পাইত। বাস্তব জীবনের কত সমস্যা লইয়া অথবা অধ্যাত্মজীবনের পথ পাইবার আশায় কত মানুষ তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত এবং তিনিও সদাই তাহাদের প্রকৃত কল্যাণপথের দিক্-নির্ণয় করিয়া দিতেন। ভক্তদের সকল কর্ম্ম, আচরণ ও চিন্তার সহিত তিনি একীভূত হইয়া তাহাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন।

তাঁহার এই অলৌকিক করুণালীলা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন—**"সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে তোমরা যদি আমার শরণাপন্ন হও, তাহলে যত দূরেই আমি থাকি না কেন উপস্থিত না হয়ে উপায় কি? ক্রিয়া যে করে আমি তার কাছে উপস্থিত থাকি।"**

তিনি বলিতেন সকলে যখন মন্দিরে যায় তখন কি কেবল মন্দিরকে কেহ প্রণাম করে, না কি ঐ মন্দিরের ভিতর যে অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী আছেন তাঁহাকে প্রণাম করে? দেব-দেবী ব্যতীত মন্দিরের কোন মূল্য নাই। আবার ঈশ্বর ত সব জায়গাতেই আছেন, অতএব ঐ বিগ্রহের মধ্যেও আছেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি তোমার ভিতরেও আছেন ইহাও সত্য। বরং তোমার ভিতরে আছেন ইহা অধিকতর সত্য, কারণ তুমি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াও। তাহা হইলে দূরের বস্তুকে না খুঁজিয়া নিকটের বস্তুকে খোঁজাই ভাল। তিনি যখন তোমার ভিতরেও আছেন এবং উহা যখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, তখন সেই নিকটের বস্তুকে খোঁজাই ত বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—**"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।"**[১]

সকল ভূতে তিনি আছেন বটে কিন্তু হৃদয়দেশে তাঁহার অধিকতর অবস্থান। সেই হৃদয়ের মধ্যে ডুবিবার কথা রামপ্রসাদও বলিয়াছেন—"ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।" হৃদয়ের মধ্যে ডুবিতে পারিলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, বাহিরে নহে।

---

(১) গীতা ১৮।৬১

তিনি বলিতেন নারী সৌন্দর্য্যসহ ঈশ্বরের রচিত সকল সৌন্দর্য্যের দিকে দেখিবার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি বা অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেই রূপ ও সৌন্দর্য্যের দিকে দেখিবার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখিতে হইবে উহার সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি, যিনি অপূর্ব্ব দক্ষতা ও শিল্প-চাতুর্য্যের দ্বারা তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সৃষ্টি কর্ত্তাকে ভুলিয়া কেবল মাত্র তাঁহার রচিত সৌন্দর্য্যকে দেখিলে চলিবে না। তাঁহার রচিত সৌন্দর্য্য যদি এত সুন্দর হয়, তাহা হইলে তিনি নিজে কত সুন্দর? এইভাবে সকল সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি কর্ত্তাকে দেখিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু মনে রাখিও বিনা সাধনায় ঐ প্রকার স্বচ্ছ দৃষ্টি কাহারও আসিবে না। ইহা কথার কথা নহে। মনের দ্বারা যতই চেষ্টা কর স্থায়ী ভাব আসিবে না। কিন্তু যতই প্রাণকর্ম্ম করিবে ততই মন স্থির হইবে এবং যতই মন স্থির হইবে ততই ঐ প্রকার স্বচ্ছ দৃষ্টি আসিবে। তখন সকল রূপ ও সৌন্দর্য্যের মাঝে তাঁহাকেই দেখিবে।

* * * *

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের বাহ্য পূজার প্রয়োজন হয় না। যোগিরাজ নিজেও তাহা কখনও করেন নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজা অধমাধমঃ॥"[১]

অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থান করা উত্তম, ধ্যান মধ্যম, স্তুতিজপ অধমভাব এবং বাহ্যপূজা বা স্থূল পূজা অতি অধম।

তাই বলিয়া তিনি কখনও সাকার পূজা করিতে কাহাকেও নিষেধ করেন নাই। বরং বলিতেন সাধারণের পক্ষে সাকার পূজা বা স্থূল পূজা অবশ্য করণীয়। সাকার পূজা করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার উৎকর্ষ হয় এবং কালে যখন আত্মসাধনা পাইবে তখন তাহার বাহ্যপূজা না করিলেও চলিবে। সকল প্রতিমাই প্রাণরূপী ঈশ্বরের প্রতীক। ঋষিরা ধ্যানের মাধ্যমে যে সব রূপ দর্শন করিয়াছেন সেই সব রূপগুলিকেই প্রতিমাকারে স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক পূজা করিতে

(১) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সাধারণ মানুষ আত্মকর্ম্ম জানে না, সেকারণে তাহারা অন্তশ্চক্ষুতে ঐ রূপগুলির দর্শন লাভ করিতে পারে না। সবকিছুরই দুইটি দিক্ আছে। একটি বহিরঙ্গ, অপরটি অন্তরঙ্গ। সাধনক্ষেত্রেও এই দুইটি আছে। মূর্ত্তি পূজা, তীর্থ ভ্রমণ, ব্রত, উপবাস, গঙ্গাস্নান, জপ, সংকীর্ত্তন. স্তুতি, অতিথি সেবা, দরিদ্রসেবা, সাধুসেবা ইত্যাদি সবই সাধনার বহিরঙ্গ মাত্র। একমাত্র আত্মকর্ম্মই অন্তরঙ্গ সাধনা। চাকুরিক্ষেত্রে যেমন উন্নতি আছে, তেমনি জীবেরও উন্নতি আছে। দয়ার্দ্রহৃদয় ঋষিরা বহিরঙ্গ সাধনার প্রচলন এই জন্যই করিয়াছেন যে সকল মানুষের অন্তর্লক্ষ্য নাই। সকল মানুষ ঈশ্বরকে পাইতে চাহে না। তাহারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য পাইলেই খুশী হয়। ঐশ্বর্য্যকেই ঈশ্বর ভাবিয়া থাকে। এই প্রকার মানুষই অধিক। ইহাদের জন্যই ঋষিরা বহিরঙ্গ সাধনার প্রচলন করিয়াছেন। এই প্রকারে বহিরঙ্গ সাধনা করিতে করিতে জন্মান্তরে জীব শুদ্ধ হইবে এবং সাধনার অন্তরঙ্গে লক্ষ্য পড়িবে, তখনই তাহারা অন্তরঙ্গ সাধনা পাইবার উপযুক্ততা লাভ করিবে এবং অন্তরঙ্গ সাধনা করিয়া আত্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে।

যথাগাধনিধের্লব্ধৌ নোপায়ঃ খননং বিনা।
মল্লাভেঽপি তথা স্বত্মচিন্তাং মুক্ত্বা ন চাপরঃ॥[১]

অর্থাৎ অগাধ রত্নের খনি দৃষ্টিগোচর হইলেও সেই রত্নপ্রাপ্তির জন্য খনন করা ছাড়া যেমন আর উপায় নাই, তেমনি আত্মচিন্তা অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম ব্যতিরেকে আমাকে (আত্মাকে) সাক্ষাৎ করিবার আর উপায়ান্তর নাই।

বহিরঙ্গ সাধনায় অভিক্রম দোষ আছে। কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধনায় কোন অভিক্রম দোষ নাই। যেমন বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত কোন দেব-দেবী পূজা করিতে হইলে প্রথমে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। অশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া কোন দেব-দেবী স্পর্শ করা চলিবে না। করিলে পাপ হইবে। ফুল, গঙ্গাজল, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন। কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধনায় এসব কিছুরই প্রয়োজন নাই। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান না করিলেও দোষ নাই। বাহিরের কোন উপচার প্রয়োজন নাই। কেবল মন ও প্রাণকে লইয়াই অন্তরঙ্গ সাধনা করিতে হয়। এই দুইটি বস্তু সকলেরই আছে। তাই প্রাণকর্ম্মই অন্তরঙ্গ সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভগবান

(১) পঞ্চদশী ৭।১৫৩

বলিয়াছেন—"**নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।**"[১] অর্থাৎ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের (প্রাণকর্ম্মের) কোন অভিক্রমদোষ নাই। কারণ ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম হওয়ায় ইহাতে কোন কামনা নাই। ইহা স্বতঃই চলিতেছে, আপনা আপনিই চলিতেছে, ইহার নূতন কোন আরম্ভ নাই। জন্মের সহিত ইহা পাওয়া যায়।

গঙ্গাস্নান বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত। আপামর জনসাধারণ গঙ্গাস্নান করিতে পারেন, ইহাতে কোন বাধা নাই। স্রোতস্বিনী গঙ্গায় স্নান করিলে স্বাস্থ্যের যাহা উন্নতি হইবার তাহা সকলেরই হইবে। কিন্তু কেহ যদি গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ভক্তি সহকারে গঙ্গাস্নান করেন; তবে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতির সহিত কিছু ভক্তিরও উৎকর্ষ হইবে। ইহা তাঁহার অতিরিক্ত লাভ হইবে। এর বেশী কিছু হইবে না। কেহ যদি গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শন চান তবে তিনি ধ্যানের দ্বারা তাহা পাইবেন। কিন্তু কেহ যদি এই মনুষ্য জীবনকে সফল করিবার মানসে কৃতকৃতার্থ হইতে চান তবে তাঁহাকে নিজ দেহের অভ্যন্তরস্থ ত্রিবেণীতে অবশ্যই স্নান করিতে হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য শরীরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক তিন নাড়ী আছে। উহারা যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিত।

> **ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গল যমুনা নদী।**
> **ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী ॥**
> **ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।**
> **তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥**[২]

অর্থাৎ ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী এবং ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নাড়ীই সরস্বতী নদী। আজ্ঞাচক্রে এই তিন নাড়ীর মিলন স্থান বলিয়া সেই স্থানটিকে তীর্থরাজ ত্রিবেণী-প্রয়াগ বলা হয়। যদি কেহ ঐ আজ্ঞা-চক্রস্থ তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করিতে পারে অর্থাৎ সেখানে সহস্রার হইতে

---

(১) গীতা ২।৪০, ইহ—এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে (প্রাণকর্ম্মে), অভিক্রমনাশঃ—প্রারম্ভস্য নাশঃ—প্রারম্ভের বিফলতা, ন অস্তি—নাই, প্রত্যবায়ঃ—প্রত্যবায় বা পাপ বা বিঘ্ন, ন বিদ্যতে—হয় না।

(২) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ক্ষরিত অমৃতের সহস্রধারায় অবগাহন করিতে পারে তবেই সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু সেখানে স্নান করিবে কি করিয়া?

মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনম্
বায়ুঃস্থিরো যস্য বিনা নিরোধম্ ॥
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্।
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী ॥[১]

অর্থাৎ বিনাঅবলম্বনে মন স্থির করিয়া, অবরোধ বিনা শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্থির করিয়া এবং বিনা অবলম্বনে অর্থাৎ মনের দ্বারায় বা কল্পনার দ্বারায় কোন কিছু না দেখিয়া কূটস্থে দৃষ্টি স্থির করিয়া সেই তীর্থরাজে স্নান করিতে হয় এবং তাহাকেই খেচরীতে অবস্থান বলে। ইহাকেই ভগবান্ বলিয়াছেন **'মন্মনা'**[২] অর্থাৎ আমাতে (আত্মাতে) মন রাখ, নিমগ্নচিত্ত হও। অর্থাৎ চঞ্চল মনই জীবের বর্ত্তমান মন। বর্ত্তমান মনই জীবকে সকল কর্ম্ম করায়। সেই বর্ত্তমান মনকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা স্থির করিতে পারিলে বর্ত্তমান চঞ্চল মনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া উহা স্থির মনে পর্য্যবসিত হইবে, তখনই মনেতে মন অবস্থান করিবে। সেইরূপ মনেতে মন যখন অবস্থান করিবে তখনই তুমি আমার (আত্মার) প্রকৃত ভক্ত হইবে এবং মদযজনশীল হইয়া অর্থাৎ আমারই যজ্ঞের (আত্মকর্ম্মের বা আত্মযজ্ঞের) উপাসক হইয়া আমাকেই (আত্মাকেই) নমস্কার করিবে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে নমস্কার করিবে বা নিজেই নিজেকে জানিবে। তাই প্রহ্লাদের যখন ভগবদ্ দর্শন হয়, তখন তিনি তাঁহার আরাধ্যদেবকে **"নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ"**[৩] বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

বাহিরের গঙ্গায় দেহকে ডুবাইয়া স্নান করা যায়, কিন্তু আন্তর গঙ্গায় দেহকে ডুবান যায় না। সেখানে মন ও প্রাণকে ডুবাইতে হয়। এইভাবে মন ও প্রাণকে ডুবাইয়া কূটস্থরূপিনী ত্রিবেণীতে স্নান করাইতে পারিলেই জীবন ধন্য হয়, ভবরোগ দূরীভূত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ চলিয়া যায়। কেমন করিয়া সেই আজ্ঞাচক্রস্থ তীর্থরাজ প্রয়াগে মন ও প্রাণকে ডুবাইয়া

(১) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।
(২) 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'—গীতা ১৮।৬৫
(৩) বিষ্ণুপুরাণ।

স্নান করিতে হয় তাহার উপায় যোগিরাজ তাঁহার ক্রিয়াযোগ সাধনায় বলিয়াছেন। ইহাই অন্তরঙ্গ সাধনা। ইহাই মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য।

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ॥[১]

অর্থাৎ আন্তর সাধনার দ্বারা যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্থৈর্য্যলাভ হইয়াছে তাঁহার বাহ্য গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্রে স্নানের প্রয়োজন নাই।

যোগিরাজ প্রদর্শিত এই সাধনপথকে শাস্ত্রমতে বলা হয় আত্মবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। কিন্তু তিনি নিজে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন "**ক্রিয়াযোগ**" বা সংক্ষেপে "ক্রিয়া"। এই ক্রিয়াযোগ ন্যায়শাস্ত্র (logical) ও বিজ্ঞান সম্মত (scientific)। ইহা যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত তাহার কারণ যোগিরাজ ইহাকে অঙ্কের মত নির্ভুল বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন ভক্তি না হইলে ঈশ্বরসাধন হয় না ঠিক, কিন্তু তেমন ভক্তি কয়জনের আছে? তেমন ভক্তি প্রথমে আসে না। অতএব যাহাদের ভক্তির অভাব আছে বা নাই তাহারা কি প্রকারে সাধন করিবে? তাহাদের সাধনে ইচ্ছা জাগে না। তাহাদের ভক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। যেমন অরুচি থাকিলে খাদ্য খাইতে ভাল লাগে না, কিন্তু খাইলেই যেমন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তেমনি ক্রিয়া করিতে ভাল লাগুক বা নাই লাগুক ক্রিয়া করিলে আত্মসাক্ষাৎকার অবশ্যই হইবে। তখন সঠিক ভক্তি আপনা হইতেই আসিবে। প্রথম প্রথম অনভ্যাসের জন্য সঠিক হইবে না বা ভাল লাগিবে না সত্য, কিন্তু ক্রিয়া নিয়মিত অভ্যাস করিলে নিশ্চয় ভাল লাগিবে। ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম। গীতার কর্ম্মযোগকেই তিনি ক্রিয়াযোগ আখ্যা দিয়াছিলেন। কর্ম্ম ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না, তাই গীতায় কর্ম্মযোগের এত প্রাধান্য দেখা যায়। পাতঞ্জল যোগদর্শন সহ শাস্ত্রের বহু স্থানেই এই ক্রিয়াযোগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ।
সহি ক্রিয়াযোগঃ সমাধি ভাবনার্থ ক্লেশতনুকরনার্থশ্চ॥[২]

তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানাদিই ক্রিয়াযোগ। এই ক্রিয়াযোগ সমাধির অনুষ্ঠান ও ক্লেশনাশাকরনার্থ। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা সমাধির অনুষ্ঠান

(১) মনুরহস্য ৮।৯২
(২) পাতঞ্জল যোগসূত্র সাধনপাদ ১, ২

করিতে করিতে শরীরের ও মনের ক্লেশের লাঘব হয়, ক্রমে প্রকৃষ্টরূপে নাদ শুনিতে পাওয়ায় মনে কোনরূপ কল্পনা হয় না। পরে সত্ত্বপুরুষ লাভ হওয়ায় সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা হয়। তাই যোগিরাজ বলিতেন—**"শরীরের কষ্ট হলেই বুঝবে সাধনা ঠিক হচ্ছে না।"** ইহাই সেই অমর যোগ যাহা পুরাকালে সকল ঋষিগণ করিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বেও ইহা ছিল, আজও আছে, চিরকাল থাকিবে, তাই ইহা অমর যোগ। কাল প্রভাবে মাঝে মাঝে ইহা মলিন হয়, তখনই কোন মহামানব আবির্ভূত হইয়া পুনঃস্থাপনা করেন। একবার এই অমরযোগ লুপ্তপ্রায় হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাধ্যমে মনুষ্য সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। তারপর দীর্ঘ দিনের অবহেলায় এই মহান্ অমর যোগের অনুশীলনের অবসাদ ঘটে। তখনই কৃষ্ণ সদৃশ বাবাজী মহারাজ অর্জ্জুন সদৃশ শ্যামাচরণের মাধ্যমে ইহা পুনরায় মনুষ্য সমাজে সহজ লভ্য করিলেন। **"জো কিস্নুন সো বুড়ুয়া বাবা"** —যিনি কৃষ্ণ তিনিই বুড়ুয়া বাবা অর্থাৎ বাবাজী। যোগিরাজের এই উক্তিতে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও লিখিয়াছেন—**"বাবাজীকে রূপ, এহি জম ও ধর্ম্ম"**। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহার গুরু কেবলমাত্র মহান্ যোগীই ছিলেন না, পরন্তু তিনি স্বয়ংই যম ও ধর্ম্ম। তাই ভগবান্ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি আসিবে অর্থাৎ এই মহান্ অমর যোগ অবহেলার জন্য লুপ্তপ্রায় হইবে তখনই তিনি কোন মহামানবরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনঃস্থাপনা করিবেন। এই উদ্দেশ্যেই শ্যামাচরণের আবির্ভাব।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥১

এই ক্রিয়াযোগই সেই সহজ কর্ম্ম বা প্রাণকর্ম্ম যাহা সহজাত। প্রথম প্রথম অনভ্যাসের দরুন দোষযুক্ত হইলেও উহা ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ সকল কর্ম্মই আরম্ভমুখে ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষযুক্ত থাকে। তাই যোগিরাজের মুখে একটি কথা প্রায়ই শোনা যাইত। তিনি প্রায় সকলকেই বলিতেন—**"বনত বনত বন্ যায়।"** অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম নিয়মিত অভ্যাস করিতে থাকিলে একদিন সকল কর্ম্মের অতীতে পৌঁছিয়া যাইবে, লক্ষ্যস্থলে

(১) গীতা ১৮।৪৮

বা উৎসস্থলে পৌঁছিয়া যাইবে, আর তখনই তোমার পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হইবে, নিজেকে নিজে জানিতে পারিবে।

যোগিরাজ প্রদর্শিত এই প্রাণকর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্যগোচরঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্য সারোহি পাপরাশিতুলানলঃ॥
মহাপাতক কোটীনাং তৎ কোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতাম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং নানাদুষ্কর্ম্মপাতকম্॥
নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ সোঽভ্যাসযোগতঃ॥[১]

প্রাণায়াম মহাধর্ম্ম যাহা বেদেরও অগোচর, সকল পুণ্যের সার এবং সকল পাপ বিনাশক ; ইহার দ্বারা কোটি কোটি দুষ্কর্ম্ম এবং পূর্ব্বজন্মের সকল পাপ ধ্বংস হয়। যিনি এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন তিনি ধন্য হন।

এই প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে যোগশাস্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন— **"আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ।"** যিনি প্রাণায়াম করেন তিনি আনন্দে বা সুখে এই ভবসংসারে বাস করেন।

কিন্তু ইহা নাক টিপিয়া প্রাণায়াম নহে (গুরুবক্ত্রগম্য)। কারণ উহাতে জোর করিয়া বায়ুরোধ করিয়া প্রকৃতি বা স্বভাবের বিরুদ্ধে কুম্ভক করিতে হয়, তাহাতে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে। **"বালবুদ্ধিভিরঙ্গুলাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাচ্ছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈস্ত্যাজ্যঃ।"[২]** অর্থাৎ স্বল্পবুদ্ধি লোকে অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকাছিদ্র রোধ করিয়া যে প্রাণায়াম করিয়া থাকে তাহা শিষ্টজনের পরিত্যাজ্য।

যোগিরাজ বলিয়াছেন এক আর একে যেমন দুই হয় ইহা নিশ্চয় সত্য, তেমনি ১২টি উত্তম প্রাণায়ামে প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহার, ১৪৪টি উত্তম প্রাণায়ামে ধারণা অর্থাৎ আত্মবিষয়ক ধারণা। ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে মন সম্যকরূপে প্রত্যাহৃত হইলেই আত্মবিষয়ক ধারণা জন্মে। ১৭২৮টি উত্তম প্রাণায়ামে ধ্যান অর্থাৎ আত্মবিষয়ে স্থির লক্ষ্য এবং ২০৭৩৬টি উত্তম প্রাণায়ামে সমাধি হইবে, ইহাও তেমনি নিশ্চয় সত্য।

প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহার প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রত্যাহারদ্বিষট্‌কেন জায়তে ধারণা শুভা॥
ধারণাদ্বাদশ প্রোক্তা ধ্যানং ধ্যানবিশারদৈঃ।
ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিধীয়তে॥[৩]

---

(১) রুদ্রযামল ১৫শ পটল।
(২) ঋগ্‌বেদভাষ্য।
(৩) গোরক্ষসংহিতা প্রথম।

খাদ্য যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির কারক, তেমনি ক্রিয়াযোগ ঈশ্বর প্রাপ্তির কারক। এমন নির্ভুল অঙ্কের মত বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধন পথ তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা জানা যায় না। ইহাও তাঁহার প্রদর্শিত সাধন পথের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

(যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগসাধন যে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে তিনি আরও হিসাব দিয়া বলিয়াছেন যে সাধারণে চব্বিশ ঘণ্টায় ২১৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। উহাই জীবের আয়ু। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে সকলে ১৫টি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। এই প্রকারে জীবের আয়ুক্ষয় হইতেছে। যখনই শ্বাসের পুঁজি শেষ হয় তখনই জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু একটি প্রাণায়ামে সময় লাগে ৪৪ সেকেণ্ড। এই হিসাবে যোগী ২৪ ঘণ্টায় প্রাণায়াম করেন ১৯৬৪টি অর্থাৎ দুই হাজারটি। অর্থাৎ যোগী ২৪ ঘণ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করেন মাত্র দুই হাজার, কিন্তু সাধারণ মানুষ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করেন ২১৬০০ বার। প্রাণায়াম করিতে করিতে যোগী যখন নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন প্রকার গতি থাকে না। তাই তিনি বলিতেন—**'যখন ছয় চক্রেতে মন না দিয়া আপনা আপনি ক্রিয়া হইবে তখনই সবকিছু বলিতে পারিবে'** অর্থাৎ তেমন ব্যক্তি যাহা বলিবেন তাহাই সত্য হইবে, কারণ তখন তিনি যুক্ততম অবস্থা লাভ করিবেন। এ বিষয়ে তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ—**"২১৬০০ স্বাসকো রোকে। ১০০ দিন রোকে তো যো ইচ্ছা করে সিদ্ধ হোয়—তব যত্তা রোজ চাহে জিএ।"** অর্থাৎ এই প্রকার কুম্ভক হইলে যোগীর ইচ্ছা-মৃত্যু অবস্থা লাভ হয়। **"পুরক রেচক ছুটে তব কেবল কুম্ভক বাহলাওএ"**—অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের টানা ও ফেলা থাকিবে না, নিশ্চল হইয়া যাইবে, তখনই কেবল-কুম্ভকরূপ আনন্দ অবস্থা হইবে) ভগবান্ বলিয়াছেন—

'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।'[১]

অর্থাৎ আত্মাতে অযুক্ত ব্যক্তির আত্মবিষয়ক বুদ্ধি নাই এবং আত্মবিষয়ে অযুক্ত থাকায় প্রকৃত ধ্যানও হয় না। কারণ জীবের বর্ত্তমানের যে অযুক্ত বুদ্ধি অর্থাৎ চঞ্চল বুদ্ধি তাহা মিথ্যা। অতএব এই চঞ্চল অবস্থা হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তাহাও মিথ্যা। শ্বাস-প্রশ্বাসই যখন জীবের আয়ু তখন সহজেই বোঝা যায় যে যোগী প্রাণকর্ম্মের দ্বারা উহার ব্যয় কম করিয়া স্বেচ্ছায় পরমায়ু

(১) গীতা ২।৬৬

বাড়াইতে সক্ষম হন, এবং এই প্রকারেই মৃত্যুকে তিনি করতলগত করিতেও সক্ষম হন। যিনি যত বেশী প্রাণায়াম করিবেন তিনি তত বেশী পরমায়ু ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইবেন। তাই সমাধি অবস্থা অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থাও মৃত্যু পদবাচ্য। কারণ তখন শ্বাস নাই। শ্বাস না থাকায় মৃত্যু।

এই ক্রিয়াযোগরূপ শ্বাস-ক্রিয়া একটি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। বেদ, উপনিষদ্, গীতা ও তন্ত্রযোগ শাস্ত্রের প্রায় প্রতি পংক্তিতে ইহার রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হইয়াছে। যজ্ঞ, নিত্য পূজা ও সকল প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যেও এই যোগের প্রতীক লক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে প্রতীকের আড়ালে যেমন দেব-দেবী ঢাকা পড়িয়াছে, তেমনি যজ্ঞ ও বাহ্য পূজার অন্তরালে প্রাণযজ্ঞ আবৃত হইয়া গিয়াছে। পুরাণেতিহাসিক দৃষ্টিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই যোগ দিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে বহু মহাত্মা এই যোগপথে সাধন করিয়া জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কপিল, রাজা জনক, ব্যাসদেব, শুকদেব, পতঞ্জলি, সক্রেটিস, যীশুখৃষ্ট, সেণ্ট জন, সেণ্ট পল, দাদুদয়াল, কবীর, রুহিদাস, নানক, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি বিখ্যাত। ভগবান্ বলিয়াছেন তাঁহার এক অতীত অবতারকালে এই মহান্ অক্ষয় যোগ প্রণালী তিনি সূর্য্যকে দিয়াছিলেন। সূর্য্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে দেন। এইরূপে রাজর্ষিগণ এই যোগ পরম্পরাপ্রাপ্ত জানিয়াছিলেন; কিন্তু কালবশে সেই যোগ নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ, তিনি এই অক্ষয় যোগ সূর্য্যকে দিয়াছিলেন—প্রাণই সূর্য্য (**আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ**); ইড়া ও পিঙ্গলাতে প্রাণের যে গতি চলিতেছে সেই পিঙ্গলা নাড়ীকেই সূর্য্যনাড়ী বলে, এবং ইড়ানাড়ীকে চন্দ্রনাড়ী বলে। তাই ঐ পিঙ্গলা নাড়ীস্থিত বায়ুরূপী প্রাণই সূর্য্য। তিনি সূর্য্যকে বলিলেন অর্থাৎ সেই অব্যক্ত অবস্থারূপ যে স্থিরপ্রাণ জীবনকৃষ্ণ তিনি চঞ্চল গতিরূপে সূর্য্যনাড়ীতে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলাবস্থারূপে প্রকাশিত হইলেন অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চঞ্চল প্রাণরূপ সূর্য্যনাড়ীতে যোগ ব্যক্তরূপ অবস্থা। সূর্য্য মনুকে বলিলেন। মনু অর্থাৎ মন। প্রাণ চঞ্চল হইলে মন উপাধি ধারণ করে, সেই মন উপাধিতে যোগের ব্যক্তভাব হইল। বায়ুর স্থিরাবস্থাই যোগযুক্ত অবস্থা। সেই স্থিরাবস্থা হইতে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া পিঙ্গলারূপ সূর্য্য ও মন উপাধিতে যোগের ব্যক্ত বা প্রকাশ অবস্থা আসিল। অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া পিঙ্গলারূপে সূর্য্যে, সূর্য্য হইতে মনে, মন হইতে ইক্ষ্বাকুকে অর্থাৎ নাসাস্থিত বহির্বায়ুতে এই মহান্ অক্ষয় যোগের ব্যক্তভাব হইল। চাতুর্ব্বর্ণ্যের চতুরা-

শ্রমিক ব্যবস্থায় যোগচর্য্যা ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তরে সর্ব্ববর্ণের মানুষের অবশ্য পালনীয় ছিল। রঘুবংশীয় নৃপতিগণ প্রায় সকলেই অন্তকালে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতেন। সেই পরম্পরা আমাদের দেশে অন্ততঃ মহাকবি কালিদাসের কাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে "যোগনান্তে তনুত্যজাম্" কথাটি হইতে এই তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে কাল প্রভাবে ইহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। শ্যামাচরণ এই মহান্ যোগসাধনকে কালের কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া এবং ইহার কঠোরতাগুলিকে সংস্কার করিয়া, বর্ত্তমান হীনবল মানবের পক্ষে উপযোগী করিয়া মানব সমাজে প্রচার করিলেন। সমগ্র মানব সমাজের কাছে এবং বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।

* * * *

(আত্মা আছেন বলিয়াই ক্ষিতি অপ তেজ মরুত ব্যোম দেখিতেছ। আত্মক্রিয়ার দ্বারায় মন কূটস্থ ব্রহ্মে তদ্রূপ স্থির হইলেই মুক্ত। অতএব মুক্ত হওয়া আর কিছুই নহে কেবল ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকা। এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে দেহ পৃথক থাকে। এইরূপে দেহকে যদি পৃথক করিয়া চিত্ত মন প্রভৃতি কূটস্থ ব্রহ্মে রাখ তাহা হইলে মনের দৌড়াদৌড়ি হইতে বিশ্রাম পাইবে এবং কেবল তখনই সুন্দর রূপ ব্রহ্মেতে থাকিবে। সুন্দর রূপ ব্রহ্মে থাকায় তুমিও থাকিলে না, তোমারও কিছু থাকিল না। অতএব অন্যদিকে মন আবদ্ধ হওয়া হইতে মুক্ত হইলে) প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি বিপ্রাদি বর্ণও নহ, কোন আশ্রমীও নহ, তোমার কোন আকারও নাই, তুমি এই চক্ষের গোচরও নহ, তোমার কোন ইচ্ছাও নাই; অতএব তুমি এই বিশ্বসংসারের সাক্ষীমাত্র হইয়া শূন্য ব্রহ্মে সর্ব্বদা থাক অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক, ইহাই তোমার একমাত্র কাজ। এই মহাশূন্য ক্ষণিকের জন্যও যাঁহার দর্শন হইয়াছে তাঁহার জীবন সার্থক। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ প্রভৃতি এ সব মনের কাজ, কিন্তু তোমার যে বিভু তাঁহার কিছুই নাই। তুমি কর্ত্তাও নহ ভোক্তাও নহ; কর্ত্তা এবং ভোক্তা মনের দ্বারা হইতেছে, সেই মন যখন ব্রহ্মে লীন হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় পাকাপাকি অবস্থান হইল তখন নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মুক্ত। সেই যে অবস্তুর বস্তু ব্রহ্ম তাহাই সর্ব্বত্র দেখিতেছ; কিন্তু দ্রষ্টা অর্থাৎ মন যতক্ষণ ব্রহ্ম হয় নাই ততক্ষণই দৃশ্য

দেখিতেছ। দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুই হওয়ায় অন্যত্রে মন থাকিল। এই প্রকারে মনের অর্থাৎ দ্রষ্টার বন্ধন হইতেছে এবং ইহাই তোমার বন্ধন অবস্থা। আমি কর্ত্তা হইয়া ব্রহ্ম দেখিতেছি অথবা সামনে তোমাকে দেখিতেছি; ইহাই অহং, এই অহংই তোমাকে দংশন করিতেছে, তাই তোমার এই সংসারের যত কিছু জ্বালা ও ছট্‌ফটানি হইতেছে। কোন প্রকারেই মনের শান্তি পাইতেছ না বলিয়াই উপদেশ প্রার্থনা করিতেছ। তাই বলিতেছি আমি কর্ত্তাও নহি, ভোক্তাও নহি, ক্রিয়ার পরঅবস্থায় থাকিলে এই বিশ্বাস আপনা আপনি হয়। এই বিশ্বাস স্বরূপ অমৃত পান করিয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে সর্ব্বদা থাক অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক। ইহাই মুক্তাবস্থা, আর ইহার বিপরীত বন্ধন অবস্থা।

এই বিশ্বসংসার নিজেরই মনের কল্পনা মাত্র, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। আবার যখন রজ্জুতে রজ্জু বোধ হইল তখন আনন্দ; তেমনি যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক তখন নিজ বোধ স্বরূপ তুমিই হইতেছ। সেই তুমি সাক্ষী স্বরূপ, বিভু ও পূর্ণ। পূর্ণ হইলেই এক হইল এবং এক হইলেই মুক্ত। তখন তুমি অক্রিয়, ইচ্ছা রহিত, স্পৃহা রহিত সুতরাং শান্ত, স্থির। কেবল ভ্রমেতেই সংসার বন্ধন হইতেছে। দেহরূপ অভিমানের পাশে চিরকাল বদ্ধ রহিয়াছ তাই 'আমি' এই বোধ হইতেছে। সেই বর্ত্তমান আমিকে ক্রিয়ারূপ খড়্গের দ্বারা ছেদন কর এবং ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন আমি থাকিবে না তখনই আমিত্ব যাইবে এবং ব্রহ্মে লীন হইয়া সুখী হইবে। তখন তুমি কিছুই করিবে না কারণ তখন কর্ম্ম থাকিবে না। তখন কোন প্রকার ইচ্ছাও থাকিবে না তন্নিমিত্ত নিঃসঙ্গ হইবে। ইহাই প্রকৃত নিঃসঙ্গ অবস্থা, কারণ তখন ইচ্ছা না থাকায় কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সঙ্গ নাই। তখন তুমিই স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন স্বরূপ হইতেছ। শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তুমিই হইতেছ, তুমি এত বড়লোক হইয়া ক্ষুদ্র চিত্ত হইও না। সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক যেখানে কোন বিষয় নাই, বিকার নাই, ভয় নাই এবং উহাই শীতল হইবার ও বিশ্রাম পাইবার স্থান হইতেছে। তাহার পূর্ব্বে 'আমি' এইরূপ জ্ঞান হওয়াতে জগৎ ভাসমান, কিন্তু যখন ক্রিয়ার পর অবস্থাতে 'আমি' নাই এইরূপ আত্মজ্ঞান হইল তখন আর জগৎ নাই। এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম আমি, তখন আমি আবার কাহাকে নমস্কার করিব? তখন আমি নিজেই নিজেকে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা নমস্কার করি, কারণ আমার বিনাশ নাই। অন্য কাহাকেও নমস্কার করিতে হইলে দুই হইল। আবার

যাহাকে নমস্কার করিব তাহার বিনাশ আছে, তাই আমি আমাকেই নমস্কার করি।)

আমি ভিন্ন অন্য হইলেই দ্বৈত। এই দ্বৈতই মহাদুঃখের মূল। ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত এই দুঃখের আর কোন ঔষধ নাই। দুই হইলেই কল্পনা আসিল। এই শরীর, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মোক্ষ, ভয়, কামনা, বাসনা সবই কল্পনা মাত্র। এই সব কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন এক হইল তখন ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই, বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই, তখন শান্ত স্বরূপ নিরাশ্রয় আমি হইতেছি। এই যে তুমি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, ইহাই তোমার বন্ধন। এই ইচ্ছা যখন নাই, তখন বন্ধন কোথায়? ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকা, যাহাকে জ্ঞান বলে, সেই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে অর্থাৎ আটকাইয়া রহিয়াছেন, সেই জ্ঞানই তাঁহার মিত্র স্বরূপ হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি আটকাইয়া থাকেন তাঁহার ইহলোকের ও পর-লোকের কোন ইচ্ছা থাকে না, তিনি কামনা রহিত হন। কিন্তু নিত্য ও অনিত্যের বোধ যাঁহার আছে তিনিই মোক্ষ কামনা করেন, ইহাও দ্বৈত। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ধীর ব্যক্তি থাকেন তিনি কিছুই করেন না, অথচ সবই করেন। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"পাঁচ দণ্ড রোধ হলে কর্ম্ম হবে।"** অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে অন্ততঃ পাঁচ দণ্ডের জন্যও প্রাণবায়ু রোধ হইলে অর্থাৎ পাঁচ দণ্ড কেবল-কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হইবে, তাহাই কর্ম্ম হইবে অর্থাৎ ঐ রোধ অবস্থায় না থাকাই অকর্ম্ম। এমন ধীর ব্যক্তি সদাই আত্মাতে স্থির হইয়া থাকেন। তাঁহার সন্তোষও নাই অসন্তোষও নাই, তাঁহার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই। তিনি কুবাক্য শ্রবণ করিয়াও কুপিত হন না, স্তুতিতেও হর্ষ প্রাপ্ত হন না। ইচ্ছা রহিত হইলে আশা থাকে না। আশা রহিত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকেন। এমন বক্তিকেই মহাত্মা বলে এবং এই প্রকার মহাত্মার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। এই প্রকার মহাত্মা সম্বন্ধে জনক বলিয়াছেন ঃ—

যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ।
অহো! তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্ছতি॥[1]

অর্থাৎ যে পদকে পাইবার জন্য সকল দেবতা দীনভাবে অপেক্ষা করেন সেই পদকে ধীর যোগিগণ প্রাপ্ত হইয়াও হর্ষ প্রাপ্ত হন না।

---

(১) **অষ্টাবক্রসংহিতা চতুর্থ প্রকরণম্ ২ শ্লোক।**

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন তাঁহাকে পাপ-পুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই বিজ্ঞ এবং তিনিই প্রকৃত ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে বর্জন করিতে সমর্থ হন। এই বিশ্বসংসার জলের বুদ্‌বুদের ন্যায় এইরূপ জ্ঞান করিয়া, দুঃখ সুখ উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া, আশা নিরাশা সমান জ্ঞান করিয়া, বাঁচিয়া থাকা আর মৃত্যু সমান জ্ঞান করিয়া ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় লয় হও। তখন তোমার গ্রহণও নাই ত্যাগও নাই অর্থাৎ আগমও নাই নির্গমও নাই, শ্বাসও নাই প্রশ্বাসও নাই। যাহা কাল তাহাই বয়স, কারণ কালও সময় বয়সও সময়। এই কাল যে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে দেখ, দেখিতে দেখিতে কালস্বরূপ যে শ্বাস চলিতেছে তাহা যখন স্থির হইবে তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যাইবে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমতাকে পাইবে। সংসার আর কিছুই নয়, ইচ্ছা করার নাম সংসার। সব বাসনা বা ইচ্ছা ত্যাগ হইলেই স্থিতি হয়, তখন সংসার নাই, ইহা প্রাণকর্ম্ম সাপেক্ষ। অতএব ইচ্ছাই সংসার, ইচ্ছাই বন্ধন। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন ইচ্ছাও নাই তখন সংসারও নাই, তাহাই মোক্ষ।

তিন গুণের অতীত যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাই ভাব। সেই ভাব যখন নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যখন নাই তাহাই অভাব। সেই ভাবের অভাব মনের বিকারে হয় অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য হইলেই মনের বিকার হয় এবং তখন ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকায় ভাবের অভাব হয়। কিন্তু ক্রিয়া করিতে থাকিলে অভাব চলিয়া গিয়া স্বভাবে আসিয়া ক্রিয়া হয় অর্থাৎ তখন মস্তকে একপ্রকার অনির্বচনীয় ভাব হয়, ইহাই নেশা। তাহার পর স্থিতি হইলে বিকার রহিত হয় এবং বিকার রহিত হইলেই নির্ব্বিকার। নির্ব্বিকার হইলেই শান্ত এবং শান্ত হইলে আর আসক্তি থাকে না, কোনরূপ ক্লেশ থাকে না অতএব বিশ্রাম। চিন্তা করিলেই দুঃখ কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন চিন্তাশূন্য তখন সুখী ও শান্ত।

ভাল মন্দ, হর্ষ বিষাদ, আশ্রম অনাশ্রম, ইহা করিতে হইবে, ইহা ছাড়িয়া দিব এই সমস্ত চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া শান্ত হও অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক তাহা হইলেই প্রকৃত বিশ্রাম পাইবে। কিন্তু মনে রাখিও সেই অচিন্ত্যরূপকেও যদি চিন্তা কর তাহা হইলে চিন্তাকেই ভজনা করা হইল, তাই 'আমার ক্রিয়ার পরাবস্থা হউক' এইরূপ যে চিন্তা তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থির শান্ত হও, চিন্তাশূন্য হও এবং ত্যাগ ও গ্রহণ এই দুইই ত্যাগ কর। তখন ইচ্ছাতীত হওয়ায় অর্থও থাকিবে না অনর্থও থাকিবে না,

রূপেতেও থাকিবে না নিরাকারেও থাকিবে না অথচ স্থিতিতে থাকিবে। তখন খাওয়া, শোয়া, যাওয়া সবই করিবে কিন্তু কিছুই করিবে না। যেমন মাতাল কোন কর্ম্ম করিয়াও নেশান্তে বলে আমি করি নাই, সেই রকম ক্রিয়ার পরাবস্থায় এক বিচিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তখন সিদ্ধিরও ইচ্ছা থাকিবে না এবং সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যে আনন্দ তাহাও থাকিবে না। ক্রিয়া করিতে করিতে এই প্রকার ত্যাগ আপনা আপনি হয়। তখন ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয় না থাকায় বিষয়, সংসার, শাস্ত্র, বিজ্ঞান কিছুই নাই, বদ্ধ কি মুক্ত তাহাও নাই কারণ মুক্ত হইবার ইচ্ছা নাই। যেমন কোন বস্তু পাইবার ইচ্ছা জাগিল, কেমন করিয়া সেই বস্তু লাভ করা যায় তাহার কল্পনা আসিল। সেই ইচ্ছা বা কল্পনার পূরণ না হইলে দ্বেষ আসিল। এ সবই মনের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন আত্মাতে মিলিয়া গেল তখন দ্বেষ, ইচ্ছা, কল্পনা, মন কিছুই না থাকায় নির্ব্বিকল্প। তখন সুন্দর রূপ ব্রহ্মে চরণ করায় ব্রহ্মচারী।

তিনি ভক্তদের উপদেশ দিতে গিয়া আরও বলিতেন—তোমার যে আত্মা সেই আত্মাই সকল ভূতেতে আছেন সুতরাং সকল ভূতের আত্মা তোমার আত্মাতে আছেন। পৃথক নাই, অতএব তুমিই সর্ব্ব আত্মাময় জগন্নাথ হইতেছ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিলেই সকলের মনের ভাব জানিতে পারিবে এবং তখনই সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া সকল ভূতের গুণ ও ক্রিয়া আপনা হইতেই জানিতে পারিবে। তখন সর্ব্বশক্তিমান হইয়া সকল কর্ম্ম অনিচ্ছার ইচ্ছায় করিতে পারিবে। এই প্রকার গাঢ় ক্রিয়া দ্বারায় অণুর অণু স্বরূপ নিজেকে জানিলেই তোমার অহংকার চলিয়া যাইবে এবং নিরহংকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তুমিই কূটস্থস্বরূপ তাহাতে শ্রদ্ধা কর, বারংবার বলিতেছি তাহাতে শ্রদ্ধা কর। এই শ্রদ্ধা হইতে কখনও বিরত হইও না, কারণ কূটস্থস্বরূপ ভগবান্ আত্মা তুমিই হইতেছ এবং তুমি পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহংকারের অতীত হইতেছ। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যাইবে তখন তুমিই জগন্ময়, তোমা ছাড়া জগৎ নাই অতএব ভাল মন্দ কল্পনা নাই। এক হইয়া গেলেই অক্ষয় অবিনাশী, শান্ত চিদাকাশ, অমর তুমিই হইতেছ। তখন তোমার আবার জন্ম, কর্ম্ম, সংস্কার, অহংকার কোথায়? অতএব ইহা উহা ইত্যাদি বিভাগকে ত্যাগ করিয়া সবই আমি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় এইটি নিশ্চয় করিয়া নিঃসঙ্কল্প হও। তুমি নিজেতে নিজে না থাকায় এই বিশ্বসংসার দেখিতেছ, কিন্তু যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজেতে নিজে থাকিবে তখন তুমিই পরমার্থ স্বরূপ জগন্নাথ। একবার ভাবিয়া দেখ

তুমি ছাড়া অন্য কিছুই নাই, তুমিই সংসারী আবার তুমিই অসংসারী। কারণ যখন তুমি অন্যদিকে মন দাও তখন তুমি সংসারী, আবার তোমাতে তুমি থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিলে তখন তুমি অসংসারী। তোমার ইচ্ছাতেই এই বিশ্বসংসার সব হইতেছে, ক্রিয়ার পরাবস্থায় ইচ্ছা রহিত হইলেই এই বিশ্বসংসার ভ্রমমাত্র ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে এবং সব-কিছু ব্রহ্মময় এই জ্ঞান লাভ করিয়া সাম্যতাকে পাইবে। তখন তোমার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই এইরূপ কৃতকৃত্য হইয়া সুখে বিচরণ করিবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি।

তুমি যতই শাস্ত্র পড় বা শ্রবণ কর তাহাতে কিছুই হইবে না। এই সব হইতে বিস্মরণ হইতে হইবে, কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকিলে বিস্মরণ হয় না, চিত্ত আশা রহিত হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবস্থান করিয়া চিত্তকে আশা রহিত করিতে হইবে। ইচ্ছা করাতেই দুঃখ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রিয়ার উপদেশ লাভ করিয়া এবং ক্রিয়া করিয়া ইচ্ছা রহিত হইয়া নিবৃত্তিকে পায় সেই ধন্য হয়, তাহার তুল্য কেহই সুখী নহে। এমন ব্যক্তির আর চক্ষের পলক ফেলিতে ও তুলিতেও ইচ্ছা থাকে না, তিনি তখন আলসে হইয়া, কর্ম্মপ্রবৃত্তি শূন্য হইয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকেন। অতএব চিন্তা শূন্য হইলেই মোক্ষ তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব কিছুতেই নিরপেক্ষ হয়। তখন তিনি গ্রহণ ও ত্যাগ এই দুই রহিত হওয়ায় বিরক্ত নহেন, রাগবানও নহেন। অবশ্য এই অবস্থা সকলে জানে না, যাহার হইয়াছে তিনিই বুঝিতে পারেন, যতই বলা হোক বা লেখা হোক কেহই বুঝিবে না, অতএব ভাল মন্দর বিচার এবং ইচ্ছা রহিত হইলেই সংসাররূপ বৃক্ষের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখ নিবারণের জন্য যদি কেহ সংসারকে ত্যাগ করিয়া অরণ্য, গিরি গহ্বর, মঠ, মিশন বা আশ্রমে যাইতে চায় এবং সেখানে যাইলে সুখ লাভ করিব এইরূপ ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেও বদ্ধ কারণ তাহার ইচ্ছা বর্ত্তমান; কিন্তু এই সংসারে থাকিয়াও যিনি ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিয়া ইচ্ছাতীত হন, তাঁহার সুখও নাই, দুঃখও নাই, বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই। কিন্তু যতক্ষণ এই দেহেতে মমতা এবং ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ সে জ্ঞানীও নয়, যোগীও নয়, মুক্তও নয়, কেবল দুঃখের ভাগী। ইহা নিশ্চিত জানিও যে যতক্ষণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় ইচ্ছা রহিত না হইতেছ, সব কিছু বিস্মরণ না হইতেছ, ততক্ষণ তোমার সামনে স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও যদি আবির্ভূত হইয়া উপদেশ প্রদান করেন কিছুই হইবে না। ইচ্ছা রহিত

যিনি তিনি সদাই একাকী রমণ করেন, তাঁহার নিকট সবই ব্রহ্মময় হইয়া যাওয়ায় আর দুই থাকে না, তাঁহার ভোগ ও মোক্ষের ইচ্ছা না থাকায় তিনিই মহাশয় ; এমন ব্যক্তি বিরল। তখন তিনি কিছুই দেখেন না অথচ সবই দেখেন, কারণ তখন তাঁহার দৃষ্টি শূন্য ব্রহ্মে থাকে। তিনি তখন জাগ্রতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় উন্মীলিতও নহে নিমীলিতও নহে। এ এক বিচিত্র অবস্থা। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, নর নারী, লাভ অলাভ, বন্ধন মুক্ত সম জ্ঞান করেন। তাঁহার নিকট এ সকলের প্রভেদ থাকে না। তখন তাঁহার নিকট সব আছে কিন্তু ইচ্ছা ও আসক্তি রহিত হওয়ায় কিছুই নাই, পাইলে খান, না পাইলে খান না। তখন চিত্ত শূন্য ব্রহ্মে থাকায় আপনাতে আপনি থাকিয়া নিজেই নিজেকে নমস্কার করেন। তখন তিনি স্বভাবে থাকায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকায় ভাব এবং অভাব নাই, কারণ ভাব এবং অভাব ইহা কেবল চিন্তাযুক্ত জীবের কল্পনা মাত্র। অতএব ভাব অভাবকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়া থাক। তোমার কিছু জানিবার আবশ্যক নাই, কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কিছু করিবারও আবশ্যক নাই। তাই যাঁহারা যোগী তাঁহারা সংকল্প বিকল্প রহিত হইয়া, সবই আত্মময় এইরূপ নিশ্চিত অবস্থায় সতত যুক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই প্রকার শান্ত যোগীর বিক্ষেপ নাই এবং বিক্ষেপ না থাকায় কোন কর্ম্ম নাই। কিছু করিতে হইবে এই প্রকার ইচ্ছাই নাই, তখন এই রকম একটা ধরণ হয় যে কিছু করি নাই অতএব ধ্যানও নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থার পূর্ব্বে এই বিশ্ব-সংসার দেখিতে-ছিলে কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হওয়ায় নিজে নাই অতএব বাসনা করিবে কে ? এই প্রকার ব্রহ্মে লীন হইলে আর কিসের চিন্তা ? সুতরাং তখন নিশ্চিন্ত, তখন আমিই অদ্বিতীয়, আমি ভিন্ন আর কিছুই দেখি না, তখন আমিই ব্রহ্ম !

যাহার মন বিক্ষিপ্ত সে নানা কিছু দেখে, তাই সে ক্রিয়া করিয়া বিক্ষিপ্ততাকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় উদার চিত্ত হইলে আর মন বিক্ষিপ্ত হয় না, অতএব তাহার আর কোন সাধনা নাই। কারণ দীর্ঘ সাধনা করায় যখন সর্ব্বদার জন্য কুটস্থে স্থিতি হয় তখন তিনি আর কি করিবেন ? তখন তাঁহার আর কিছু করণীয় নাই। কারণ প্রাপ্তির জন্যই ত চেষ্টা, যখন প্রাপ্তি হইল তখন আর চেষ্টার আবশ্যক নাই, অতএব কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। তখন ধীর ও স্থির

হওয়ায় আসক্তি নাই অতএব সমাধির জন্যও চেষ্টা নাই, তখন মন বিক্ষেপ শূন্য হওয়ায় আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মগ্ন হইয়াথাকেন অর্থাৎ বুঁদ হইয়া থাকেন। তিনি ভাব এবং অভাব উভয় বিহীন হইয়া সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় তৃপ্ত থাকেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শূন্য হইয়া যখন যে কর্ম্ম আসিয়া পড়ে তাহাই করেন, তখন তাঁহার ভবিষ্যতও নাই অতীতও নাই। তিনি তখন সংসারে থাকিয়াও অসংসারী, দেহে থাকিয়াও বিদেহী, কোন কিছু পাইতেও চাহেন না কোন বিষয়ের নাশেরও ইচ্ছা করেন না, চিত্ত শূন্য ব্রহ্মে থাকায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তাঁহার মানও নাই অপমানও নাই। তাঁহার কল্পনা না থাকায় বিচার নাই, জানা শুনা দেখাও নাই, তিনি মোক্ষ পদেরও ইচ্ছা করেন না, তখন তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু যাহার মধ্যে চিন্তা আছে সে কিছু না করিলেও সব কিছু করে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিত ব্যক্তি উদ্বিগ্নও নন নিরুদ্বিগ্নও নন, অহংকারীও নন নিরহংকারীও নন, কর্ত্তাও নন অকর্ত্তাও নন, আশা ও সন্দেহ বর্জিত হন। তিনি ধ্যানও করেন না, তিনি মূর্খও নন জ্ঞানীও নন, তাঁহার কর্ত্তব্যও নাই অকর্ত্তব্যও নাই, তিনি তখন নির্ম্মল ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যান। ইচ্ছা থাকিলে মোক্ষ হয় না, ক্রিয়ার অভ্যাস করাও ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি ধন্য যিনি ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়া রহিত হইয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যান, আর ইচ্ছার সহিত কোন কর্ম্ম করেন না। ইচ্ছাই অনর্থের মূল তাই পণ্ডিতেরা ইচ্ছারূপ মূলকে ছেদন করেন যাহা ক্রিয়া করিলে আপনা আপনি হয়। মূর্খেরা শান্তি-লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাই তাহাদের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকায় শান্তিলাভ হয় না। কিন্তু যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন তিনি ধীর হওয়ায় এবং ইচ্ছা রহিত হওয়ায় সদা শান্ত মানসে থাকেন এবং পরব্রহ্মস্বরূপ হন। তিনি তখন আত্মাকেও দেখেন না কারণ আত্মাকে দেখিলেই অবলম্বন হইবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবলম্বন নাই সুতরাং কে কাহাকে দেখিবে? যাহারা মূর্খ ও কুবুদ্ধি সম্পন্ন তাহারাই শুদ্ধ অদ্বৈত আত্মাকে দেখিতে চায় ও আত্মাকে চিন্তা করে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে কিছুই নাই ইহা তাহারা জানে না। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যিনি সর্ব্বদা আটকাইয়া আছেন তিনি নিঃশঙ্ক ও ঔদাস্য বিশিষ্ট হওয়ায় আপনাতে আপনি থাকেন, এ এক বিচিত্র দশা। তিনি প্রথমে ইচ্ছার সহিত প্রাণায়ামের দ্বারাই যুদ্ধ করিয়া ইচ্ছাকে জয় করিয়া সদাই কুটস্থে আটকাইয়া থাকেন। এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছ সকলেরই নাশ আছে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে শূন্য ব্রহ্ম তাহার নাশ নাই, তাহাতে

থাকিলে সকল সন্তাপ চলিয়া যায় কারণ তিনি ইচ্ছা রহিত হওয়ায় এই বিশ্ব-সংসার থাকিয়াও নাই অতএব দেহও নাই। তখন তাঁহার এই দেহ থাকা আর না থাকা দুইই সমান। যখন তিনি নিজে নাই তখন তাঁহার মমতাও নাই, কিন্তু তিনি লোক দেখানর জন্য সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না। এই প্রকার যোগীর তমও নাই প্রকাশও নাই, হানি নাই, ধৈর্য্য নাই, বিবেক নাই, বুদ্ধি নাই, ভয় নাই নির্ভয়তাও নাই, যত্ন নাই অযত্ন নাই, কর্ম্ম নাই অকর্ম্ম নাই, ইচ্ছা নাই অনিচ্ছা নাই, সে স্বর্গও চায় না নরকও চায় না, সে বদ্ধও নয় মুক্তও নয়, মূর্খও নয় জ্ঞানীও নয়, তাঁহার লাভও নাই অলাভও নাই, শোচনাও নাই অনুশোচনাও নাই, স্তুতিও নাই নিন্দাও নাই, সুখও নাই দুঃখও নাই, কর্ত্তব্যও নাই অকর্ত্তব্যও নাই, হর্ষও নাই শোকও নাই, তিনি মরিয়াও নাই বাঁচিয়াও নাই, তাঁহার স্নেহও নাই মমতাও নাই, সন্তোষও নাই অসন্তোষও নাই, দ্বন্দ্বও নাই সংশয়ও নাই, আসক্তিও নাই নিরাসক্তিও নাই, তাঁহার নিকট ঢেলা এবং সোনা দুই সমান, তিনি সদা কেবল-ক্রিয়াতে রমণ করায় এবং মহাকাশ স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকায় আত্মাকেও দেখেন না, তখন তাঁহার সাধ্যও নাই সাধনাও নাই, তাঁহার তুলনা কাহারও সহিত দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি তখন জানিয়াও জানেন না, দেখিয়াও দেখেন না, বলিয়াও বলেন না, খাইয়াও খান না, শুইয়াও শোন না, তিনি সংসারীও নন সন্ন্যাসীও নন কারণ তাঁহার সব কিছু চলিয়া গিয়াছে। তিনি তখন কিছুই নন। এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাকেই জ্ঞান বলে। তখন সমাধিস্থ হইয়াও সমাধিবান নন, কারণ এই অবস্থায় থাকিয়াও তিনি জড়ের ন্যায় সকল কর্ম্ম করেন কিন্তু জড়বৎ হইয়াও জড় নন কারণ তিনি শূন্য ব্রহ্মে অবস্থান করায় সবই দেখিতে ও জানিতে পারেন তাই তিনি পণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিত নন, তিনি দ্বৈতও নন অদ্বৈতও নন। আর কত বলিব? এই প্রকারে যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবস্থান করিয়া সমস্ত তত্ত্বকে জানিয়াছেন তিনিই মহাশয়। তিনি কোন কিছুতেই নাই অথচ সব কিছুতে আছেন।

* * * * *

তিনি বলিতেন কোন দূর দুর্গম তীর্থে যাইতে হইলে পথে নানান সুন্দর দৃশ্য ও অন্যান্য তীর্থ পরিলক্ষিত হয়। যদি কেহ সেইখানে মোহিত হইয়া থামিয়া যায় তাহা হইলে তাহার লক্ষ্যবস্তু দর্শন হয় না। তাই তিনি বলিতেন আত্মসাধনা করিতে করিতে আপনা হইতেই নানান দেব-দেবী দর্শন

হইবে। কেহ যদি মনে করে দেব-দেবী দর্শনেই তাহার জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়াছে তবে তাহা ভুল। তাহাকে আরও যাইতে হইবে, থামিলে চলিবে না। যদি না থামিয়া চলিতে থাকে তবে ঐ সকল দেবদেবীই তাহার সহায় হইবেন। তাঁহারাই হাত ধরিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাই মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—**"ইস রাস্তেমে বিচ্ মুসাফির অকসর মারে যাতে হ্যায়।"** অর্থাৎ আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে সক্ষম হয় না।

যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইবে তখন দেখাদেখি থাকিবে না। কারণ সে মন ও বুদ্ধি থাকিবে না। তাই তখন দেখাদেখি নাই, জানাজানি নাই, তুমি নাই ঈশ্বর নাই, ভক্ত নাই ভগবান্ নাই, আনন্দ নাই নিরানন্দ নাই, শোক নাই দুঃখ নাই, জরা নাই ব্যাধি নাই, জন্ম নাই মৃত্যু নাই, ইষ্ট নাই অনিষ্ট নাই, জ্ঞান নাই অজ্ঞান নাই, বন্ধন নাই মুক্তি নাই, কোন দেব-দেবীও নাই। সে এক অনির্ব্বচনীয় চিন্ময় অবস্থা। উহাই অদ্বৈত অবস্থা। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"সে বড় অদ্ভুত ঠাঁই যেথায় গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।" ইহাকেই যোগিরাজ বলিয়াছেন—"ক্রিয়ার পরাবস্থা।" এই অবস্থা যাহার হয় সেই জানে। কারণ একটা থাকিলে অপরটা থাকিতে বাধ্য। সেখানে কেবল নাই নাই। নাই বলিবারও কেহ নাই। তাই তিনি বলিতেন—"তখন তুমি 'ভোঁ' হইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি সেখানে সকলকে এক সময় যাইতেই হইবে। তুমি চেষ্টা কর আর নাই কর। কিন্তু তাহার জন্য তোমায় লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু হে সাধক, ঈশ্বর তোমায় যে মন বুদ্ধি দিয়াছেন তাহার দ্বারা বিচার করিয়া দেখ তুমি কি সেই লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে চাও? বুদ্ধিমান্ সাধক তাহা চাহেন না। যদি তুমি বুদ্ধিমান্ সাধক হও তবে ভাবিয়া দেখ গন্তব্যস্থলে যখন যাইতেই হইবে তখন বিলম্ব না করিয়া ইহ জন্মেই পৌঁছাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়। (হে সাধক, তোমাদের সকলের মধ্যে এক বীর সত্ত্বা সুপ্ত আছে। তাহাকে চিমটি কাটিয়া জাগাও, চাবুক মারিয়া ওঠাও। সেই বীর সত্ত্বাকে অশ্বে পরিণত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বীর দর্পে ছুটিয়া চল। কিন্তু ভুল করিয়া লাগামটি নিজ হস্তে ধারণ না করিয়া মালিকের হস্তে দিয়া দাও, যেমনটি অর্জ্জুন করিয়াছিলেন। সংসারেই থাক কিন্তু সংসারের পঙ্কিলতার আবর্তে নিজেকে লিপ্ত করিও না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপ গর্ত্তে দেহরূপ রথের ছয় চক্রকে পতিত হইতে দিও না। সর্ব্বপ্রকারে দুর্ব্বলতাকে পরিহার কর। দুর্ব্বলতাই

পাপ, দুর্ব্বলতাই মৃত্যু। নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিও না। হে বীর সাধক, তুমি নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিতে ভাবিতে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছ। কিন্তু তুমি অমৃতস্য পুত্রাঃ—তুমি অমৃতের পুত্র। তুমি জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির অতীত। তুমি তোমার নিজ স্বরূপকে ভুলিয়া বসিয়া আছ। লম্বা হইয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বহু রজনী অতিক্রম করিয়াছ। একবার ভাবিয়া দেখ ঐভাবে লম্বা হইয়াই তোমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। এবার মেরুদণ্ডটি সোজা করিয়া বস। এই পাগলা মাতালের কথাটা শোন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ক্রিয়াযোগ সাধন কর ; ক্রিয়াযোগ সাধন করিলেই মুক্ত, না করিলেই বন্ধন। ক্রিয়াই সত্য। সাধনার দ্বারা যতক্ষণ নিজেকে উদ্দীপ্ত করা না যায় ততক্ষণ দেব-দেবীরাও সাহায্য করেন না।”)

(“সবাই এসেছে বিশ্বমাঝে
করতে আপন খেলা,
সাঙ্গ হলে ফিরে যাবে
ফুরিয়ে গেলে বেলা।
কোথায় দুঃখ কোথায় সুখ
সে যে কেবল অন্তর বিমুখ,
ধর ধর টেনে সুর
পাবে তুমি অনন্ত সুখ॥”)

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনগুণ জীব শরীরে সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে। জীব এই তিন গুণের অধীন। এই তিন গুণই তিন দেবতা। রজগুণ ব্রহ্মা, সৃষ্টি কর্ত্তা ; তমগুণ মহেশ, নাশ কর্ত্তা এবং সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, স্থিতি অর্থাৎ পালন কর্ত্তা।

**রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা
সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্র
স্ত্রয়োদেবা স্ত্রয়োগুণা।**[১]

এই তিন গুণ যেমন জীব শরীরে খেলা করিতেছে তেমনি বিশ্ব-প্রকৃতিতেও খেলা করিতেছ। (জীব শরীরে নাভির নীচে তমগুণ, নাভি

(১) **জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।**

হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত রজগুণ, কণ্ঠ হইতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত সত্বগুণ এবং তাহার ঊর্দ্ধে গুণাতীত অর্থাৎ নির্গুণ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥[১]

জীব যখন যে গুণের অধীনে থাকে তখন তাহার মন সেই স্থানে অবস্থান করে এবং তাহাতেই মোহিত থাকে। এইভাবে সত্ব হইতে তম এবং তম হইতে সত্ব এই ঊর্দ্ধাধোগতি সর্ব্বদাই চলিতেছে। গুণাতীত স্থানে জীবের মন কখনই যায় না। সাধনার দ্বারা সেই গুণাতীত স্থানে পৌঁছাইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারিলেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। সেই ত্রিগুণাতীত অবস্থাই ব্রহ্ম। সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী কেহ নাই। হিন্দুরা এই তিন গুণকে তিন দেবতা মানিয়া থাকেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ঐ তিন দেবতা মানেন না, কিন্তু সকলেই তিন গুণকে স্বীকার করেন। কারণ ঐ তিন গুণ সর্ব্বদাই সকলের দেহাভ্যন্তরে কার্য্যে রত।

এই ক্রিয়াযোগ সাধনে যোগীর মন স্থির হইয়া গিয়া ঐ নির্গুণ স্থানে এমন এক স্থিতি আসে যেখানে যোগী সর্ব্বদা থাকিতে সক্ষম হন। তাই তিনি তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—"**জত্তা পিয়োগে ওত্তা মজুরি মিলেগা। সবেরে চার ঘড়ি রাত রহতে প্রাণায়াম করনা আচ্ছি হয়।**" অর্থাৎ যতটুকু প্রাণকর্ম্ম করিবে ততটুকুই মজুরী পাইবে অর্থাৎ যতটুকু স্থির হইবে ততটুকুই আত্মদর্শন হইবে। চার দণ্ড রাত্র থাকিতে উঠিয়া প্রাণায়াম করা ভাল। ঐ সময় বাহ্য প্রকৃতি শান্ত থাকায় আত্মসাধনার উপযুক্ত সময়।

যোগিরাজ বলিতেন নদীর ধর্ম্ম তাহার কারণস্বরূপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাওয়া। সে ইচ্ছা করুক বা নাই করুক প্রকৃতির তাড়নায় এক সময় সে তাহার কারণে লীন হইবেই। তেমনি জীবের ধর্ম্মও তাহার উৎসস্থলরূপ ব্রহ্মের দিকে ছুটিয়া যাওয়া। তাই অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥[২]

(১) গীতা ১৪।১৮
(২) গীতা ১১।২৮

যেমন নদীসমূহ সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ নর-লোকবীরগণ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমান তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে।

কোন্ অনন্তকাল পূর্ব্বে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সে ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া অর্থাৎ নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া লক্ষ কোটি যোনি ভ্রমণ করিতে লাগিল। কাল বিবর্তনে ক্ষুদ্র লতা গুল্ম কীট পতঙ্গ হইতে শুরু করিয়া মানব হইল। এইভাবে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইতে হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার উৎসস্থলরূপ ব্রহ্মত্বের অভিমুখে। সে ইচ্ছা করুক বা নাই করুক কালের প্রভাবে, ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে এক সময় তাহাকে তাহার উৎসস্থলে পৌঁছাইতেই হইবে। ইহাই জীবের ধর্ম্ম। ইহার জন্য তাহাকে চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। চুরাশী আঙ্গুলি পরিমিত তাহার মানব দেহের উন্নতির জন্য তাহাকে চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, মানব হইয়া জন্মিয়াও তাহার মানব মস্তিষ্ককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতে তাহার আরও দশ লক্ষ বৎসর প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রয়োজন হয়।

তাই যোগিরাজ বলিতেন—ক্রিয়াযোগ এই প্রাকৃতিক বিবর্তনের সময়-সীমাকে বহুলাংশে কমাইয়া আনিতে সক্ষম। তিনি ইহার নির্ভুল হিসাব দিয়া বলিয়াছেন মাত্র আট ঘণ্টা ক্রিয়াযোগ সাধন করিলে যোগীর মস্তিষ্ক এক হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের সমান উন্নত হয়।

যিনি কোন বস্তু পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা বা সাধনা করিতেছেন তিনিই সাধক। আর যিনি সেই বস্তুকে পাইয়া তাহার সহিত একাকার হইয়া গিয়াছেন, মিলিয়া লয় হইয়াছেন অর্থাৎ যুক্ততম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই যোগী। এই নিমিত্ত প্রাপ্তি না থাকিলে সাধক বলা যায় না অর্থাৎ সাধক অবস্থায় দেখা শুনা আছে, কারণ তখনও তাঁহার মন বা ইচ্ছা কাজ করে। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"যেমত কোন ঘরের মধ্যে সূর্য্যের আলো যায় এবং দরজা বন্ধ থাকে বাইরে যদি পাখি উড়িয়া যায় তাহার ছায়া দেওয়ালেতে দেখা যায় তদ্রূপ মনে প্রকাশ হইলে দেবতাদি যাহারা আছেন তাঁহার দিগের দর্শন হয়।"** এই অবস্থায় ব্রহ্ম ও আমি এই দুই সত্তা অন্ততঃ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যিনি সাধনা করিতেছেন ও যাঁহাকে সাধনা করিতেছেন এই দুই বর্ত্তমান। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"কালী সোচ সোচ কালী হুয়া অব কালীকা বাবা হোনা হয় বাবা য়ানে ব্রহ্ম অর্থাৎ যো সূন্যকে ভিতর সুন্য হয়—এই সব সুর্য্যকো দেখনেমে মিলতা**

হয়।"—কালী চিন্তা করিতে করিতে কালী হইলাম, এখন কালীর বাবা হইতে হইবে, বাবা অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহা বর্ত্তমান শূন্যের ভিতরের শূন্য অর্থাৎ যে মহাশূন্য হইতে পঞ্চভূতের শেষ ভূত বর্ত্তমান শূন্যের উৎপত্তি। আত্মসূর্য্যকে দেখিতে দেখিতে সেই মহাশূন্যকে পাওয়া যায়। কিন্তু যোগীর তাহা নহে। কারণ স্থিরত্বের নাম যোগ এবং যিনি স্থির হইয়াছেন তিনিই যোগী। যোগী যখন সমাধিস্থ হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার দেখা শুনা নাই, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন—**"উহতে বেমন কেমন কেমন মন ন পাওয়ে। মন ছোড়েতো মন নহি হাওয়ে।"**—বেমন অর্থাৎ মনের নিবৃত্ত অবস্থা তাহা কেমন মন জানে না, কিন্তু যখন জানিতে গেল তখন মন নিজেই হারাইয়া গেল, আর জানা হইল না। এই প্রকার যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন নিজে না থাকায় কোন কর্ম্ম নাই, কারণ যে কর্ম্ম করিবে সে নাই। কিন্তু সাধকের ক্ষেত্রে কর্তা (আমি) করণ (ক্রিয়া) এবং অধিকরণ (শরীর) সমস্তই রহিয়াছে অথচ যাঁহাকে পাইলে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্ম তাহাই নাই। কিন্তু যোগীর ক্রিয়ার পর অবস্থায় কর্ম্ম না থাকায় নিষ্ক্রিয়, কারণ ঐ অবস্থায় সমস্ত গুণ আকাশে যুক্ত হওয়ায় নিষ্ক্রিয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় সে অবস্থা যে কি তাহা জানা যায় না, কারণ যে জানিবে সে নাই। তবে ক্রিয়া করিতেছি কেন? গুরু বলিয়াছেন তাই করিতেছি, কিন্তু ইহার শেষ ফল কি তাহা জানা যায় না।

তাই এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"সকলে কিছু পাবার আশায় কর্ম্ম করে। 'ক্রিয়া' ক'রে যখন কিছুই পাওয়া যায় না তখন সকলে 'ক্রিয়া' করে কেন?"

যোগিরাজ বলিলেন—**"মূর্খ তাই করে।"** অর্থাৎ এই অবস্থায় প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নাই, লাভ অলাভ নাই। তখন তিন গুণ এক হওয়ায় গুণাতীত। উহা অব্যক্ত বলিয়া ধর্ম্মের অভাব অর্থাৎ তখন ধর্ম্ম অধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম না থাকায় উহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। যেমন জলের গুণ ও ধর্ম্ম যাহাতে আছে তাহাই জল কিন্তু যখন গুণাতীত ও ধর্ম্মাতীত তখন জল নাই। সেই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থা। এই অবস্থায় নিজে না থাকায় অন্য দিকে মন যাওয়ারূপ অধর্ম্ম থাকে না এবং ধর্ম্মও থাকে না। ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদাই থাকে; যেমন প্রাণিমাত্রের শ্বাসই ধর্ম্ম হইতেছে। এই ধর্ম্ম গেলে আত্মাতে স্থির থাকে। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"মনকো দুসরে তরফ নহি জানে দেনা চাহিয়ে মনসে মনকো দেখনা চাহিয়ে। মন ও চক্ষু স্থির হোনেসে**

ক্যা হোগা জবতক শরীর স্থির ন হোয়। আজ শ্বাসা বিলকুল বাহর নহি নিকলতা হয়। অব বড়া মজা মতওয়ালকে মাফিক।" যাহারা কোন কিছু গ্রহণ করে বা দেখে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, কারণ দুই না থাকিলে কিছুই গ্রহণ বা দেখা যায় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় দুই নাই, তাই সেখানে কোন কথা নাই। তাই মৌন। অন্যদিকে মন দেওয়ার নাম বন্ধন, এই বন্ধন হইতে সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার নাম মুক্ত। এই মুক্তাবস্থায় থাকিতে থাকিতে বাহিরের সমস্ত বস্তুতে অনাসক্ত হইয়া সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দেখে। এই অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় ও শরীর সকলের অভাব হয়; কারণ তখন মন ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মাতে এবং আত্মা পরমাত্মাতে তদ্গত হইয়া যায়। এই অবস্থায় মেঘের গর্জ্জন পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই নাই, এই কিছুই নাই অবস্থাই ব্রহ্ম। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকাই মিথ্যা। এই অবস্থায় পৃথক নাই। পৃথক হইলেই দেখা শুনা। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহার বিপরীত ক্রিয়ার পর অবস্থা, যেখানে আশ্রয় ও আশ্রিত ভাব নাই কারণ এই অবস্থা কাহারও আশ্রয়ে নহে। ব্রহ্মাণু লক্ষগুণে স্থূল হইয়া একটি মৃত্তিকার অণু। এই স্থূল অণুর সংযোগে দ্রব্য সকল হইতেছে। আর এই প্রকার সংযোগে অবয়বের সমস্ত অংশ হইয়া থাকে, যেমন মৃত্তিকার অণু হইতে কাঁকর ইত্যাদি। এই সকল স্থূল মূর্ত্তির অণু সকলের পরস্পর সংযোগে অবয়বের সম্ভাব হইতেছে। মূর্ত্তি সকল এই প্রকার সংযোগে হয়; কিন্তু অনবস্থা প্রযুক্ত আটকাইয়া থাকে না এই নিমিত্ত অনিত্য, কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় ব্রহ্মে থাকায় কোন বাধা নাই ও এক হইয়া থাকায় কোন কিছুরই উৎপত্তি হয় না, তন্নিমিত্ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুতে মনের প্রকৃষ্টরূপে অনন্ত লয় হয় না। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি বা ক্রিয়ার পরাবস্থার পূর্ব্বাবস্থায় অনন্ত দ্রব্য ও পরিমাণ ভেদ মনে হওয়ায় তাহা ক্রিয়ার পরাবস্থা নহে। শরীর, আত্মা, মন ও বিভু মিলিয়া এই জীবন; এই জীবন কর্ম্মের আশ্রয়ে থাকায় সমস্ত হইতেছে। আত্মার গুণ মন আর এই শরীর ভোগায়তন হওয়ায় সুখ দুঃখ সমস্তই শরীরের মনের দ্বারা হইতেছে। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন—**"জল জবতক ঘটমে তো উস্কা কুছ তাকত নহি, জব গঙ্গামে মিলা তো সব করে।"**—শ্বাসের গতি যতক্ষণ বহির্ম্মুখী ততক্ষণ উহার কোন ক্ষমতা নাই, কারণ বহির্ম্মুখী শ্বাস দেহরূপ ঘটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন অভ্যন্তরমুখী হইয়া স্থির হইল তখন অনন্ত মহাশূন্যের সহিত মিলিত

হওয়ায় অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন। এই অবস্থায় পৌঁছিয়া তিনি বারবার লিখিয়াছেন—**"বড়া মজা সব অঙ্গ টুটনে লগা।"** কিন্তু আত্মায় প্রথমে মনের সংযোগ তারপর লয় হইলে আর দেখা শুনা নাই, প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত নাই। তাই তিনি ১৮৭১ খৃঃ ২৮শে জুলাই লিখিয়াছেন—**"এক নিৰ্ম্মল সূন্য দেখা ওহি ব্রহ্ম হয় উসিমে মনকো লয় করনা চাহিএ। জব দো এক হো জায় তো এক হয় এহি হমজাদ হয়।"** এক নির্ম্মল শূন্য দেখিলাম উহাই ব্রহ্ম, উহাতে মনকে লয় করিতে হইবে। যখন দুই মিলিয়া যায় তখন এক হয়, আর দুই থাকে না; ঐ এক অবস্থাই হমজাদ অর্থাৎ পুরুষোত্তম। ৩০শে জুলাই লিখিয়াছেন—**"নিৰ্ম্মল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিয়ে"**। তারপর ২৬শে আগষ্ট লিখিয়াছেন—**"সূন্য নিৰ্ম্মল দেখা উসিমে মিল জানা সমাধি কহলাওএ—ওহি বাকি হয়—পুরুষোত্তমকে আগে ব্রহ্ম হয়—উসিমে লয় হোনা বাকি হয়। লয় বিলকুল নিষ্কাম ন হোনেসে নহি হোগা।"** অর্থাৎ নির্ম্মল শূন্য যাহা দেখিতেছি তাহাতে মিলিয়া যাওয়াকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে তাহা এখনও বাকি, পুরুষোত্তমের পরে ব্রহ্ম তাহাতে লয় হওয়া বাকি আছে। সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম না হইলে লয় হইবে না। পুনরায় লিখিয়াছেন **"সূন্য ভবনমে লয় হো জানা।"** সেই শূন্য ভবনই আসল, তাহাতে মিলিয়া আটকাইয়া থাকিতে হইবে, তাহাতেই লয় হইতে হইবে অর্থাৎ একাকার হইতে হইবে। ২রা সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন—**"নিৰ্ম্মল জ্যোত মন দেখতা হয় লেকন উহ ন লয় হুয়া—ওহা যাকে অভি নির্ব্বাণ নহি হুয়া।"** অর্থাৎ মন এখনও সেই নির্ম্মল জ্যোতি দেখিতেছে কিন্তু এখনও লয় প্রাপ্ত হয় নাই, সেইখানে লয়প্রাপ্ত হইলে যে নির্ব্বাণ তাহা এখনও হয় নাই। তাই তিনি আরও অগ্রসর হইয়া ক্রমোন্নতির কথা লিখিলেন—**"অব হম নিৰ্ম্মল জ্যোতমে সমায় গয়ে।"** এখন আমি সেই নির্ম্মল জ্যোতিতে মিলিয়া গেলাম। **"বহুত তরইকা ঘর দরওয়াজা দেখনেমে আয়া—ওঁ ধ্বনিমে লয় হোনা চাহিয়ে।"** কুটস্থে অনেক রকমের ঘর দরওয়াজা দেখিতে পাইলাম অর্থাৎ ষট্‌চক্রের প্রকাশ হইল। এই অবস্থায় যে ওঁকার ধ্বনি তাহাতে লয় হইতে হইবে। আরও লিখিয়াছেন—**"বড়া দরওয়াজা খুলা—জয়সা নলকা জল গঙ্গামে মিলনেসে গঙ্গা হো জাতা হয় ওয়সা শ্বাসা যায়কে সূন্য ভকামে মিলনেসে একাকার হো জাতা হয়—এহি ব্রহ্ম হয়—আদি ব্রহ্ম সচ্চা—আপহি আপ ভগবান রূপ হয়—অব বড়া মজা হয়।"** অর্থাৎ প্রধান দরজা খুলিয়া গেল,

যেমন নলের জল যখন গঙ্গায় পড়ে তখন সে গঙ্গা হইয়া যায় তেমনি শ্বাস যখন সেই নির্ম্মল শূন্যে মিলিয়া যায় তখন একাকার অর্থাৎ লয় হয়, সেই অবস্থাই ব্রহ্ম, সেই আদি ব্রহ্মই সৎ, তখন নিজেই ভগবান্ হয়। সেই শ্বাস আসে কোথা হইতে ? **"সূন্যকে ভিতরসে হওয়া আতা হয় ইহ মালুম হোনে লগা।"** সেই মহাশূন্যের ভিতর হইতেই শ্বাস আসিতেছে ইহা বুঝিলাম। কয়েক দিন পর লিখিয়াছেন—**"আজ অভয় পদ দর্শন হুয়া—য়ানে মহাস্থির হুযা, মোক্ষ হুয়া—ফির উহ সূন্য ঘরমে রহ করকে সবকুছ দেখে সব কুছ করে। যেতনা ইন্দ্রিয় লয় হোতা হয় ওহি স্বাসামে।"** - আজ অভয়পদ দর্শন হইল অর্থাৎ মহাস্থির হইল, মোক্ষ হইল। সেই শূন্য ঘরে থাকিয়া সব কিছু দেখি এবং সব কিছু করি। সকল ইন্দ্রিয় সেই মহাশূন্যরূপী শ্বাসে মিলিয়া যায়। অভয়পদ অর্থাৎ যেখানে ভয় নাই। সেই মহাশূন্যে কোন প্রকার অবলম্বন না থাকায় অভয়পদ। পুনরায় লিখিয়াছেন - **"অব ময় আনন্দকা ঘর পায়া য়ানে শ্বাসা ন আওএ ন জাএ।"** যেখানে অবস্থান করিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা যাওয়া নাই সেই আনন্দরূপী ঘর পাইলাম। এরপর এক চরম কথা লিখিয়াছেন **"অব ন আনা ন জানা।"** অর্থাৎ এই ভবসংসারে আর আসিতেও হইবে না যাইতেও হইবে না। সেই স্থির ঘরে পৌঁছিয়া তাঁহার কি হইল ? লিখিয়াছেন—**"স্থির ঘরমে ঠহরে—অব অটকনেকা জগহি মিলা।"** সেই স্থির ঘরে অবস্থান করিলাম, এবার সর্ব্বদার জন্য আটকাইয়া থাকিবার জায়গা পাইলাম। তারপর সেইস্থানে আটকাইয়া থাকিয়া তিনি সংসারকে কেমন দেখিতেছেন ? লিখিয়াছেন - **"ইহ জীবন হয় সব ঝুট দেখলাই দেতা হয় বাস্তবিক কুছ নহি - জয়সা মুরদা চমড়া লগা রহা ধোকেসে মালুম হোতা হয় কি মেরা শরীরমে লগা হয় আউর মেরা হয়—ওএসেহি জগত সংসারকো মালুম হোতা হয়। ইহ মালুম হুয়া কি ইহ সংসার স্বপ্নবৎ হয়। সব তুছ মালুম হুয়া। অব দুসরে পদার্থপর তাকনেকা এরাদা ন করে।"**—এই জীবন সবই মিথ্যা বাস্তবিক কিছুই নাই ইহা দেখিলাম। যেমন মরামাস শরীরে লাগিয়া থাকে এবং মিথ্যা মনে হয় উহা আমারই চামড়া, তেমনি এই জগৎ-সংসারকেও বুঝিলাম। ইহা আরও বুঝিলাম যে এই জগৎসংসার স্বপ্নবৎ অলীক। এখন আর কোন বস্তুর প্রতি তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। **"অব ইহ**

এরাদা করতা হয় চুপচাপ পড়া রহে।"—এখন এই প্রকার ইচ্ছা হইতেছে যে চুপচাপ পড়িয়া থাকি। তাই তিনি গাহিলেন—

রগড়মে কভি কসর মত করো,
রগড়মে মনো কামনা পূর্ণ তেরো।
মন তুসরে তরফ কঠিন ধরো,
সূন্যকে ধ্যানসে সব কাজ নিকারো ;
দেখোগে আশ্চর্য্য সামর্থ তেরো,
পিছেমে সবকুছ বনেগা তিহারো।
উদাস মন তুম কঠিন ফিরো,
আগর তুম জানো হো হুসিয়ারো ;
লগে রহো সাঁইয়াসে ভলিতরো,
তুঝে সাঁই পেয়ার জরুর করো।
নিরন্তর সাঁইজিকা ধ্যান ধরো,
হোয়গা জরুর কাম তেরা পুরো॥

তিনি যে কেবলমাত্র যোগী ছিলেন তাহাই নহে। পরন্তু নিজের পরিচয় নিজেই নিভৃতে লোকচক্ষের অন্তরালে তাঁহার একান্ত গোপনীয় দিনলিপিতে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার এই পরিচয় সম্ভবতঃ কেহই জানিতেন না, কারণ তিনি প্রচারে পরাঙ্মুখ ছিলেন। প্রতিদিনের ন্যায় সাধনার উপলব্ধির বিষয় লিখিতে গিয়া ১৮৭৩ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট লিখিয়াছেন —"**আজ হম মহাপুরুষ হুয়ে।**"—আজ আমি মহাপুরুষ হইলাম। ১৭ই আগষ্ট একটি মনুষ্য মুখাকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন —"**মহাপুরুষ হম হয়—সূর্য্যমে এয়সা দেখা হমহি ব্রহ্ম হয়।**" ১৮ই আগষ্ট লিখিয়াছেন—"**হমারাই রূপসে জগত প্রকাশিত—অব বহু গাঢ়া প্রাণায়াম হুয়া। হমহি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।**"—আমারই রূপ হইতে জগতের প্রকাশ, এখন খুব গাঢ় প্রাণায়াম হইল, আমিই একমাত্র পুরুষ আর কেহ নাই। ২২শে আগষ্ট লিখিয়াছেন—"**হমহি আদি পুরুষ ভাগবান—কুছ পেটমে না তাকতসে দরদ হয়—অব শ্বাস আউর ভিতর গয়া—অব চতুর্ভুর্জ হোনেকা লক্ষণ হুয়া—ইহ মালুম হোতা হয় কি ইহ দোনো হাত ছোড়ায় আউরভি শক্তিময় নিরাকার দুই হাত ভিতরসে নিকলা।**"—আমিই আদি পুরুষ ভগবান্, পেটে কিছু শক্তি কম থাকায় ব্যথা হইতেছে, এখন শ্বাস আরও ভিতরে প্রবেশ করিল, এখন আমার

চতুর্ভূর্জ নারায়ণ হওয়ার লক্ষণ হইল, ইহা বুঝিলাম যে আমার বর্ত্তমান দুই হাত ছাড়াও আরও অনন্ত শক্তিময় নিরাকার দুইটি হাত বাহির হইল। ২৫শে আগষ্ট একটি সূর্য্য অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন **"সূর্য্য নারায়ণ ভগবান জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী হম হয়। এক জ্যোত ভিতর মালুম হোতা হয় যো সূর্য্যসে আতা হয় সূর্য্যহি হম হয়। জো হম সোই উহ রূপ নিরাকারকা। যো বুদ্ধিকে পরে অনন্তরূপ ওহি ভগবান— আউর নির্ম্মল। হম হি অক্ষর পুরুষ।"**—আত্মসূর্য্যরূপী নারায়ণ ভগবান্ জগদীশ্বর যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি আমিই। ভিতরে এক জ্যোতি দেখিলাম যাহা আত্মসূর্য্য হইতে আসিতেছে তাহাও আমিই। যাহা আমি তাহাই সেই নিরাকারের রূপ। বুদ্ধির অতীতে যে বৃহৎ কূটস্থ স্বরূপ অনন্ত রূপ তাহাই ভগবান্, উহা অতীব নির্ম্মল। আমিই সেই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা যখন নিজেকে নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত ও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিয়া তাঁহাতে বিলীন হন, তখনই তিনি অক্ষর পদবাচ্য। আরও লিখিয়াছেন—**"কূটস্থ অক্ষর অমর ওহি সূর্য্য নারায়ণ হয়—এহি হম হয় আউর এহি সূর্য্য হয়। কূটস্থ অক্ষর আদি আউর হম হয়। সূর্য্যহি মালিক আউর মজা আউর সাফ। অক্ষর সূর্য্য হয় ওহি হম হয়।"**—সেই কূটস্থ অক্ষর অবিনাশী তাহাই আত্মসূর্য্যরূপী নারায়ণ তাহাই আমি। সনাতন কূটস্থ অক্ষর তাহা আমিই। সেই আত্মসূর্য্যই মালিক, তাহা আরও পরিষ্কার আরও মজা। সেই বৃহৎ কুটস্থ অক্ষরই আত্মসূর্য্য তাহাই আমি। ২৩শে আগষ্ট লিখিয়াছেন—**"হম জব সূর্য্য হয় তব জো হম কহে সো বেদ হয়—য়ানে নিশ্চয় জানে।"**—আমিই যখন সেই বৃহৎ কূটস্থস্বরূপ আত্মসূর্য্য তখন আমি যাহা বলিতেছি তাহাই বেদ অর্থাৎ অপৌরুষেয় ইহা নিশ্চয় জানিবে। ২৪শে আগষ্ট লিখিয়াছেন— **"হমহি কৃষ্ণ।"** আমিই কৃষ্ণ।—২৭শে আগষ্ট লিখিয়াছেন—**"জো পুরুষ আদিত্যমে সোময়হুঁ। ব্রহ্মরূপ সূর্য্যকা হমারা হয়।"**—আত্মসূর্য্যের মধ্যে যে আদি পুরুষ তাহা আমি। সেই সূর্য্যের মধ্যে যে ব্রহ্মের রূপ তাহা আমা হইতেই আসিতেছে। ৩রা অক্টোবর লিখিয়াছেন —**"হম সূর্য্য হয়—মহাদেব।"**—আমি আত্মসূর্য্যস্বরূপ মহাদেব। ১২ই নভেম্বর লিখিয়াছেন—**"হমহি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।"**—আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। ১৮৭৪ খৃঃ ৮ই জানুয়ারী লিখিয়াছেন—**"সূর্য্যই ব্রহ্ম এহি স্থির ঘর পহুচাতা হয়—অব স্থির ঘরমে গয়ে, উসিকা নাম অমর ঘর হয়।"**—আত্মসূর্য্যই ব্রহ্ম ইহাই স্থির ঘরে পৌছাইয়া দেয়, এখন স্থিরঘরে

পৌঁছিলাম উহারই নাম অমর ঘর। ২৯শে জানুয়ারী লিখিয়াছেন— **"অব সুতোকা দিল চাহতা হয়—আউর খালি ব্রহ্মকো দেখে য়ানে সূন্যকে ভিতর সূন্য—অব স্থির ঘরমে ময় গয়া অব মালুম হোতা হয় জয়সা শরীর উপকে হওয়াসে নিচেসে উঠতা হয় জয়সা হুক্কা পিকে পানি ফেক দেনেসে নিচেকে ছেদ যঁহাসে পিয়া জাতা হয় ওহাঁসে ধুয়া নিকস জাতা হয় ওয়সাহি হোয়গা। অব অগম ঘর গএ—অব অজর ঘরসে অমর ঘর গএ—অব কুছ নহি খালি মালিক।"**—এখন কেবল শুইয়া থাকিতে মন চায়, শূন্যের ভিতর যে শূন্য সেই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মকে কেবল দেখি. এখন আমি স্থির ঘরে পৌঁছিলাম, এখন মনে হইতেছে যে শরীর উপচাইয়া বায়ুর দ্বারা নীচে হইতে উপরে উঠিতেছে ঠিক যেমন হুঁকাতে ধূমপান করিবার পর হুঁকা হইতে জল ফেলিয়া দিবার সময় নীচের ছিদ্র যেখান হইতে ধূমপান করা হয় সেখান হইতে ধোঁয়া বাহির হয় ঠিক সেই রকম হইতেছে। এখন আমি অগম্য ঘরে পৌঁছিলাম, সেখান হইতে অজর ঘরে এবং তারপর অমর ঘরে পৌঁছিলাম, এখন আর কিছুই নাই কেবল মহাশূন্যরূপী মালিক ব্রহ্মই আছেন। ২রা মেআরও লিখিয়াছেন— **"ব্রহ্মরূপ হমারা য়ানে জো সূন্য ভিতর, মন, সোই সূন্য বাহর—ফির মন দেখনে লগা বাহরকা কূটস্থ অক্ষর ফির উইভি গয়া—অব রহ গয়া খালি শান্তিপদ ইহ সূন্য জব ব্রহ্ম হুয়া য়ানে ইহ মম আউর কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম হয় তব সূন্য মন ব্রহ্ম হুয়া।"** আমারই ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ মনরূপী যে শূন্য ভিতরে সেই শূন্যই বাহিরে, পুনরায় মন বাহিরের কূটস্থ অক্ষর দেখিতেছে আবার উহাও চলিয়া গেল আর কিছুই দেখি না, এখন কেবল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম অর্থাৎ শান্তিপদই বর্ত্তমান রহিল, এই অবস্থায় আমার আমিত্ব সহ কূটস্থ অক্ষর সবই ব্রহ্ম হইল তখন মনও মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে মিলাইয়া গেল। এ বিষয়ে এবার তিনি মনের আনন্দে গাহিলেন—

অব চলো পেয়রে অমরপুর চলো
ছোড় জগজঞ্জাল বিষয়রস ত্যাগো
আউর ভটকত ফিরো কেঁও তুম ভুলো
বিষয় রসসে কুছ মজা নহি হয়
আপহি আপ তুম সমায় লো
ফিরতে ডোলতে রহে একেলা
হরদম সাঁই[১] পাশ হাজিরি দেলো।।

(১) সাঁই=কর্ত্তা।

সেই অভয়পদ কি প্রকারে লাভ করা যায়? যোগিরাজ ১৮৭৪ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট লিখিলেন—**"অভয়পদ গুরু বিনা মিলতা নহি—সুন্য ভবনমে স্থির রহনা, বিনা স্থিরমে ঘুসনেসে নহি হোগা।"**—গুরু ব্যতীত সেই অভয়পদ লাভ করা যায় না; শূন্যভবনে স্থির থাকিতে হইবে, বিনা স্থিরত্বে সেখানে প্রবেশ করা যায় না। মহাযোগী আরও লিখিলেন—

নাম সুমির লেও অমৃত বানি
তুম ভুলেহো আপ ব্রহ্ম ন জানি
কহোতো হাত ক্যাকর হি হিলানি
মনহি মন তুমাহিই হিলানি
হিলো কিসমে ওকে করো বখানি
সূন্যমে বিচার দেখেহু হিলানি
কোহিলাওএ উহ তো কহো সুনি
শ্বাস হিলাওএ এহি সত বানি।
কেঁও হিলে ইহতে কহো হম শুনি
ইচ্ছা হেতু হিলে ইহ জ্ঞানি কি বাণি
শ্বাস কেঁও হিলে সে বর্ণো হম শুনি
হওয়া স্বভাবতঃ স্থির নহি জানি
ইহ শ্বাস নিকলা কহুঁসে ভুলানি
সূন্যসে নিকলা মায়া আয় মিলানি
নিকলেকা ক্যা কারণ কহহু জ্ঞানি
কর্ম্মফল ভোগ জন্য ভুলে ফিরানি
ইসলিএ কর্ম্ম ফলাফল ছোড়ানি
ধ্যান করো সদা ব্রহ্ম মন মিলানি
তব তদ্রূপ হোগে সৎনে বখানি
হরদম দেখে স্বরূপকে নিসানি
ইহ আনন্দ মূল জানে ব্রহ্মজ্ঞানি॥

* * * *

যোগিরাজ নিজে কখনও নাম-জপ বা কোন মন্ত্র-জপ করিতেন না এবং ভক্তদেরও তাহা দিতেন না। তিনি কখনও ফোঁটা তিলক কাটিতেন না,

সাধারণ বস্ত্রে থাকিতেন। তিনি এইসব স্থূল কর্ম্মের বা কোন রকম বাহ্যাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজে আত্মসাধনা করিতেন এবং শিষ্যদেরও তাহাই প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন ঐ সব করিয়া তেমন ফল লাভ হয় না। কারণ ঐগুলি দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। যাহা আত্মসাক্ষাৎকার করাইতে সক্ষম নহে তাহা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা কি প্রয়োজন? শ্রীমদ্‌ভাগবতও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
অহমুচ্চাবচৈদ্র ব্যৈঃ ক্রিয়য়াৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥[১]

অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ সর্ব্বভূতে সদা বিরাজমান। অজ্ঞানী মানুষ সেই আত্মাকেই অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমা অর্চ্চনাদির বিড়ম্বনা করে। যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ আমাকে (আত্মাকে) ত্যাগ করিয়া প্রতিমা অর্চ্চনা করে তাহার ভস্মে বৃথা আহুতি দেওয়ার ন্যায় সেই কর্ম্ম বৃথা হয়। আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত, ইহা না দেখিয়া যে লোক নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা জড় মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বুদ্ধিতে অর্চ্চনা করে, তাহার সেই অর্চ্চনাতে আমি প্রীত হই না।

তিনি বলিতেন মানব জন্ম দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। তাই এমন সাধনা করা উচিত যাহা দ্বারা ইহ জন্মেই জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে রেহাই পাওয়া যায়। সেজন্য তাঁহাকে কখনও উপবাস বা স্থূল পূজা করিতে দেখা যায় নাই। তিনি কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্য বৎসরে একদিন শিবরাত্রের দিন উপবাস করিতেন। বলিতেন আমি যদি না করি লোকে করিবে না। তাই বলিয়া তিনি কাটখোট্টা নীরস যোগীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজযোগী, প্রেম ও দয়ার মূর্ত্ত প্রতীক।

তিনি বলিতেন কোন দূর দেশে দুইদশ দিনের জন্য যাইতে হইলে অবশ্যই কিছু পাথেয় প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে কোথায় যাইবে, কোন্ জায়গায় থাকিবে, কতদিন থাকিবে এ সবই তোমার জানা। তবুও নির্দিষ্ট পাথেয় ছাড়া যাওয়া যায় না। কিন্তু যখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য অজানা

(১) শ্রীমদ্ভাগবৎ তৃতীয় স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় শ্লোক ২১, ২২, ২৪

পথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে তখন কত পাথেয় প্রয়োজন ? জাগতিক কোন বস্তুই তখন পাথেয় হইবে না। কোথায় যাইতে হইবে, কতদিন সেই অজানা প্রদেশে থাকিতে হইবে কিছুই জানা নাই। সেই পাথেয় ইহ জীবনেই যোগসাধন দ্বারা অর্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং সেই সাধনলব্ধ বিষয়ই সংস্কাররূপে একমাত্র পাথেয় হইবে। সেই পাথেয় নাশহীন। উহা যে জীবের সহিত গমন করে এবং পুনরাগমনে পুনঃপ্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে অভয় দিয়া ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি শ্রীমানদিগের গৃহে অথবা যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও ব্রহ্ম হইতে দূরে গতিরূপ যে দুর্গতি তাহা প্রাপ্ত হন না, অধোগত হন না। এই আত্মকর্ম্মরূপ শুভকর্ম্ম যিনি করেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ অভয় দিয়া বলিয়াছেন—"নহি কল্যাণকৃত কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"[১] এই আত্মসাধন দ্বারা যিনি নিজের কল্যাণ করেন তিনিই প্রকৃত কল্যাণকৃত। পঞ্চদশীকারও তাহাই বলিয়াছেন—

ইহ বা মরণে বাস্য ব্রহ্মলোকেঽথ বা ভবেৎ।
ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সম্যগুপাসীনস্য নির্গুণম্ ॥[২]

অর্থাৎ নির্গুণ উপাসকের ইহলোকেই হউক, পরলোকেই হউক অথবা ব্রহ্মলোকেই হউক, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার নিশ্চয় হয়, তাঁহার সে উপাসনার ফল কখন অন্যথা হইবার নহে।

তিনি ছিলেন এক মহান্ বীর সাধক। অলসতাকে বা পরে করিব এই মনোভাবকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। সারাদিন চাকরি করিয়া, সন্ধ্যায় ছাত্র পড়াইয়া, সংসারের নানাদিক্ সামলাইয়াও নানা জনহিতকর কাজেও লিপ্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ভক্তদের সহিত তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেন। তাহারই মাঝে প্রতিদিনের সাধন উপলব্ধি ছাড়াও জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই তিনি প্রতিদিন ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিতেন। প্রতিদিন বহু ভক্তের চিঠির উত্তর নিজের হাতে লিখিয়া দিতেন। এছাড়া কতলোকের কত সমস্যার সমাধান করিতে হইত। এতকিছু করিয়াও লোকচক্ষের অন্তরালে এমন সাধনা তিনি করিলেন যাহা

(১) গীতা ৬।৪০
(২) পঞ্চদশী ৯।১৫০

তাঁহাকে সাধনার সর্ব্বোচ্চস্থানে পৌঁছাইয়া দিল। ইহাতে বোঝা যায় তিনি কত মনোবলের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি ডায়েরিতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—**"অব রাতভর জাগনেকা এরাদা হোতা হয়।"** আবার লিখিয়াছেন—**"রাত মে নিদ কম আতা হয়—বড়া স্থির বড়া নেসা।"** ইহাতে বোঝা যায় ঐ সময় হইতে তিনি সারা রাত ধরিয়া যোগসাধন করিতেন এবং ক্রিয়ার নেশায় ভরপুর হইয়া সকল প্রকার গুণসঙ্গরাহিত্য অবস্থায় থাকিতেন। ঐ সময়ের মাত্র কয়েক মাস পর তিনি সেই সময়কার সাধনার অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—**"অগম পন্থমে পগ ধরা। ওহা ন মালুম স্বাসা আতা হয় ন মালুম জাতা হয় সংগ সবকা ছোড়ে। আউর ধ্বনিমুনে রাধাজিকা দর্শন ভয়া। অব অনমোল ধন মিলা।"**—যেখানে যাওয়া যায় না সেই অগম্য স্থানে অর্থাৎ স্থির ঘরে পাকাপাকি স্থিতি হইল। সে অবস্থায় শ্বাস আসিতেছে কি যাইতেছে কিছুই বোঝা যায় না অর্থাৎ 'কেবল কুম্ভক' প্রাপ্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয় সঙ্গ সহ সকল প্রকার গুণসঙ্গ বিবর্জ্জিত হইলাম। উপর হইতে অর্থাৎ সহস্রার হইতে নামিয়া আসা যে Sound Current অর্থাৎ নামধ্বনি তাহাতে রাধাজির দর্শন হইল। এবার অমূল্য ধন মিলিল। এইভাবে তিনি অনেক দেব-দেবীর ছবি আঁকিয়া এবং তাহার বর্ণনা দিয়া লিখিয়া রাখিতেন যাহা যাহা তাঁহার দর্শন হইত।

কিছুদিন পর আর এক জায়গায় অপর এক অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—**"বিলকুল বাহর কা স্বাসা বন্ধ হোতা হয়। ধন্য ভাগ উস্কা জিসকে ইহ হোয়।"**—বাহিরের আগম নিগমরূপ শ্বাস-প্রশ্বাস যাহা নাসাপথে অবিরাম চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। যাহার এমন অবস্থা হয় তাহার ধন্য ভাগ্য অর্থাৎ এই প্রকার স্থায়ী 'কেবল কুম্ভক' যাহার হয় তাহার ধন্য ভাগ্য। ইহাতে বোঝা যায় তিনি সাধন জীবন শুরু করিবার পর হইতে কোন প্রকার কালক্ষেপ না করিয়া কঠোর সাধনা করিয়া কত সত্বর সাধনার শিখরদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঠিক তাহার কয়েক দিন পরই লিখিয়াছেন—**"স শরীরমে সিধে জলকে উপর জানা কুছ কঠিন কাম নহি হয়, জব প্রাণায়াম করতে করতে প্রাণবায়ু রূক গয়া দোঘড়ি সে উপর তব যত্তে জল পর চাহে ওত্তে জলপর চলে জায় আউর যেত্তে দূর তক চাহে ওত্তে দূরতক—কেঁও কি জব জল স্থন্য ও সূর্য্য সব এক রূপ আউর হমভি ওহিরূপ তব বায়ুকে**

রোকনেকে ঘোর সহজে মে ইহ শরীর হলক করকে উজয় লে জায়—ইহ বাত তব হোতা হয় জব ‘কেবল কুম্ভক’ হোয়।” অর্থাৎ সশরীরে সোজা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যাওয়া কোন কঠিন কাজ নহে। যখন প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে প্রাণবায়ু থামিয়া যায় অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অন্ততঃ দুই দণ্ডের উপর থামিয়া যায় তখন যত গভীর জলের উপর দিয়া হউক অথবা যত দূরত্ব পর্য্যন্ত হউক হাঁটিয়া চলিয়া যায়। কারণ তখন জলতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব ও আত্মসূর্য্যতত্ত্ব সব একই রূপ এবং আমি নিজেও যখন সেই একই রূপ। অতি সহজে যখন প্রাণবায়ুকে বহির্গমন হইতে থামান যায় তখন এই শরীরকে হালকা করিয়া জলের স্রোতের গতির উল্টা দিকেও হাঁটিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। এই অবস্থা তখনই হয় যখন ‘কেবল কুম্ভক’ হয়।

ইতিহাস বলে, মাত্র কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য মহাযোগী ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নদী বা সমুদ্রের উপর দিয়া লীলাছলে হাঁটিয়া চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যেমন যীশুখৃষ্ট, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি। কিন্তু এই মহান গৃহিযোগী সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও নিজেকে কত গোপন ও সংযত রাখিতেন। যোগমার্গের এই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও তাহা কখনও প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের শাস্ত্রেও ঋষিগণ যোগমার্গের এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন—**“উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।”**[১] অর্থাৎ কণ্ঠস্থ উদান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে ঊর্দ্ধস্থ বায়ু রোধ হওয়ায় নিম্নস্থ বায়ু সকলও রোধ হয় এবং দেহ লঘু হইলে জল, পঙ্ক, কণ্টক প্রভৃতি স্পর্শ হয় না। তখন ঐ সকল পদার্থের উপর দিয়াও অনায়াসে যাতায়াত হয়। **“কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযম্যল্লঘুতলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্।”**[২] শরীর ও আকাশের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ যে তত্ত্বগুণ তাহাতে সংযম করিলে অর্থাৎ মূলাধার হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত বায়ু রোধ হইলে শরীর তুলার ন্যায় লঘু হয় এবং শূন্যে গমন করিবার শক্তি হয়। এই প্রকার ব্যক্তিকেই তত্ত্বজ্ঞ বলা হয়।

কেবল সাধনার উপলব্ধির বিষয়ই নহে, দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই তিনি অকপটে ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার ঐ দিনপঞ্জী-

(১) **পাতঞ্জল যোগসূত্র বিভূতিপাদ ৪০ সূত্র।**

(২) **পাতঞ্জল যোগসূত্র বিভূতিপাদ ৪৩ সূত্র।**

গুলি ছিল একান্ত গোপনীয়। তাঁহার জীবদ্দশায় ঐগুলি দেখিবার অধিকার কাহারও ছিল না। কিন্তু এই মহাপুরুষ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতিদিনের সাধনলব্ধ অনুভূতি সমূহ দিনলিপিগুলিতে লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা আর কোন মহাপুরুষ করিয়াছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এইগুলি এক অমূল্য সম্পদ।

তিনি যে কত সহজ সরল ও অকপট ছিলেন তাহা তাঁহার লেখা হইতেই বোঝা যায়। সাধন জীবনের প্রথম দিকে তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন—**"আজ কাম মুঝে আক্রমণ কিয়া।"** কখনও লিখিয়াছেন—**"কাম প্রবল হুয়া অব সামালনা চাহিএ।"** আবার লিখিয়াছেন—**"আজ কামসে চিত্ত চঞ্চল হুয়া।"** পুনরায় লিখিয়াছেন—**"কাম বড়া জোর কিয়া।"** আবার লিখিয়াছেন—**"কামদেব ফির জগা—আউর নিদ বহুত ঘেরা। আউর ভুক বড়া লগা।"** মানুষ কতখানি অকপটচিত্ত হইলে এই প্রকার কথা ডায়েরিতে লিখিতে পারেন! কারণ তখনই চিন্তা হইবে ঐ ডায়েরি তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের হাতে পড়িতে পারে। অতএব সকলেই এইসব কথা গোপন রাখেন। কিন্তু তাঁহার ডায়েরিগুলি দেখিলে বোঝা যায় তিনি জীবনের কোন কথাই গোপন না করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন এবং যাহা যাহা সাধনায় উপলব্ধি হইয়াছে সবই তিনি অকপটে নিঃশঙ্কচিত্তে ডায়েরিতে লিখিতেন। তিনি জীবনের কোন কিছুই অস্বীকার করেন নাই। এইভাবে শেষে তিনি এক কামজয়ী সত্ত্বাদিগুণাসঙ্গবিবর্জ্জিত মহাযোগীতে পরিণত হইয়াছিলেন।

কাম একটি দেহধর্ম্ম। শরীরে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ ঐ দেহধর্ম্ম থাকিবেই তা সে যত বড় মহামানবই হোক না কেন। প্রাণ স্থির হইলে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্থির হইলে কাম সহ কোন প্রকার দেহধর্ম্ম থাকে না। তখন তাঁহার দেহ থাকা সত্ত্বেও কামজয়ী হইয়া সকল প্রকার দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন। যোগিরাজেরও তাহাই হইয়াছিল।

তাঁহার ২৭ বছরের সাধন জীবনে অতি সত্বর সাধনার শীর্ষদেশের দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাই তিনি কখনও লিখিয়াছেন—**"আজ সোনেকা কালীসে ভেট হুয়া"**—আজ সোনার কালী দেখিলাম। কখনও লিখিয়াছেন—**"ছিন্নমস্তা রূপ দেখা"** ছিন্নমস্তা রূপ দেখিলাম। এই ছিন্নমস্তা হইল উগ্র বিশ্বপালিকা শক্তির প্রতীক। এক জীব অপর জীবকে

আহার করিয়া পুষ্ট হয় অর্থাৎ নিজের মুণ্ড কাটিয়া নিজেই রক্তপান। কারণ সবই সেই এক স্থির প্রাণ হইতে জাত। আধারের পার্থক্য হেতু স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ এক জীব অপর জীবকে আহার করা মানে নিজেই নিজেকে ভক্ষণ করা, প্রাণ প্রাণকেই ভক্ষণ করা। কারণ যে ভক্ষণ করিতেছে ও যাহাকে ভক্ষণ করিতেছে উভয়ই এক। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ রক্তের এই তিনটি ধারার লয় প্রাপ্তি। সাধনা করিতে করিতে সমস্ত প্রকার ভোগের অবসান মুখে যোগীর এই ভয়ঙ্করী ভীষণা ভাবটি প্রকাশিত হয়। প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে মুখ্য প্রাণবায়ু স্থির হইয়া, সুষুম্নাবাহী হইয়া কূটস্থে সম্পূর্ণরূপে স্থিতিপ্রাপ্তি ঘটিলে যোগীর সমস্ত প্রকার ভোগের অবসান হইয়া গিয়া যে অবস্থার উদয় হয় তাহাই ছিন্নমস্তা। এইভাবে কোন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ও কিভাবে সাধনা করিলে এক এক চক্রের অভ্যন্তরস্থ ভাবটিকে পাওয়া যায় তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বা নক্সা সকল সুকৌশলে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তির মাধ্যমে ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা যোগীদের অনুভব গম্য। যেমন কালীর ১০৮ মুণ্ডমালা হইল সাধকের মনের ১০৮ পশুবৃত্তি নিধনের প্রতীক। বহির্ম্মুখী জিহ্বা হইল অন্তর্মুখে খেচরী মুদ্রার প্রতীক। হস্তে খড়্গ হইল অজ্ঞান নিধনের প্রতীক অর্থাৎ জ্ঞানখড়্গ। এইভাবে সমস্ত দেব-দেবী তত্ত্ব নিজ দেহের অভ্যন্তরে নিহিত জানিতে হইবে।

কখনও তিনি লিখিয়াছেন **"সূন্য ব্রহ্ম নজর পরা"**—শূন্য ব্রহ্ম দেখিলাম। কখনও লিখিয়াছেন **"ব্রহ্ম সাফ দর্শন হোনে লগা"**—ব্রহ্ম পরিষ্কার দর্শন হইতে লাগিল। কখনও লিখিয়াছেন—**"জো ব্রহ্ম সোই সূন্য সোই সূর্য্য জ্যোতি"**—যিনি ব্রহ্ম তিনিই শূন্য তিনিই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি। কখনও লিখিয়াছেন—**"ওঁ- নির্ম্মল ভিতর সূন্য—একঠো আদমি আপনে মাফিক বইঠা দেখা"**—ওঁকারের ভিতর নির্ম্মল অর্থাৎ পরিষ্কার স্বচ্ছ শূন্য—আপন স্বরূপের মত একজনকে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। আবার লিখিয়াছেন—**"এহি ইলাহী ইল্লিলা"**—ইনিই মহান আল্লা। কখনও লিখিয়াছেন—**"এহি আপনা রূপ হয়, ফির এহি নিরাকার ব্রহ্ম ওঁকার হয়"**—ইহাই নিজের স্বরূপ, যাহা নিজের স্বরূপ তাহাই ওঁকাররূপ নিরাকার ব্রহ্ম। এখানে তিনি নিজে এবং ব্রহ্ম সব মিলিয়া একাকার হইয়া গেলেন, তাঁহার জীব-ভাবের লয় প্রাপ্তি ঘটিল, অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহা যোগীর এক চরম অবস্থা। এই অবস্থায় আর দুই বলিবার কেহ থাকে না। তাই তিনি বলিতেন যতক্ষণ দুই দেখ তাহা নিকৃষ্ট। আর একটি চরম কথা লিখিয়াছেন—

"রাতদিন জব রোধ শ্বাসাকা হোগা তব রামনাম কো পাওএগা, আউর সব সিদ্ধ হোগা ." ইহাতে যোগিরাজ বলিতেছেন চিৎকার করিয়া রামনাম করিলে কি হইবে ? যখন আত্মকর্ম্ম করিতে করিতে সব সময়ের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের বহির্গতি রোধ হইয়া যাইবে তখনই প্রকৃত রামনামকে পাইবে এবং তখন সব সিদ্ধ মুক্ত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ জীব বাহিরের শব্দকেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোনে, অন্তরের অন্তস্থলের শব্দ শুনিতে পায় না, কারণ সেখানে ইন্দ্রিয়দের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। উহা অনাহত বা ওঁকার ধ্বনি যাহা জীব হৃদয়ে সর্ব্বদাই হইতেছে। কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। বায়ু-ক্রিয়ারূপ আত্মকর্ম্ম করিতে করিতে যখন প্রাণবায়ু স্থির হইয়া যাইবে তখন সেই আত্মারামের অনির্ব্বাণ নাম-প্রবাহ বা sound current কে ধরিতে পারিবে বা শুনিতে পাইবে। তখনই প্রকৃত সংকীর্ত্তন হইবে। মুখে চিৎকার করিবার প্রয়োজন নাই। সে অবস্থায় জিহ্বা, ওষ্ঠ, চক্ষু, মন ও প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে, কম্পনহীন হইবে। সে অবস্থায় মুখে সংকীর্ত্তন করিবে কে ? ইহাই মুখ্য সংকীর্ত্তন। চিৎকার করিয়া যে সংকীর্ত্তন তাহা গৌণ সংকীর্ত্তন। গৌণ সংকীর্ত্তনের সহিত যদি সুর তাল বাদ্য না থাকিত তাহা হইলে উহা কেহই করিত না। চিৎকার করিয়া সংকীর্ত্তন করিলে বা বাহিরে খুঁজিলে যে আত্মারামকে পাওয়া যায় না সে বিষয়ে মহাত্মা কবীর দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন—

কবির আখড়িয়া ঝাঁই পড়ি, পন্থ নিহারি নিহারি।
জিভড়ি আঁছালা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি ॥

অর্থাৎ কবীরদাস বলিতেছেন রাস্তা দেখিতে দেখিতে চক্ষুতে দিশা লাগিয়া গিয়াছে অর্থাৎ কিছুই দেখিতে পাই না, আর রাম রাম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে করিতে জিহ্বাতে ফেনা পড়িল।

এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁহার ডায়েরিতে একটি সুন্দর কথা লিখিয়াছেন— **"বাজাসে জব জানয়র মস্ত হোয় তব আদমি ওঁ মে ন মস্ত হোয় তো গধা হয়।"** অর্থাৎ সাধারণ বাজনা শুনিয়া জন্তু জানোয়ারেরাও মত্ত বা মোহিত হয়, কিন্তু নিজ দেহস্থ ওঁকার ধ্বনি শুনিয়াও মানুষ যদি মোহিত না হয় তাহা হইলে সে গাধা। অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনি শুনিতে যদি কাহারও ইচ্ছা না জাগে তবে তাহার মনুষ্য জীবন বৃথা হয়! গর্দ্দভ যেমন নিজে পশু হইয়াও অন্য পশুর জন্য ঘাস বহিয়া মরে কিন্তু তাহার নিজের ভাগ্যে জোটে না, তদ্রূপ

যে ব্যক্তি ওঁকার ধ্বনি শুনিতে চাহে না সে লোকও ঐ গাধার মত কেবলই পণ্ডশ্রম করিয়া মরে। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে।
পশ্যন্নপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোঽপরোঽস্মাৎ পশুর্বদ ॥[১]

অর্থাৎ আত্মাতে যে অনাত্মজ্ঞান বোধ হয় তাহা ধ্যান দ্বারা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান না করে, তাহা অপেক্ষা পশু আর কে আছে?

নাম ধরিয়া ডাকিলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? এক ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে যোগিরাজ বলিলেন—নাম ও রূপ দেহের বা কোন বস্তুর হয়, ঈশ্বরকে কি নাম ধরিয়া ডাকিবে? তিনি ত নাম ও রূপের অতীত। দেহের নাশ আছে, অতএব নাম ও রূপেরও নাশ আছে। কিন্তু যিনি ঈশ্বর, তিনি উৎপত্তিহীন এবং অবিনাশী। ঈশ্বর কি দূরের বস্তু? তিনি কি তুমি ছাড়া যে তাঁহাকে চিৎকার করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে? লোকে দূরের বস্তুকেই নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া ডাকে। তাঁহা অপেক্ষা নিকটে আর কে আছেন? তিনি ত তোমার হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে ডাকিবে? যেমন 'ঈশ্বর' শব্দে ডাকিতে হইলেও দেহে প্রাণ চঞ্চলরূপে থাকা চাই। প্রাণ চঞ্চলরূপে দেহমন্দিরে না থাকিলে ওষ্ঠ ও জিহ্বার সাধ্য নাই ঈশ্বরকে 'ঈশ্বর' বলিয়া ডাকিতে। সুতরাং ঈশ্বরকে ডাকিতে হইলেও দেহে প্রাণ চঞ্চলরূপে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু স্থির প্রাণে কোন কর্ম্ম নাই। ঈশ্বর শব্দ ঈশ্বর নহে, হরি শব্দও হরি নহে, যেমন জল শব্দ জল নহে। জল শব্দ যদি জল হইত তাহা হইলে জল জল করিয়া চিৎকার করিলে পিপাসা দূরীভূত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব হরি হরি করিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিলেও তাঁহাব সাড়া পাওয়া যাইবে না। হরি অর্থাৎ যিনি সবকিছু হরণ করেন, যেখানে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সঙ্গ নাই। প্রাণ স্থির হইলে অর্থাৎ চঞ্চল অবস্থার অবসানে সবকিছু হরণ হইয়া যায়, জীবের জীবভাব ঘুচিয়া যায়, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাই সেই স্থির অবস্থাই হরি পদবাচ্য। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"দর্পণকে ভিতর জো নদী উসসে পিয়াস নহি জাতা।"**

(১) **পঞ্চদশী** ৯।১৫৬

কোন ব্যক্তি কি নিজেই নিজের নাম ধরিয়া কখনও ডাকে? তাহার ডাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণ স্বয়ংই যখন ঈশ্বর, তখন প্রাণকে প্রাণ কেমন করিয়া ডাকিবে? ডাকিবার প্রয়োজনই বা কি? কারণ ডাকিবার কর্ত্তাও তিনি, আবার যাহাকে ডাকিবেন তাহাও তিনি। দুই কোথায়? এই প্রাণরূপী ঈশ্বর সকল জীবদেহে স্থিররূপে বর্ত্তমান। কিন্তু জীব চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সংজ্ঞাচ্যুত হইয়া আপন স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাই সকলের উচিত প্রাণকর্ম্মের দ্বারা চঞ্চলতার অবসান ঘটাইয়া স্থির প্রাণরূপ স্বসংজ্ঞাকে পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থা হইতে স্থির অবস্থায় রূপান্তর ঘটানো।

(সকলে যখন ঈশ্বরোদ্দেশে প্রণাম করে তখন তাহারা দুই হাত জোড় করিয়া দুই ভ্রূর মাঝে কপালে ঠেকায়। অজ্ঞতা বশতঃ না জানিয়া সকলেই এই প্রকারে কূটস্থকেই প্রণাম করে। প্রকৃত-প্রস্তাবে বাহিরের কোন দেব-দেবীকে কেহই প্রণাম করে না, কারণ সকল দেব-দেবীর অবস্থানস্থলই ঐ কূটস্থ। কূটস্থকে প্রণাম না করিয়া উপায় নাই, তাঁহাকে প্রণাম করিলেই সকল দেব-দেবীকে প্রণাম করা হয়। তাই দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই ধ্যানমগ্ন, তাঁহারাও কূটস্থকে প্রণাম করিতেছেন।)

আরও দেখা যায়, চলতি কথায় সকলেই বলিয়া থাকে 'আমার বাড়ি'। অর্থাৎ বাড়িটা আমি নহি, সেখানে আমি বাস করি মাত্র। তেমনি বলিয়া থাকে 'আমার দেহ'। এই সাধারণ চলতি কথাতেই বোঝা যায় যে দেহটা আমি নহি, সেখানে আমি বাস করি মাত্র। এই দেহের ভিতরে এক আমিরূপ পৃথক সত্তা বর্ত্তমান; যাহা প্রকৃত আমি-পদবাচ্য। সেই আমিই প্রকৃত আমি। সেই প্রকৃত আমি না থাকিলে বর্ত্তমান আমি নাই। সেই আমিই আত্মা, সেই আমিই ঈশ্বর, সেই আমি জন্ম মৃত্যু রহিত, অবিনাশী। সেই 'আমি' আবার 'বর্ত্তমান আমিকে' কেমন করিয়া ডাকিবে? ডাকিবার প্রয়োজনই বা কি? কেবল নিজেকে নিজে জানিবার চেষ্টা কর, তাহাই সাধনা। যখন নিজেকে নিজে জানিবে, তখন সব পাশ মুক্ত হইয়া নিজেই শিব হইয়া যাইবে। এইভাবে নিজেকে নিজে জানাই মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা।

তাঁহার কি প্রকারেই বা স্তুতি করিবে? স্তুতি ত প্রশংসা বা তোষামোদের সামিল। তিনি কি তোমাদের মত তোষামোদপ্রিয়? তিনি কখনও তোষামোদ চান না, ভক্তকে নিজের মত করিয়া লন,

স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তাঁহাকে পাইতে হইলে নিশ্চল সমাহিত হইতে হইবে। কারণ নিশ্চল অবস্থা বা চঞ্চলতা রহিত অবস্থা বা স্থিরত্বই ব্রহ্ম। অতএব প্রাণকর্ম্মের দ্বারা নিশ্চল হইবার চেষ্টা কর, তাহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। তখন তুমি নিজেই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। যে কর্ম্ম তোমাকে সেই নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয় তাহাই সাধন, তাহাই কর্ম্মযোগ। সেই কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর, অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ সেই আত্মকর্ম্মরূপ নিষ্কাম সাধন কর তাহা হইলে সব পাইবে। তাই ক্রিয়া সত্য আর সব মিথ্যা। **"পুরা সাসমে পিয়া আপনা খোঁজ করে ভাই। জন্ম জন্মকা সংসার তুমহারা সবে ছুট জাই।"**—এক গেলাস জল পান করিলে তাহা ভিতরে চলিয়া যায়, বাহিরে আর যেমন দেখা যায় না, তেমনি প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে বহির্ম্মুখী শ্বাস সম্পূর্ণ অভ্যান্তরমুখী হইয়া স্থির হইয়া যায়, কেবল-কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে শ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে পান করিয়া (কেবল-কুম্ভক অবস্থায়) তারপর নিজেকে খোঁজ কর অর্থাৎ শ্বাসের ঐ স্থির অবস্থার মধ্যেই নিজের প্রিয়তম আছেন, তাঁহাকে পাইলেই অর্থাৎ ঐ স্থির অবস্থাকে পাইলেই জন্ম জন্মান্তরের সংসার বাসনা ঘুচিয়া যাইবে, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ চলিয়া যাইবে।

জিহ্বা স্বয়ং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত যে সংকীর্তন তাহা গৌণ সংকীর্তন। তাই তিনি বলিতেন অবশ্য যাঁহারা মুখ্য সংকীর্তনের সন্ধান পান নাই তাঁহাদের গৌণ সংকীর্তন করা ভাল। এইভাবে গৌণ সংকীর্তন করিতে করিতে জীব ক্রমে শুদ্ধ হইবে, তাহার মনে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিবে। তারপর আপনা আপনি সময় আসিবে যখন গুরুকৃপায় মুখ্য সংকীর্তনের হদিস পাইবে অর্থাৎ সদগুরুপদিষ্ট প্রাণকর্ম্মরূপ সাধন পাইবে, তখন তাহার আর গৌণ সংকীর্তনের প্রয়োজন থাকিবে না। তাই তিনি বলিতেন সৌভাগ্যবশে যাঁহারা আত্মকর্ম্মরূপ সাধন অর্থাৎ সংকীর্তনের পথ পাইয়াছেন তাঁহাদের গৌণ সংকীর্তন বা বাহ্যপূজার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা দেহের ভিতরেই তখন সবকিছু জানিতে বুঝিতে ও দেখিতে পান। শাস্ত্রও সেই কথা বলিয়াছেন—

দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥[১]

সকল বিদ্যা, সকল দেবতা এবং সকল তীর্থ এই দেহমধ্যে বর্ত্তমান,

(১) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

যাহা গুরুবাক্যে ষট্‌চক্রপথে জানা যায়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ইহাই ত্রিপাদ। এই দেহেই স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালরূপ ত্রিলোক অবস্থিত। নাভি হইতে নীচে পাতাল, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মর্ত্ত এবং তদূর্দ্ধে স্বর্গ)

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি॥
নিরাকারং মনো যস্য নিরাকারসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাকারন্তু পরিত্যজেৎ॥[১]

অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই এই দেহমধ্যে আছে। সাকারের বিনাশ আছে, নিরাকারের বিনাশ নাই। নিরাকার মনে শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায়। অতএব সাকারকে অস্থায়ী জানিয়া সর্ব্ব রূপ অর্থাৎ সাকারকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিবে।

মন্ত্র পূজাতপোধ্যানং
হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াম্।
সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি
লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ॥[২]

মন্ত্র জপ বাহ্যপূজা তপস্যা হোম বলিদান সন্ন্যাস গ্রহণ ইত্যাদি যত প্রকার লৌকিক ধর্ম্মকর্ম্ম জগতে প্রচারিত আছে জ্ঞানিগণ অকপটে সব পরিহার করেন।

এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগরের রাজা এক বৃহৎ জলাশয় স্থাপন করিবার জন্য খনন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু কোন প্রকারেই জলাশয়ে প্রচুর জল উঠিতেছে না দেখিয়া পণ্ডিতদের নিকট বিধান চাহিলেন। পণ্ডিতগণ বিধান দিলেন যে নরবলি প্রদান করিলে প্রচুর জল উঠিবে। রাজা সেইমত রাজ্যে ঘোষণা করিলেন প্রচুর ধনরত্নের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কেহ যদি কোন শিশুপুত্রকে প্রদান করে।

ঐ ঘোষণা শুনিয়া এক গরীব ব্রাহ্মণ ভাবিলেন তাঁহার অনেকগুলি পুত্রসন্তান আছে। অনাহারে সকলেরই ক্রমে ক্রমে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা এক পুত্রকে দান করিলে যে প্রচুর ধনরত্ন পাওয়া যাইবে তাহাতে পরিবারের অপর সকলের জীবন রক্ষা হইতে পারে। তাই তিনি এক শিশুপুত্রকে রাজার নিকট অর্পণ করিলেন।

---

(১) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।
(২) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

রাজা ঐ শিশুপুত্রকে লইয়া জলাশয়ের নিকট বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, তোমার শেষ ইচ্ছা কি?"

শিশুপুত্র বলিল—"আমার কোন ইচ্ছা নাই, থাকিলেও আপনার নিকট বলিয়া লাভ নাই।"

রাজা বলিলেন—"আমি রাজা, তোমার শেষ ইচ্ছা থাকিলে বলিতে পার, আমি তাহা পূরণ করিব।"

শিশুপুত্র বলিল—

"মাতা-পিতা ধনকি লোভি
রাজা লোভি সাগরা
দেবী-দেবতা বলিকে লোভি
মম শরণাগতি মাধবা।"

উদ্ধত খড়্গ নামিয়া আসিল। জলাশয়ে এত জল উঠিতে লাগিল যে নগর ভাসিয়া যায়। এই অবস্থা দেখিয়া রাজা পুনরায় পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই প্রচুর জল হইতে নগরকে বাঁচাইবার উপায় কি?"

পণ্ডিতগণ বলিলেন—"ঐ বালককেই জিজ্ঞাসা করুন, ঐ রক্ষা করিতে পারিবে।"

ভক্ত বালক শ্রীমাধবের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল—"প্রভু, এরা চাইতে জানে না; এদের তুমি রক্ষা কর।"

তারপর প্লাবন কমিল।

সাকার পূজার গুহ্যতম রহস্য সম্বন্ধে ভক্তদের শিক্ষা দিতে গিয়া তিনি বলিতেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির দিকে দেখ, ঋষিগণ এই যোগসাধন তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে বুঝাইবার জন্য কত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবানের হস্তে একটি বংশী, উহাতে ছয়টি ছিদ্র। উহা ষট্‌চক্রের প্রতীক। উপরদিকে আর একটি ছিদ্র, উহা সহস্রারের প্রতীক। ঐ বংশীকে ফুঁ দ্বারা বাজাইতেছেন, অর্থাৎ ষট্‌চক্রপথে অন্তর্মুখী বায়ু-ক্রিয়ারূপ প্রাণকর্ম্মের প্রতীক। এই প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে কুটস্থ দর্শন হয়, তাই তাঁহার মস্তোকপরি ময়ূরপুচ্ছ। উহাতে যে চক্ষু লক্ষিত হয় তাহাই কুটস্থের প্রতীক। ভগবান্ ত্রিভঙ্গমুরারিরূপে দণ্ডায়মান, উহা জিহ্বাগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি ও মূলাধারগ্রন্থি যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদের প্রতীক। বাম পদের উপর ভর করিয়া দক্ষিণ পদ হেলাইয়া দণ্ডায়মান, উহা ওঁকারক্রিয়ার প্রতীক। এইরূপে ভগবানের

মূর্ত্তির মধ্যে সম্পূর্ণ যোগতত্ত্ব বর্ত্তমান জানিবে। এইপ্রকারে যিনি কৃষ্ণকে ভজনা করেন তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণ-ভজনাকারী। আবার মাতুর্গার দশটি হাত। উহা দ্বারা দেখাইতেছেন যে সাধক তাঁহার দশ ইন্দ্রিয় বা দশ প্রাণকে কি ভাবে সংযত রাখিতেছেন। দশ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রাণ বা দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় সমস্ত কর্ম্ম সাধিত হয়। তাঁহার পদতলে পশুরাজ সিংহ, তাহাকে তিনি দলন অর্থাৎ দমন করিয়া রাখিয়াছেন। উহা কামের প্রতীক। উহাকে একেবারে হত্যা করেন নাই, কারণ তাহা হইলে সৃষ্টি বজায় থাকিবে না, কিন্তু উহাকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অসুরকে বধ করিয়াছেন। অসুর হইল ক্রোধের প্রতীক। সাধকের উচিত ক্রোধকে হত্যা করা। পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার বাহন পেচক। সাধকের সাধনা করিতে করিতে যখন লক্ষ্মীলাভ অবস্থা হয় তখন তাঁহাকে সাবধান করা হইতেছে যে যেন তাঁহার তখন পেচকের অবস্থা না আসে। পেচক দিবান্ধ এবং নিশাচর। অর্থাৎ হে সাধক সাবধান থাকিবে, ধনলাভ হইলে তোমার পেচকের অবস্থা আসিতে পারে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই কবিরদাস বলিয়াছেন—

কনক কনক তে শওগুণী মাদকতা অধিকায়।
ইয়ে খায় বউরাত হ্যায় উহ পায় বউরায়॥

কনক অর্থে ধুতূরা বা সোনা। ধুতূরা খাইলে মানুষ পাগল হয়, কিন্তু সোনা অর্থাৎ অর্থ পাইলেই মানুষ পাগল হয়; খাইবার আবশ্যক থাকে না। উহার মাদকতা এতই অধিক।

অপর পার্শ্বে সরস্বতী দেবী, তাঁহার বাহন হংস। হংসের কাজ নীর ও ক্ষীর একত্রে থাকিলে তাহা হইতে ক্ষীরকে বাহির করিয়া লওয়া। সাধক যখন সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করেন তখন তাঁহার সঠিক জ্ঞান লাভ হওয়ায় ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি তখন মলিন জগৎ-সংসার হইতে সারবস্তু বাছিয়া লইতে সক্ষম হন। এই অবস্থাকেই পরমহংস অবস্থা বলা হয়। কিন্তু সাধককে আরও অগ্রসর হইতে হইবে, কারণ তখনও তাঁহার অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠালাভ হয় নাই। পার্শ্বে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। উহা বীরত্বের প্রতীক। সাধককে বীরত্বের সহিত সাধনা করিতে বলা হইতেছে। তাঁহার বাহন ময়ূর। ময়ূরপুচ্ছে যে চক্ষু লক্ষিত হয় উহা কূটস্থের প্রতীক। সাধক বীরবিক্রমে সাধনা করিতে থাকিলে অবশ্যই কূটস্থ দর্শন হইবে।

তাঁহার হস্তে তীর-ধনুক। শর অর্থে বাণ বা শ্বাসকে বুঝায় এবং ধনুক অর্থে দেহকে বুঝায়। এই দেহের ভিতরে শররূপ শ্বাসকে যিনি চালনা করেন অর্থাৎ বীরত্বের সহিত বায়ুক্রিয়ারূপ প্রাণকর্ম্ম করেন তিনিই কার্ত্তিকেয়। এত কষ্ট করিয়া সাধক সাধনা করিলেন, তাই তাঁহার সিদ্ধি বা মুক্তি চাই। সেজন্য সিদ্ধিদাতা গণেশ। কিন্তু তাঁহার বাহন মূষিক। মূষিকের ধর্ম্ম অকারণে অনিষ্ট করা। তাই সেই অবস্থায় যেহেতু সাধক তখনও অদ্বৈতে পূর্ণরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই সেহেতু তাঁহাকে তখনও অনিষ্টকারী হইতে দূরে থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে সিদ্ধি বা মুক্তি তাঁহার করতলগত হইবে না। সবার উপরে আছেন শিব, তিনি ব্যোমতত্ত্ব। তিনি বিশ্বনাথ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার থাকিবার স্থান নাই। অর্থাৎ সাধক যখন পূর্ণরূপে ব্যোমতত্ত্বে অর্থাৎ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন তখন তাঁহার এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় আর নিজের বলিতে কিছু থাকে না। তাঁহার বস্ত্র নাই, ভস্ম মাখিয়া বসিয়া আছেন অর্থাৎ সাধকের সর্ব্ববিষয়ে ঐ প্রকার ত্যাগ আসিয়া থাকে। তাঁহার হস্তে ডমরু; উহার দুই দিক্ হইতে সমান বাদ্য ধ্বনি ওঠে। উহা ওঁকার ধ্বনির প্রতীক। সাধক ওঁকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তন্ময় প্রাপ্ত হইয়া উহার সহিত একীভূত হইয়া যান। তাঁহার অপর হস্তে ত্রিশূল, উহা সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের প্রতীক। অর্থাৎ সাধকের ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভের প্রতীক। তাঁহার কোমরে গলায় সর্প। সর্প হিংসার প্রতীক। সাধক তখন হিংসা সহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া পূর্ণরূপে অহিংস অবস্থা লাভ করিয়াছেন। সেই শিবের বাহন বৃষ। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। বৃষের চারিটি পা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ; ধর্ম্মের এই চতুষ্পদের প্রতীক।[১] শিব অর্থাৎ শূন্যতত্ত্ব। এই

(১) চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে॥ (ইতি মনুরহস্য ১।৮১)।

অর্থাৎ ধর্ম্ম চারি পাদে বিভক্ত—১ম পাদ জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ, ২য় পাদ হৃদয়গ্রন্থিভেদ, ৩য় পাদ নাভিগ্রন্থি ভেদ এবং ৪র্থ পাদ মূলাধারগ্রন্থি ভেদ, ধর্ম্মের এই চারি পাদ; সকল, স—সর, দন্ত্যসকারের মত শব্দ করা, ক—মস্তক, ল—ব্রহ্মে জোর অর্থাৎ সশব্দে মস্তক হইতে জোর দিয়া ক্রিয়া করা; সত্য অর্থাৎ কূটস্থ, পরে একাকার, তারপরে বিজ্ঞান এবং সকলের শেষে সমাধি। তখন মনেতে মন মিশিয়া যায়। এই চারিপ্রকার সত্য যোগে ব্রহ্মস্বরূপ বোধ হয়। না ধর্ম্মে—অধর্ম্মেতে, আগম—স্থিতি, কশ্চিৎ—কখনই হয় না, পুরুষ—শ্রেষ্ঠ কূটস্থদর্শীরা যাহা দেখিতেছেন। অর্থাৎ অধর্ম্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যতিরেকে কূটস্থে স্থিতি কখনই হয় না যাহা শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াবানেরা দেখিতেছেন।

প্রকারে সাধক শূন্যতত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করেন। শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে, এই কিছুই নহে অবস্থাই ব্রহ্ম।) এই প্রকারে সমস্ত দেব-দেবী তত্ত্বকে জানিয়া সাধনা করিলে তবেই সিদ্ধি বা মুক্তি আসিবে। যোগিরাজ বলিয়াছেন—"**হৃদয়মে জব অপান বায়ু আওএ দশ প্রকারকে অনহদ সুনাওএ—চিঁ, চিঁ চিঁ, ক্ষুদ্র ঘণ্টা, সংখ, বিন্, তাল, মুরলী, পখাওজ, নঘবত, দীর্ঘ-ঘণ্টা।**" বাহিরের স্থূল পূজায় যত প্রকার বাদ্য বাজান হয় উহা সবই এই অন্তর্বাদ্যের প্রতীক। যোগিগণ ইহা শ্রবণ করেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"**কাঁশরকা আওয়াজ হুয়া—গলেমে চিনিকে মাফিক মিঠা মালুম হুয়া—আঁখকে সামনে বিজলি চমকেনে লগা—ওঁকারকা ধ্বনি বহুত দেরতক সুনা।**"—কাঁসরের আওয়াজ হইল, গলার মধ্যে চিনির মত মিষ্টি স্বাদ পাইলাম, চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, ওঁকার ধ্বনি দীর্ঘ সময় শুনিলাম। আবার লিখিয়াছেন —"**রগকে দোনো নেসতরকে এক আবজ নিকসতা উছিকা নাম অনহদ বাজা উচছে ছোটা বায়া যোকী উপরকে কোটিছে গাবাপর চড়্কে মালুম হোতা হেয় হামেসা যেসা সানাইকা সুর দেতে হেয় উচছে কুছ কম আউর আওয়াজ হেয় ইহ মালুম হোতা হেয় কি বহুতছে আদমি ইস্ত্রোএকা কাঁষর ঘণ্টা বাজায় রহে। বড়া ঘণ্টাকা আওয়াজ সিরকে ভিতর পিছে মালুম হুয়া।**" অর্থাৎ রগের দুই দিক্ হইতে এক ধ্বনি নির্গত হইতেছে যাহার নাম অনাহত ধ্বনি। উহা অপেক্ষা সামান্য শব্দ যাহা উপরের ঘরের গবাক্ষ মধ্য হইতে আসিতেছে, বুঝিলাম যাহা সানাইয়ের সুর অপেক্ষা কিছু কম শব্দ হইতেছে এবং মনে হইল একসাথে অনেকগুলি মানুষ কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতেছে। বৃহৎ ঘণ্টার ধ্বনি মস্তকের ভিতর পিছন দিকে শুনিলাম। যোগিরাজ বলিয়াছেন—"**বৃষাকারকে উপর মহাদেব চঢ়নে গএ আউর ক্যা বাহন প্রথিবি নহিথা—বৃষাকার য়ানে ইহ শরীররূপি বৃষ ইসকা দুই সিং প্রাণায়ামকে হওয়া সে নিকসতা হয় —আউর কাম বর্জিত হোতা হয় ইসলিএ ইহ শরীরকো বএল কহতে হয় ইসিকে উপর মহাদের হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম।**"—বৃষের উপর মহাদেব চড়িতে গেলেন, কিন্তু কেন? পৃথিবীরূপী বাহন কি ছিল না? বৃষ অর্থে এই শরীর যাহার দুইটি সিং আছে, প্রাণায়ামের সময় বাহির হয় অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলারূপী দুইটি সিং। এই ইড়া-পিঙ্গলার কর্ম্ম করিলে কামবিবর্জ্জিত অবস্থা লাভ হয়। ইহা এই শরীরেই আছে, তাই এই

শরীরকে বৃষ বলা হয়। এই শরীরেই মহাদেব আছেন অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপী ব্রহ্ম। দিব্ শব্দে আকাশ। মহাদেব অর্থে মহান্ আকাশ অর্থাৎ স্থির মহাশূন্য যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।

যোগিরাজ তাঁহার ডায়েরিতে সাধনার আর এক চরম উপলব্ধির কথা লিখিয়াছেন, যে উপলব্ধি পুরাকালে ঋষিদেরও হইয়াছিল। যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"আদি পুরাণ কিমুণ জি সে ভেট হুয়া।"** আদি পুরাণ কৃষ্ণের দেখা পাইলাম। আবার লিখিয়াছেন—**"আদি পুরুষসে ভেট, জিভ আউর আগে জায় কে ঠহরা, শুণ্য ভবন মে মন গয়া।"** অর্থাৎ আদি পুরুষের সহিত মিলিত হইলাম। জিহ্বা আরও উপরে উঠিয়া থামিল। এই প্রকার খেচরী সিদ্ধ অবস্থা যখন হইল তখন শূন্যের ঘরে মন প্রবেশ করিল। শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে। সেই কিছুই নহে অবস্থায় অর্থাৎ বিনা অবলম্বনে নিরাকার নির্গুণ অবস্থায় মনের স্থিতি অবস্থা লাভ হইল। "কেবল কুম্ভক" হইলে এই অবস্থা হয়, ইহাকে খেচরী সিদ্ধিও বলে। এই শূন্য অবস্থাকেই তিনি আবার বলিয়াছেন—**"সূন্য আসল চিজ হয়, স্বাসা ভিতর ভিতর চলতা হয়।"** সেই শূন্যই আসল অর্থাৎ ব্রহ্ম, কারণ সেখান হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি ও সেখানে লয় হয়। তিনি আবার লিখিয়াছেন—**"সূর্য্য সূন্য হয় সূন্যমে মিলজানা হয়।"** সেই আত্মসূর্য্যই শূন্য, সেই শূন্যতে মিলিয়া যাইতে হইবে, লয় হইতে হইবে। **"হমহি আসমানকা সূর্য্যরূপ—হম ছোড়ায় দুসরা ন কোই নহি উহ কহতা হয় সব ছোড়ায়কে বইঠো—এক মজা মৈথুনকা পএরসে সিরতক হোত হয়। যো সূন্য ভিতর সোই বাহর। অব শিরফ সূন্য হোজানা হয়"**—আমিই সেই মহাশূন্যের আত্মসূর্য্য রূপ। সেইখানে আমি ছাড়া আর কেহ নাই, সোঽহং। ভিতর হইতে আদেশ হইতেছে যে এখন ইন্দ্রিয় সঙ্গ সহ সবকিছু ছাড়িয়া দিয়া চুপচাপ ধ্যানমগ্ন বসিয়া থাকি। এই অবস্থায় মৈথুনের মত এক আনন্দ পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত হইতেছে। যে মহাশূন্য ভিতরে দেখিতেছি তাহা বাহিরেও দেখিতেছি অর্থাৎ ভিতর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্রই সেই মহাশূন্যরূপী ব্রহ্ম দেখিতেছি। এখন নিজ অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটাইয়া সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া যাইতে হইবে, মহাশূন্যে বিলীন হইতে হইবে।

এই পুরাণপুরুষ, পুরাণকৃষ্ণ বা আদিপুরুষ কে? এ বিষয়ে উপনিষদ্ বলিতেছেন—**"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।"**[১] যিনি শাশ্বত,

(১) **কঠবল্যাখ্যা উপনিষদের উত্তর বল্লি এবং গীতা ২। ২০**

যাঁহার অগ্রে আর কেহ নাই; চিরকাল আছেন ও থাকিবেন, যাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই, যিনি অবিনাশী জন্ম-মৃত্যু রহিত তিনিই পুরাণপুরুষ। যোগী কূটস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিলে সব ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তখন সমুদয় এক হইয়া যাওয়ায় আর দুই থাকে না। দুই না থাকিলে জন্ম কোথায়? এবং জন্ম না থাকিলে মৃত্যু কোথায়? তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই নিত্য পুরাণ। তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকা উচিত। তিনিই আদিদেব অর্থাৎ দেবাদিদেব। তাই তিনি বলিতেন প্রাণকর্ম্ম না করিলে সেখানে থাকা যায় না, উহাই ধর্ম্ম। প্রাণকর্ম্ম করিয়া সকল কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকাই শাশ্বত পদ, অমর ধাম। সেই শাশ্বত পদে সর্ব্বদা থাকায় অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় সর্ব্বদা থাকায় স্বয়ংই পুরাণপুরুষ হইয়া যায়। মহাত্মা কবীরদাসও এই রকম কথাই বলিয়াছেন—

কবীর যো ওহ এক ন জানিয়া,
তও সব জানে ক্যা হোয়।
এক হিঁতে সব হোঁত হ্যায়,
সবতে এক ন হোয়।

কবীর বলিতেছেন এককে না জানিয়া সবকিছু জানিতে যাওয়া বৃথা। সেই এক হইতেই সবকিছু হইয়াছে, সবকিছুতেই সেই এক বর্ত্তমান। তিনি আরও বলিয়াছেন—

একহি সাধে সব সাধে,
সব সাধে সব জায়।
যো তু সিঁচে মূলকো,
ফুলে ফলে অঘায়॥

অর্থাৎ একের সাধনা করিলে সকলের সাধনা করা হয়, কিন্তু সকলের সাধনা করিলে সব বিফল হয়। যেমন একমাত্র বৃক্ষমূলে সেচন করিলে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফল পাওয়া যায়।

একং ভূতং পরং ব্রহ্ম
জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
নানাভাবং মনো যস্য
তস্য মুক্তির্ন জায়তে॥[1]

(১) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র ৮৪ শ্লোক

সর্ব্বভূতে এবং চরাচরে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। মনে নানাভাব হইলে মুক্তি নাই, বরং একেকে জানিলে মুক্তি সুনিশ্চয়। অতএব একের সাধনা করাই উচিত। নানান দেব-দেবীর সাধনা করিলে ইহা বড় দেবতা উহা ছোট দেবতা ভাব আসিয়া থাকে। **"গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।"**[১] প্রাণবায়ুকে কূটস্থরূপী গুহায় প্রবেশ করাইতে পারিলে পরমব্রহ্মেতে লীন হইয়া যায়, তখন পরার্দ্ধে জগৎ হয় অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হয়। যোগিরাজ সেই অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিলেন।

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি।"[২] (কূটস্থ মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ আত্মা বাস করেন। তাই যোগিরাজ ভক্তদের বলিতেন কূটস্থের মধ্যে যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ দেখ, যাহা উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিলেই দেখা যায়, তিনিই আত্মা, তিনিই অভয়পদ ও পরমপদ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই উত্তমপুরুষ আমি, ক্রিয়াযোগ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞান হয়। তিনিই স্বরূপ পুরুষোত্তম, তিনিই আবার সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ। তাঁহা হইতেই সকল জ্যোতিঃ আসে, তিনিই আত্মসূর্য্য, সুতরাং তিনি না থাকিলে কোন জ্যোতিঃ নাই। অতএব যাহাকিছু দেখিতেছ সমুদয়ই তাঁহার রূপ, কারণ সকল রূপই তাঁহা হইতে হইতেছে। তাই জীব শিবস্বরূপ, আত্মা না থাকিলে কিছুই থাকিত না। আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ আছেন বলিয়া সমুদয় আছে। সুতরাং আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান হইলে 'সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ' হইয়া যায়। তাই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—**"অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মাগুহায়াং নিহিতস্য জন্তোস্তমঃ কৃতং পশ্যতি বীতশোকা।"**[৩] তিনি অণুর অণু আবার মহৎ হইতেও মহীয়ান্। সেই কূটস্থরূপী গুহার ভিতর যে আত্মা নিহিত আছেন সেখানে মন গেলেই সকল শোক রহিত হয়। তিনি সূক্ষ্মরূপে সকল জীবকে ভরণ-পোষণ করেন। তাই যোগিরাজ বলিতেন উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিলেই এই ওঁকাররূপ শরীরের ভ্রূর মধ্যে দীপ শিখার ন্যায় বাতরহিত দেখা যায়; সেই স্থানে মৃণাল তন্তুর ন্যায় আভা দেখা যায়, তিনিই শক্তিরূপা শিবা, তিনিই সূর্য্য স্বরূপ কূটস্থের রূপ, তিনিই হৃদয়াকাশ। এই শ্বাসই বাক্, ইনিই গায়ত্রী। প্রাণকর্ম্মকালে যে সুমধুর ধ্বনি শুনা যায় তাহাই প্রণবধ্বনি

(১) **কঠোপনিষদ্ ৩।১**
(২) **কম্বলাখ্যা উপনিষদের উত্তর বল্লি।**
(৩) **বৃহন্নারায়ণ উপনিষদ্ এক সূত্র।**

বা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। সেই প্রণবধ্বনিতে তন্ময় হইলে প্রাণবায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং কূটস্থে স্থিতি প্রাপ্তি ঘটে। উহাই অমরপদ।

হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং,
সকর্ণিকং কেশর মধ্য নীলম্।
অঙ্গুষ্টমাত্রং মুনয়ো বদন্তি,
ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণম্॥[১]

হৃদয় পদ্মে স্থিতি হইলে উহার আট কর্ণিকা কেশর মধ্যে নীলবর্ণ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ, এইরূপ মুনিরা বলেন ও পুরাণপুরুষ সেই বিষ্ণুকে ধ্যান করেন। তাঁহাকেই পুরাণপুরুষ বলে।

ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো।
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥[২]

অর্থাৎ ধ্যানেতে অবস্থিত এবং তদগত মন এই অবস্থাতে যোগিগণ তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হন। যাঁহার আদি অন্ত সুর-অসুরগণও জানিতে পারেন না এমন যে ঈশ্বর তাঁহাকে নমস্কার।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তিনি লিখিয়াছেন—**"পাঁচ ইন্দ্রিয়োঁকো পরে মন স্থানে শ্বাসা—মনকে পরে বুদ্ধি স্থানে বিন্দি—বুদ্ধি সে পরে ব্রহ্ম নিরাকার সূন্য নির্ম্মল।"** অর্থাৎ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পরে মনের অবস্থান। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস আছে ততক্ষণ বর্ত্তমান চঞ্চল মনও আছে। শ্বাস স্থির হইলে আর বর্ত্তমান মনের অস্তিত্ব থাকে না। শ্বাসের অস্তিত্বে মনের অস্তিত্ব। অতএব শ্বাস স্থির হইলে থাকে বুদ্ধি, উহা কূটস্থরূপী বিন্দুতে অবস্থিত। সেই বুদ্ধি অর্থাৎ বিন্দুর পরে (অতীতে) নিরাকার ব্রহ্ম যিনি নির্ম্মল শূন্য স্বরূপ। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ শ্রোতরম্।
পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মন সাধন্যামিন্দ্রিয়ম্॥[৩]

স্পর্শ, রসনা ঘ্রাণ, চক্ষু এবং কর্ণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে পঞ্চ তত্ত্ব তাহার পরে মনরূপী ইন্দ্রিয়।

তাই তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে লিখিয়াছিলেন—**"বিন্দুমে আটক**

(১) ওঁকার গীতা।
(২) গীতাধ্যান।
(৩) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র ২৮ শ্লোক

রহনা কাম হয়।" ঐ মনের অতীতে যে বিন্দু তাহাতে সর্ব্বদা আটকিয়া থাকাই উচিত, তাহা হইলে শূন্যে স্থিতি হয়। তাহার পর কি হইবে? যোগিরাজ ঐ বৎসরই ৩রা মার্চ লিখিয়াছেন—**"আজ হম উজিয়ালা ঘর চলে—জয়সে কোই দিপক বার দিয়া। স্বাসা ভিতর ভিতর চলা।"** অর্থাৎ প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম, সেখানে ঠিক যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছে। শ্বাস ভিতর ভিতর চলিতেছে অর্থাৎ সুষুম্নায় চলিতেছে। ঐ অবস্থায় ঠিক যেন ভোরের আকাশ অথবা সন্ধ্যার পূর্ব্বের আকাশের মত আলোহীন অথচ স্বয়ং প্রকাশ সবকিছু দেখা যায়। নিকট দূর দৃশ্য হয়। তারপরই আসে সমাধি। তাই তিনি তারপরই ১৩ই জানুয়ারী তাঁহার সাধনলব্ধ অনুভূতির কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—**"সূন্য ভবন আউর সফা জিভ আউর উপর উঠা অব বড়া মজা এক উজিয়ালা উসিসে সব দেখলাতা হয় আউর কুছভি নহি দেখলাতা হয় উসিসে মন ঠহর জানেকো নাম সমাধি।"** অর্থাৎ সহস্রার চক্রস্থ শূন্য ঘর আরও পরিষ্কার দেখিলাম, জিহ্বা আরও উপরে উঠিয়া তালুকুহরে আটকাইয়া গেল এবং তখন বড়ই আনন্দ অনুভব হইল, ভোরের আকাশের মত স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় সবকিছু দেখিতে পাইলাম, আবার কিছুই দেখা গেল না, কারণ সে অবস্থায় দেখাদেখি থাকে না, যে দেখিবে সে মন থাকে না। তাই তিনি বলিতেছেন সেই অবস্থায় মনকে স্থাপিত করার নাম সমাধি। তখন যে আত্মসূর্য্য প্রকাশিত হয় তাহাকেই তিনি বলিয়াছেন—**"সূর্য্য হি কৃষ্ণ।"** সেই আত্মসূর্য্যই কৃষ্ণ। ঐ বিচিত্র অবস্থার যে অনুভূতি তাঁহার হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—**"যোন দেশমে রাত নহি হয় ওঁহা এক আদমি কে মাফিক দেখা ওহ আদমি ন কুছ বোলে ন কুছ চালে—খালি খড়া হয়—তুমি সুত্র আছো সে দাঁড়িয়ে আছে—কেবল সে প্রেমের ভুযো—প্রেম করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।"** তিনি বলিতেছেন যে দেশে রাত নাই। কোন্ দেশে রাত নাই? এমন দেশ ত কোথাও দেখা যায় না। রাত নাই তাহা হইলে কি কেবল দিন বর্ত্তমান? তাহাও হইতে পারে না। কারণ দিন থাকিলে রাত্র থাকিতে বাধ্য। আবার রাত্র থাকিলে দিনও থাকিতে বাধ্য। একটা থাকিলে অপরটা থাকিবেই। যেমন কেবল সুখ চাই, দুঃখ চাই না, তাহা হইতে পারে না। সুখ দুঃখ পাশাপাশি থাকিবে। একটা থাকিলে তাহার পিছনে অপরটাও থাকিবে। তাই তিনি বলিয়াছেন—**"যোন দেশমে রাত নহি—"** অর্থাৎ (যেখানে দিনও নাই রাত্রও নাই, ভোরের

আকাশের মত স্বয়ংপ্রকাশ এক দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা, সেখানে এক মানুষকে দেখিলাম, তিনি কিছু বলিলেন না, নড়িলেন না কেবল দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বুঝিলাম তিনিই সবকিছুর মূল উৎস, তাই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম। সেই পুরুষোত্তম কেবল প্রেমের কাঙাল, ঠিকমত প্রেম করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই প্রেম হয় কখন? যতই প্রাণকর্ম্ম করিবে ততই ঐ অরূপের রূপ ঘণীভূত হইবে এবং যতই উহা ঘণীভূত হইবে ততই স্থির নেত্রে (কূটস্থে) দর্শন করিতে করিতে উহার প্রতি আকর্ষণ বাড়িবে, শেষে ঐ আকর্ষণই ঘণীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হইবে। উহাই বিশুদ্ধ প্রেম) তাহার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ প্রেম সম্ভব নহে। মহাত্মা রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"ঊর্দ্ধ জিহ্বা করি আনন্দ সাগরে ভাসিতে……।" জিহ্বা ঊর্দ্ধে উঠিলে অর্থাৎ তালুকুহরে প্রবেশ করিলে আনন্দ সাগরে ভাসা যায়। এবং তাহার পরবর্ত্তী অবস্থার কথা বলিতে গিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থার কথা বলিতে গিয়া মহাত্মা রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"যে দেশেতে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি, এবার ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।" মহাত্মা রামপ্রসাদের জন্মগত সংস্কারের জন্য তিনি আত্মব্রহ্মকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন, তাই তাঁহার সকল কথাতেই 'মা' সম্বোধন করিয়াছেন দেখা যায়। আসলে মাতা-পিতা সবই তিনি। ১লা মার্চ ১৮৭৪ খৃঃ তারিখের সাধনায় যোগিরাজের যে মহতোমহিয়সী অবস্থার উপলব্ধি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—**"ন স্বাসা লেনা ন ফেকনা—বড়া সুখ—এহি ব্রহ্ম। সূর্য্য কো জ্যোতি নহি রহা।"** আত্মক্রিয়া করিতে করিতে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যখন আর শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগ কিছুই রহিল না অর্থাৎ আগম-নিগমরূপ কর্ম্ম রহিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে 'কেবল কুম্ভক' প্রাপ্ত হইয়া স্থির হইয়া গেলেন। তখন বড়ই সুখ হইল এবং সেই নির্ব্বিকল্প সুখময়ী ভাবের নাম ব্রহ্ম। নদী সমুদ্রে মিশিলে আর যেমন নদীর স্রোত বা প্রবাহাববাহ থাকে না, তেমনি যোগিরাজও ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিলেন। তিনি ঐ অবস্থাকে আনন্দ না বলিয়া বলিয়াছেন সুখ। সুখ আর আনন্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। আনন্দের মধ্যে সুখের কিঞ্চিৎ আভাস থাকে, কিন্তু সুখের মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দ বর্ত্তমান থাকে। সুন্দররূপে আকাশে অর্থাৎ ব্রহ্মাকাশে লীন থাকাই সুখ এবং সেই ব্রহ্মাকাশ হইতে দূরে থাকাই দুঃখ। খং = আকাশং

=ব্রহ্মাকাশং।[১] অতএব সুখ আনন্দেরও অনেক উর্দ্ধের অবস্থা। তাই তিনি সুখ বলিয়াছেন। সেই সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মাকাশে যখন তিনি অবস্থান করিলেন তারপর সেখান হইতে অবতরণ করিয়া সেই অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন--**"সুর্য্য কো জ্যোতি নহি রহা।"** অর্থাৎ তখন আর আত্মসূর্য্যের জ্যোতিও নাই, স্বয়ং প্রকাশ। কারণ সেই জ্যোতিঃস্বরূপাকে আকাশের সূর্য্য চন্দ্র কেহই প্রকাশিত করিতে পারে না, সকলেই ম্লান হইয়া যায়।

এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥[২]

অর্থাৎ সেখানে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির দীপ্তি নাই। কারণ উহাদের দীপ্তি সেই অবস্থাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। উহা পরম জ্যোতির্ম্ময় স্থান, স্বয়ং প্রকাশ ও অব্যক্ত। সেই যে অবস্থা যাহা প্রাপ্ত হইলে যোগিগণ আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না, সেই আমার পরমধাম।

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—**"নতত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"** অর্থাৎ যেখানে সূর্য্যের কিরণ পৌঁছায় না, চন্দ্র-তারকার কিরণও পৌঁছায় না, বিদ্যুতের দ্যুতিও তাহার অপেক্ষা উজ্জ্বল নহে, এই অগ্নির ত কথাই নাই। তিনি নিত্যকাল দেদীপ্যমান আছেন বলিয়া এই দৃশ্যমান সূর্য্য চন্দ্র তারকা তাঁহার জ্যোতিতেই জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে।

* * * *

তিনি কখনও তথাকথিত ধ্যান করিতে বলিতেন না, বলিতেন ক্রিয়াযোগ সাধন করিতে। ক্রিয়াযোগই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। ধ্যান বলিতে সাধারণতঃ বোঝায় আজ্ঞাচক্রে কোন দেব-দেবীর কল্পিত মূর্ত্তি অথবা ইষ্টমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্তি এবং এইপ্রকারে শনৈঃ শনৈঃ সমাধির দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু যোগিরাজ প্রদর্শিত পথ তাহা নহে। তিনি শিখাইয়াছেন

(১) সু=সুন্দর, খং=ব্রহ্মাকাশ। সুন্দররূপ ব্রহ্মাকাশে থাকিলেই সুখ। দুঃ=দূরে, খং=ব্রহ্মাকাশ। অর্থাৎ সেই সুন্দররূপ ব্রহ্মাকাশ হইতে দূরে থাকিলেই দুঃখ অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিলেই সুখ, পরাবস্থায় না থাকিলেই দুঃখ।

(২) গীতা ১৫।৬

রেচক ও পূরকের মাধ্যমে ষট্-চক্রপথে অন্তর্মুখীভাবে প্রাণবায়ুকে লইয়া যাতায়াতের মাধ্যমে আপনা হইতেই 'কেবল কুম্ভক' হইয়া যাইবে এবং সকল প্রকার চঞ্চলতার অবসান হইয়া ধ্যানের প্রকৃত ভিত স্থাপিত হইবে। তাহার পর যোনিমুদ্রার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারে তন্ময়তা আসিবে এবং আরও অগ্রসর হইলে আসিবে সমাধি অবস্থা। ইহাতে কোন প্রকার কষ্ট হয় না বলিয়া গীতার ভাষায় ইহাকে বলা হয়—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।(১)

ইহা বিজ্ঞান সহিত হওয়ায় সকল বিদ্যার মধ্যে রাজবিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অতি গুহ্য এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। প্রাণকর্ম্মরূপ এই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট, সুখে আরামে করা যায় এবং অব্যয় অর্থাৎ অক্ষয়, ইহার নাশ নাই। তাই যোগিরাজ বলিতেন—**"কষ্ট হলেই বুঝবে ক্রিয়া ঠিক হচ্ছে না।"** এই কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রাণবায়ু চঞ্চল হইয়াই যতকিছু কর্ম্ম উৎপন্ন করে। আবার উহা স্থির হইলে আর কোন কর্ম্ম থাকে না বলিয়া উহাকে কর্ম্মের অতীতাবস্থা বলা হয়। যাহাকে যোগিরাজ বলিতেন ক্রিয়ার পরাবস্থা। এই পরাবস্থাই সকলের লক্ষ্য, সকলের কাম্য, উহাই পরমধাম। তাই তিনি সকলকে বলিতেন অধিক সময় পরাবস্থায় থাক, ইহার অধিক কিছু নাই। কারণ ঐ স্থির অবস্থাই ব্রহ্ম। "নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে"—নিশ্চল অর্থাৎ স্থির অবস্থাই ব্রহ্ম।

১৮৭৩ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট লিখিয়াছেন—**"আজ জেয়াদা দেরতক দম বন্দ রহা—হমহি সূর্য্য ভগবান্। হমারা রূপ কালাচাঁদ।"**—আজ দীর্ঘ সময় ব্যাপী দম বন্ধ হইয়া রহিল। আমিই আত্মসূর্য্যরূপী ভগবান্, আমারই রূপ কালাচাঁদ। ১৯শে আগষ্ট একটি কৃষ্ণচন্দ্র অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"কালাচাঁদকা রূপ। কৃষ্ণ য়ানে কালাচাঁদ।"**—কূটস্থে যে কৃষ্ণচন্দ্র দেখা যায়, যাহা যোগিমাত্রেই দেখিয়া থাকেন তাহাই কালাচাঁদের রূপ; কৃষ্ণ অর্থাৎ এই কালাচাঁদ। ইহার কয়েকদিন পর একটি কৃষ্ণ মুখাকৃতি অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"ই চেহারা ভিতরকা মিট যাতা হয় পিছে হাজার কৃষ্ণ নজর পড়াতা হেয় ভয়ানক বড়ে ভয়ানক সুরত সব নজর পড়াতা হয় বড়া ভারি কৃষ্ণ ইসমে দহযত মালুম**

(১) গীতা ৯।২

হোতি হেয়।" —কূটস্থে এই যে কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতেছি তাহাও মিলিয়া গেল, ইহার পর হাজার কৃষ্ণ দেখিলাম। ইহার পর যে বৃহৎ কৃষ্ণ দেখিলাম তাহা অত্যন্ত ভয়ানক ও জ্বলন্ত। **"এক জ্যোত ভিতরসে দেখা উসকা বর্ণন নহি হো সক্তা উহ জ্যোত সেওয়ায় আউর কুছ নাহি—অব কঠিন কাবারা হয়—বড়া আনন্দ এহি আউর ব্রহ্ম বিরাট মূর্ত্তিকা রূপ হয়।"** —ভিতরে এক জ্যোতি দেখিলাম যাহার বর্ণনা করা যায় না; ঐ জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই নাই। এখন কঠিন অবস্থা হইল। এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তির রূপ। তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া ১৮৭৩ খৃঃ ৩১শে আগষ্ট লিখিলেন—**"উহ কৃষ্ণ সুন্যমে মিলযাতা।"** সেই কৃষ্ণও মহাশূন্যে অর্থাৎ শূন্যের ভিতর যে শূন্য তাহাতে মিলিয়া গেল। শেষে কোন রূপই থাকে না সবই মহাশূন্যে মিলিয়া যায়। তাই তিনি লিখিলেন—**"যত রূপ দেখা যায় সব অপরূপ। সব রূপ সূন্যমে মিলযাতা হয়।"** ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছেন—'ঐ দেবতা সমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন'[১]। সেই শূন্য কেমন? তিনি লিখিয়াছেন—**"বিন্দু ঘোমটার ভেতর হইতে দেখা যায় অর্থাৎ সাধারণ শূন্যের আবরণ আছে কিন্তু মহাশূন্যের আবরণ নাই তন্নিমিত্তে প্রথমে দেখা যায় না—মহাশূন্যের বিন্দুতে সমুদায় দেখা যায়।"** কিন্তু দেখাদেখি কতক্ষণ? তিনি লিখিয়াছেন—**"হম বিনা কুছ নহি ফির হমভি নহি খালি সূন্য নির্ম্মল ওহি আপনে পদ। অব স্বাসা ভিতর ভিতর চলে লগা—ওহি স্বাসা নারায়ণ হয় আউর ওহি কারণ বারি। এহি কা নাম পার উতরনা কহতে হয়—ইসিনেসেমে জোগিলোগ পড়ে রহতে হয়।"**—আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, আবার আমিও নাই কেবল নির্ম্মল মহাশূন্য বর্ত্তমান, উহাই আপন পদ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ। এখন শ্বাস ভিতর ভিতর অর্থাৎ সুষুম্নায় চলিতেছে, এই অভ্যন্তর শ্বাসই নারায়ণ এবং ইহাই সবকিছুর উৎপত্তিস্থল। ইহাকেই ভবসংসার অতিক্রম করা বলে, এই অবস্থাতেই সমস্ত মহাযোগিগণ অবস্থান করেন। **"হমহি সূর্য্য হমারেই প্রকাশিত সব জগত"**—আমিই সেই আত্মসূর্য্য, আমি হইতেই প্রকাশিত সমস্ত জগৎ। এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া লিখিলেন—**"ইহ মালুম হুয়া কি সূর্য্য হমাহি হয়। যয়সা হম সূর্য্যরূপী আউর হমারে সব তেজ সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম। হমারা ন হাত হয় ন পএর হয় কেবল মণ্ডলাকার হমারা তেজ**

(১) গীতা ১১।২২

দিয়া শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম্ম নাই। অর্থাৎ বাহিরের বায়ু হইতে ইড়া ও পিঙ্গলার মাধ্যমে বা দুই নাসিকার মাধ্যমে শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম্ম নাই, ইহা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরমুখী; ভিতরের প্রাণ ও অপান বায়ুকে লইয়াই কাজ। ইড়া ও পিঙ্গলাই জীবকে জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে; তাই ইড়া ও পিঙ্গলাকে প্রথমেই পরিত্যাগ করিয়া সুষুম্নান্তর্গত গতি সম্পন্ন এই প্রাণায়াম। ইহা অত্যন্ত আরামদায়ক ও সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা। ইহাতে কোন প্রকার হানি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। তাই যোগিরাজ বলিতেছেন অন্তর্মুখীভাবে উত্তম প্রাণায়ামকালে রেচক করিবার সময় যেমন সুন্দর বাঁশির মত শব্দ নির্গত হয় পুরকের সময় তেমন নির্গত হয় না। যাহা শূন্যের রূপ তাহাই আসল ব্রহ্মের রূপ। এখন আরও মজা বা আনন্দ হইতেছে, জিহ্বা আরও অধিক উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এই অন্তর্মুখী প্রাণায়ামের রেচককালে শিঁ শিঁ শব্দরূপী প্রণবধ্বনি যাহা নির্গত হইতেছে তাহাতে মনকে লয় করিতে পারিলেই সমস্ত প্রকার কর্ম্ম ভ্রম চলিয়া যায়। এই উত্তম প্রাণায়াম সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা ১৮৭১ খৃঃ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ভাবে লিখিয়াছেন—"**ক্রিয়া করতে করতে আপ উঠ খড়া হুএ—ফির হোস করকে বইঠে ছোড়া স্বাসাকো।**"—ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ আপনা হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যখন হুঁস হইল অর্থাৎ খেয়াল হইল তখন পুনরায় আসনে বসিলাম এবং শ্বাসকে ছাড়িলাম। "**সিদ্ধাসনমে বৈঠকে করতে করতে উঠ আসনসে খড়া হুয়া।**"—সিদ্ধাসনে বসিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। "**একটা বড় ভারি পাথর দশজন বল করিয়া শূন্যেতে ওঠায় তদ্রূপ শরীর বায়ুর জোরে ওঠে কিন্তু পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার ছাড়া হয় না, তৎবৎ যোগীর মূলাধারে কিঞ্চিৎ পাছা বা পা লাগিয়া থাকে, যখন সব বায়ু শূন্যতে মিলিয়া যায় তখন শূন্যের দ্বারায় সর্ব্বত্রেতে যাইতে পারে, মনের দ্বারায় মন সর্ব্বত্রেতে বসে বসে যাইতে পারিলে সর্ব্বব্যাপী হইল তৎপরে সব জানিতে পারিল, সবশেষে সর্ব্বজ্ঞত্ব হইল সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হওয়ায়। পরে এই প্রকার আত্মচিন্তা করিতে করিতে মন লয় অল্প পরিমানে হওয়ায় ধ্যান হইল, এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে সমাধি জ্ঞান হইল, এইরূপ বহু জ্ঞান হওয়াতে পবিত্র ও ভাব প্রাপ্ত হইল।**" আবার লিখিয়াছেন—"**বড়া মজা—বদন জরা হলকা।**" এই প্রকার উত্তম প্রাণায়াম করিতে করিতে বড়ই আনন্দ হইল, শরীর কিছুটা হালকা

হইল। **"আজ হওয়াসে শরীরকো ঢকেল দিয়া।"**—প্রাণায়াম করিতে করিতে বায়ু স্থির হওয়ায় ভিতর হইতে শরীরে ধাক্কা দিল। ১৮৭৩ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন—**"শরীর বহুত ঢিলা হো গয়া।"**—উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে শরীর শিথিল বা আলগা হইয়া গেল। এই অবস্থায় বায়ু স্থির হওয়ায় শরীরের সমস্ত গাঁট, মাংসপেশী কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে, তারপর ক্রমে ক্রমে দেহবোধ চলিয়া যায়। তাই তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন—**"পিসাব না হোকে উঠকে টপাটপ আপসে আপ গিরনে লগা।"**—দীর্ঘ সময় ক্রিয়ায় রত থাকায় মূত্র ত্যাগ করা হয় নাই। কিন্তু শরীর এমন ঢিলা হইয়া গিয়াছে যে উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র আপনা হইতে মূত্র পড়িয়া যাইতেছে। **"মঝুকে মাফিক সূর্য্যকে তরফ ওঁকার রূপ দেখনেসে নিচেকা পএর তিন চার দফে উঠ খড়া হোতা হয় ঠিক মঝুকে মাফিক সরির সমেত ৩।৪ দফে আগে কুদতা হয় আপ সে আপ—বায়ুকে গতিসে ইহ সব প্রেমকি লক্ষণ।"**—ব্যাঙের মত অবস্থা হইল, এই অবস্থায় আত্মসূর্য্যের দিকে ওঁকাররূপ দেখিতে দেখিতে নীচের দিকে পাদুটি সহ তিন চার বার উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল এবং ঐ অবস্থায় ব্যাঙের মত শরীর সহ অর্থাৎ এই দেহটি সমেত তিন চার বার আপনা হইতেই লাফাইয়া উঠিল। প্রাণায়াম করিতে করিতে বায়ু স্থির হইলেই এই প্রকার হয়, ইহাই প্রেমের লক্ষণ। **"আজ জমিনসে চলতে ওক্ত পএর উঠে লগা"**—আজ হাঁটিয়া চলিবার সময় জমি হইতে পা উঠিতে লাগিল। **"আজ সুর্য্য দেখতে ওক্ত পএর জমিনসে উঠনে লগা।"**—আজ যখন আত্মসূর্য্য দেখিতেছিলাম তখন পা জমি হইতে উঠিতে লাগিল। **"কোই হাত পকড়কে উঠাতা হয়।"**—কেহ হাত ধরিয়া উঠাইতেছে। **"আখসে ঐহি ব্রহ্মস্বরূপ নজর পড়াতা হেয়—উচেপর উঠনেকা তবিয়ত করতা হয় উচেকা হাওয়াসে ডর মালুম হোতা হয়—বড়া আনন্দ।"**—খালি চোখে শূন্য স্বচ্ছ ব্রহ্মের রূপ দেখা যাইতেছে, প্রাণায়াম করিতে করিতে শরীর হালকা হওয়ায়, ওজন বিহীন হওয়ায় এমন অবস্থা হইল যে শরীর শূন্যে উঠিয়া যাইতেছে, শরীরাভ্যন্তরে উর্দ্ধের বায়ু স্থির হওয়ায় সামান্য ভয় হইতেছে, আবার প্রচুর আনন্দও হইতেছে। **"ইহ মালুম হোতা হেয় কি কুম্ভকসে বদন হালকা হোতা হেয়।"**—প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন আপনা হইতেই কুম্ভক হইল তখন বুঝিলাম যে শরীর হালকা হইয়া গেল, ওজন শূন্য হইল। **"আব উপর খৈচকে লেজাতা হয়।"**—এই প্রকার কেবল কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় শরীরকে

টানিয়া উপর দিকে লইয়া যাইতেছে। **"আজ কেবল ভিতর ভিতর সে চলা—আউর বড়া মজা মালুম হুয়া—আউর এয়সা মালুম হুয়া কি আসন লেকে উঠে জো ধ্বনি আধি রাতকো সুনাতাথা সোধ্বনি অকসর সুনাতা হয় ওহি ধ্বনি ওহি সূন্য ওহি ব্রহ্ম।"**—আজ বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করিয়া কেবল ভিতরে ভিতরে চলিতেছি এবং তাহাতে বড়ই আনন্দ হইতেছে। আরও বুঝিলাম যে এখন আসন সহ উপরে উঠিয়া যাইতেছি। যে ওঁকার ধ্বনি মধ্য রাত্রে শুনিতেছিলাম তাহা এখন সকল সময়েই শুনা যাইতেছে, ঐ ধ্বনিই মহাশূন্য আবার উহাই ব্রহ্ম। **"পদ্মাসন সামনেকা উঠা।"**—পদ্মাসনে বসিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে সামনের অংশ উঠিয়া গেল। **"আসন আপসে উঠা।"**—আসনে বসিয়া যখন ক্রিয়া করিতেছি তখন আপনা হইতেই উপরে উঠিয়া গেলাম। **"তিলুয়ার গুড় টেনে টেনে হালকা হয় যেমন তেমনি শরীরে শ্বাস টেনে টেনে শরীর হালকা হয়—সে যেমন দুধের উপর ভাসে তেমনি শূন্যের উপর শরীর থাকে। কিছুদিনের পর অনুতে মিলিয়ে যায়।"** সাধন করিতে করিতে আরও অগ্রসর হইয়া ১৮৭৩ খৃঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর লিখিলেন—**"এক তরহকা ভারি নেসা জিসমে বেখবর হো জানে পড়তা হয়।"**—এমন এক প্রকার গাঢ় নেশা হইল যাহাতে নিজ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতে হইল অর্থাৎ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সহ দেহবোধ চলিয়া গেল, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার সকলই হারাইয়া গেল। কারণ মন বুদ্ধি চিত্ত ইহারাই দেখে; ইহারা যখন থাকিল না তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহার খবর লইবে? এই মন যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণই বিভিন্ন দেখা, কিন্তু যখন স্থির তখন কিছুই নাই। এই প্রকার নেশা যোগীকে মাতাল করে। এই নেশা সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন—

খাওয়া ভুলে যেতে দেখিনে,
এমন প্রেমতো কৈ দেখিনে।
নেশার উপর নেশা ধরে,
দুঃখ সুখ যেখানে হরে।
এমন নেশার বলিহারি,
থেকো তুমি এই নেশা ধরি।

এই গাঢ় নেশাকেই যোগিগণ প্রকৃত প্রেম বলেন। বাহ্য প্রেম বা লোক দেখান প্রেম, প্রেম নহে। তাই তিনি লিখিয়াছেন—**"যার যেমন মন সে তেমনি দেখে।"** এই মন বা ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনি ১৮৭৩ খৃঃ ৬ই মার্চ লিখিয়াছেন—**"বপু হৃদয়কে কহতে হঁয়—য়ানে ছাতিকে আগে যো মাংশ**

হয়—ইহঁসে ইচ্ছা উৎপত্তি হোতা হয় তব লড়কা পয়দা হোতা হয়—জব ইচ্ছারহিত হো জায় তব আপহি ব্রহ্ম হোজায় ; সুর্য্য ব্রহ্ম ওহি মালিক।" —বপু অর্থাৎ শরীর, হৃদয়কেই বলে অর্থাৎ বুকের ছাতির আগে যে মাংস। এই জায়গা হইতেই ইচ্ছা উৎপত্তি হয় এবং ইচ্ছা হইতেই সন্তানের জন্ম হয়, কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে স্ত্রী গমন হয় না। কিন্তু ক্রিয়া করিতে করিতে বায়ুস্থির অবস্থায় যখন ইচ্ছারহিত বা ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয় তখন স্বয়ংই ব্রহ্ম হইয়া যায়। আত্মসূর্য্যই ব্রহ্ম, তিনিই মালিক। শ্বাস রহিত হইলেই ইচ্ছারহিত হয়। **"হংস ওঁকার সো মন হোই—ফির স্বাসা রহিত হো জায় তব মন স্থির হোয় অর্থাৎ ক্ষর অক্ষর ও নিঅক্ষরকা দুবধা জায়—মূল অর্থাৎ স্বাসা শিরপর চঢ়াকর ডালপাতি সব দেখে।"**—যাহা হংসরূপী ওঁকার তাহাই মন অর্থাৎ যাহা মন তাহাই ব্রহ্ম। এই মনই স্থির হইলে ব্রহ্ম, আবার চঞ্চল হইলে মন। প্রাণক্রিয়া এবং ওঁকার ক্রিয়া করিতে করিতে যখন শ্বাস রহিত হইয়া যায়, যখন শ্বাসের বহির্গতি রোধ হইয়া 'কেবল-কুম্ভক' অবস্থা হয় তখন মনও স্থির হইয়া যায়। তখন ক্ষর, অক্ষর ও নিরক্ষর সকল প্রকার সংশয় চলিয়া যায় ; তখন দ্বৈতও নাই অদ্বৈতও নাই, কারণ মন যেখানে নাই সেখানে দ্বৈত অদ্বৈত বলিবার কেহ নাই, তখন সব মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। এই অবস্থা যাহার হয় সেই বোঝে, কিন্তু জানে না ; জানিলেই দুই হইল। শ্বাসই মূল অর্থাৎ আসল। কারণ শ্বাস না থাকিলে এই দেহ থাকে না। সেই মূল শ্বাসকে প্রাণকর্ম্ম এবং ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা মস্তোকপরি সহস্রারে উঠাইয়া নীচের দিকে ডালপাতা দেখ অর্থাৎ মূল যে স্থিরপ্রাণ সেইখানে পৌঁছিয়া পূর্ব্বে যখন চঞ্চল প্রাণে ছিল এবং ঐ চঞ্চল প্রাণে থাকার দরুণ যে সমস্ত ইন্দ্রিয় রিপু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলেই চালু ছিল, কর্ম্মক্ষম ছিল এবং যাহাদের মাধ্যমে এই জগৎ সংসারকে দেখিতে, তাহারা এখন কর্ম্মহীন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ঐ অবস্থাকে দেখ, উহারাই ডালপাতা। যেমন একজন অতি গরীব হঠাৎ কোন ভাবে ধনশালী হইয়া সুউচ্চ অট্টালিকায় বাস করিয়া দূরে গরীবদের দেখিতেছে যাহা তাহার পূর্ব্বের অবস্থা ছিল। যোগীর এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥[১]

---

(১) গীতা ১৫।১

বৃক্ষাদিতে দেখা যায় ঊর্দ্ধে শাখা এবং অধঃতে মূল। কিন্তু এখানে ভগবান্ বলিয়াছেন ঊর্দ্ধে মূল এবং অধঃতে শাখা। এমন উলটা নিয়মের বৃক্ষ কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু যখন ভগবান্ বলিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই আছে যাহা যোগিদের বোধগম্য। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে যাহার মূলবস্তু পরমাত্মতত্ত্ব এবং নিম্নে হস্তপদাদি এবং ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট যে কলেবররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ তাহার কথাই বলিয়াছেন। অশ্বত্থ অর্থাৎ অস্থায়ী, আজ আছে কাল নাই এমত দেহই অশ্বত্থ বৃক্ষ। এই বৃক্ষের মূল হইতে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার, যেখানে স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মের অবস্থান স্থল, সেখান হইতে চঞ্চল প্রাণাদি বায়ু সকলের কার্য্য-ব্যক্ত দ্বারা অধঃস্থিত শাখারূপে হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিস্তৃত হইয়াছে, আবার অধঃ হইতে বিভিন্ন নাড়ী উপরে (মস্তকে) গিয়াছে। বেদ সকল এই বৃক্ষের পত্র অর্থাৎ তিনগুণই হইতেছে এই কলেবররূপ বৃক্ষের পত্র স্বরূপ। এই প্রকারে এই দেহরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের তত্ত্ব জ্ঞানরূপ দেহতত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন শ্বাসকে মূলে অর্থাৎ মস্তকে উঠাইয়া আটকাইয়া রাখ এবং ঐ অবস্থায় থাকিয়া নীচের দিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ ডালপাতা দেখ, তাহা হইলেই জগৎ ভ্রম চলিয়া গিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। **"শ্বাস রহিত য়ানে কেবল কুম্ভক রাতদিন মন লেআওএ আউর আপনেহিকো আপ দেখে—ইসিকা নাম ব্রহ্মজ্ঞান"**— শ্বাস রহিত অবস্থাই কেবল কুম্ভক যাহা প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা আপনি হয়। এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে রাখিবে এবং তখন নিজেই নিজেকে দেখিবে, ইহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান। যোগিরাজ পুনরায় লিখিয়াছেন—

হলোনা হলোনা হলোনা,
পেছন ফিরে হবে কেমন করে
তা বলনা বলনা বলনা।
ত্রিকোণের মধ্যে মন পোর
উপরে চড়ে ডাইনে হইতে বাঁদিক ফেরনা,
জড়িয়ে ধরে মন লিঙ্গের ভিতর যোনি
টেনে ধরে ঠেলা মধ্যে মধ্যে দেনা।
এক হলে যে মজা সে মুখে বলা যায় না;
যোনি লিঙ্গ এক হলে একি মজা মন বই
অন্য কেহ জানে না। কোথায় লিঙ্গ
কোথায় যোনি কেমনে মিলন হয় বলনা।

যোগিগণ ওঁকার ক্রিয়ার মাধ্যমে কূটস্থের মধ্যে এক ত্রিকোণ দর্শন করেন। সেই ত্রিকোণই ব্রহ্মযোনি, সেখান হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি। তাহার মধ্যে মনকে প্রবেশ করাইতে হইব—মনই লিঙ্গ। লিঙ্গরূপ মনকে প্রবেশ করাইলে এক বিন্দু অর্থাৎ ব্রহ্মাণু দর্শন হয়—উহাই বীজস্বরূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল। তিনিই ভগবান্। ভগ অর্থে যোনি অর্থাৎ কূটস্থ, বাণ অর্থে শর বা শ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করিতে করিতে অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে মন স্থির হইয়া কূটস্থরূপী যোনির মধ্যে লিঙ্গরূপী মন প্রবেশ করিলে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় তাহাই ভগবান্। কূটস্থই যোনি এবং মনই লিঙ্গ, ইহারই প্রতীক শিবলিঙ্গ। তাই তিনি পুনরায় বলিলেন—"**ভগবৎ য়ানে ভগকে মাফিক অর্থাৎ জব জিভ নাককে ভিতর তালুমুলমে জায়।**" অর্থাৎ জিভ যখন উর্দ্ধে উঠিয়া নাকের ভিতর তালুমূলে প্রবেশ করে তখন সঙ্গমবৎ আনন্দ হয়, তাহাই ভগবৎ। এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

> **মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।**
> **সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং** ততো ভবতি ভারত॥
> **সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি** যাঃ।
> তাসাং ব্রহ্ম **মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ** পিতা॥[১]

অর্থাৎ হে ভারত, আমার যে মহান্ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ব্যাপক প্রকৃতিরূপ অবস্থা রহিয়াছে, ঐ মহদ্‌ব্রহ্মই আমার যোনিস্বরূপ, কারণ ঐ অবস্থা হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি হইতেছে। জগদ্‌বিস্তারের হেতু স্বরূপ চিদাভাস উহাতেই আমি ক্ষেপণ করি অর্থাৎ ঐ স্থান হইতে চঞ্চলা গতি হইয়াই নানা মূর্ত্তির ব্যক্তভাব হইতেছে। প্রাণরূপী আত্মার ঐ মহান্ ব্রহ্মময় ভাব যাহা রহিয়াছে, প্রাণকর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা আজ্ঞাচক্রস্থিত কূটস্থ গহ্বরে মনের স্থিতি করিতে পারিলে উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঐ মহান্ বৃহৎ কূটস্থ মধ্যে যে ত্রিকোণ রহিয়াছে উহাই মহদ্‌ব্রহ্মের যোনিস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মযোনি। কূটস্থের ঐ স্থান হইতে অজপার গতি বিস্তার হইয়া থাকে। প্রাণরূপী আত্মা ঐ গর্ভাধান স্থানে ঐ ত্রিকোণ মধ্যে অণুস্বরূপে বা বিন্দুরূপে অবস্থিত হইয়া পরে বিন্দুর বিস্তাররূপে অবয়ব বিশিষ্ট হন। এইভাবে ঐ মহদ্‌ব্রহ্মরূপীযোনি হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে নানা যোনি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে সকল উৎপত্তির

---

(১) গীতা ১৪।৩-৪

মূল ঐ মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ ঐ অবস্থা হইতে গতি প্রাপ্ত হইয়া নানা যোনিতে নানা মূর্ত্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতে তিনিই কর্ত্তারূপে বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা যোনি হইতে যাহা কিছু হইতেছে, ঐ সকল যোনি বিভক্ত, কিন্তু অবিভক্তরূপ ব্রহ্মাই মহদ্‌যোনি, একারণ তিনিই মাতৃস্থানীয়া; আর পিতা আমিই, কারণ উক্ত ত্রিকোন মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অনুস্বরূপে বিন্দুরূপ যাহা রহিয়াছে তাহা আমিই, এই প্রকারে আমিই আপনাতে আপনি থাকি। আবার ঐ বিন্দুর বিস্তাররূপে কূটস্থের রূপান্তর স্বরূপ নানা মূর্ত্তি প্রকাশ করি, এই প্রকারে পিতারূপী আমিই পুত্ররূপে উৎপন্ন হই; পিতারই রূপান্তর পুত্র, তাই আমিই গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা। তাই যোগিরাজ পুনরায় লিখিয়াছেন—**"ত্রিকোন তেজ রূপকি বলিহারি জাই।"** —ঐ যে মহদ্‌ব্রহ্মরূপী ত্রিকোন যোনি তাহার তেজের বলিহারি যাই অর্থাৎ চমৎকার তেজ। যোগিরাজ পুনরায় লিখিয়াছেন—**"জ্যোতির্ম্ময় যোনি দেখা।"**—জ্যোতির্ম্ময় যোনি দেখিলাম। আবার লিখিয়াছেন—**"জ্যোতির্ম্ময় যোনি—রক্তবর্ণ কামবীজ দেখা।"**—জ্যোতির্ম্ময় যোনি, রক্তবর্ণ কামবীজ দেখিলাম। কখনও লিখিয়াছেন—**"ভগবতিকা যোনি মহাদেবকা লিঙ্গ দেখা।"**—দেবী ভগবতীর যোনি ও মহাদেবের লিঙ্গ দেখিলাম। কখনও লিখিয়াছেন—**"এক বড়া ছোটা সরসোকে মাফিক বিন্দি ওহি বড়া দিপককে মাফিক হুয়া ফির এক ছোটা নক্ষত্রকে মাফিক হুয়া। ইহ বিন্দিহি অসল হয়—এহি সব খেল দেখলাতা হয়।"**—ঐ ত্রিকোণ মধ্যে একটা অতি ছোট সরিষা দানার মত বিন্দু উহাই আবার বড় দীপকের মত হইল অর্থাৎ প্রকাশমান হইল, পুনরায় ছোট্ট নক্ষত্রের মত হইল দেখিলাম। ঐ বিন্দুই আসল, উহাই জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছু খেলা দেখাইতেছে। আবার আর একদিন লিখিয়াছেন—**"জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখা—এহি মহাদেবকা লিঙ্গ আউর কিস্নজিকা উর্দ্ধপুচ্ছ।"**—জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখিলাম, উহাই মহাদেবের লিঙ্গ আবার উহাই কৃষ্ণের উর্দ্ধপুচ্ছ। বাহ্যভাবে ইহারই প্রতীক উর্দ্ধপুণ্ড্র, চন্দনাদি দ্বারা যাহা ললাটে লেপন করা হয়। পুনরায় লিখিয়াছেন—**"উর্দ্ধপুণ্ড্র বিশ্বনাথকা লিঙ্গ দেখা।"**—উর্দ্ধপুণ্ড্ররূপী বিশ্বনাথের লিঙ্গ দেখিলাম। একটি ত্রিকোণ ও একটি জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"ওঁ ত্রিকোণ—জ্যোতিরূপ লাল ডোরা সুষুম্নাকা কিনারে মেহিন দেখা—পহলে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখা ফির সূন্যমে সমায় গয়া—**

বড়া মজা রোকনেসে ছচক্র জ্যোতকে ভিতর দেখলাতা হয়। অপূর্ব্ব জ্যোতিরূপ প্রণাম করিতে দেখায়। সর্পাকার জ্যোতিরূপ লিঙ্গের উপর দেখায়।"—ওঁকাররূপী ঐ যে ত্রিকোণ, সেখানে সুষুম্নার ধারে জ্যোতিরূপ মিহি লাল ডোরাকাটা দেখিলাম। প্রথমে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখিলাম, পুনরায় উহা মহাশূন্যে মিলিয়া গেল। উহা থামিলে অর্থাৎ উহার গতি থামিলে বড়ই আনন্দ হয়, ঐ জ্যোতির অভ্যন্তরে সুষুম্নার ছয় চক্রকে দেখা যায়। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিরূপ প্রণাম করিবার সময় দেখা যায়, আবার সর্পাকৃতি জ্যোতিরূপ লিঙ্গের উপর দেখা যায়। **"এক সুন্দরী কামবীজ দেখা।"**—এক সুন্দরী কামবীজ দেখিলাম। **"যোনিরূপা আদ্যাশক্তি দেখা।"**—মহদ্‌ব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিরূপা আদি শক্তিকে দেখিলাম, যেখান হইতে সবকিছুর উৎপত্তি। **"চার বেদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বিরাজমান যোনিকে ভিতর দেখা।"**—ঐ যে মহদ্‌ব্রহ্মরূপী মাতৃযোনিরূপা আদি শক্তি ত্রিকোণ উহার মধ্যে চারি বেদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বিরাজমান দেখিলাম। সত্ত্বগুণের আধিক্য হেতু দেবতাদি সকল দেখা যায়। এইখানেই শেষ নহে, আরও অগ্রসর হইতে হইবে, গুণাতীত হইতে হইবে; সত্ত্বগুণও গুণ। যোনি লিঙ্গ এক করিতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া? **"অর্জ্জুন মৎসভেদ বান মারনা চাহিয়ে—প্রাণায়ামসে ব্রহ্ম জ্ঞান হোতা হয়—তিসকে বাদ ওঁকার—ওঁকার সো রাম হয় সাধো করো বিচার—পহলে শি এয়সা আওজ ভিতরসে হোয়, পিছে ওঁ ইসিসে সোহং কহাতা হয়—পরমহংস কহে—উসকেবাদ ওঁকার ইহ অগাধ মত—য়ানে সমাধি হয়—পবনকো সুরতমে মন লগাকে বুরা ভলা সব মালুম হো জায়—ইসিকে অনুভব কহতে হয়।"**—অর্জ্জুনের মৎসভেদ বাণ মারার মত নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তম প্রাণায়াম করিতে হইবে, উত্তম প্রাণায়াম করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ইহার পর ওঁকার ক্রিয়া, সেই ওঁকারই রাম, সাধু ইহা বিচার করিয়া দেখ। উত্তম প্রাণায়াম করিলে ভিতর হইতে শিঁ শিঁ এই প্রকার ধ্বনি (চাবিতে ফুঁ দিলে যে প্রকার শব্দ) নির্গত হয় উহাই প্রণবধ্বনি; এই প্রকার করিতে করিতে ঐ প্রণবধ্বনির সহিত একীভূত হইলেই সোহহং অবস্থা লাভ হয়, তাহাকেই পরমহংস বলে। ইহার পর যে ওঁকার অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সামাধি অর্থাৎ যখন আর কল্পনা নাই বা যাহার বিকল্প নাই, এমন যে সমাধি সেইখানে পৌঁছাইলে সকলের এক মত, কারণ তখন আর দুই নাই। এই প্রকারে বায়ুক্রিয়া করিতে থাকিলে অর্থাৎ উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিতে থাকিলে জগৎ

সংসারের সার এবং অসার বস্তু অর্থাৎ ভাল মন্দ সবই জানা যায়, ইহাকেই অনুভব বলে। তাই তিনি গাহিলেন—

"মন আয়না মনেতে দেখ।
চাঁদ বদনি চখেতে ॥
লাগা মন ওঁকারেতে।
পাবে মজা কত সে ধ্বনিতে ॥"

"মন জাসনে মন জাসনে জাসনেরে কোথা।
মন দিয়ে মনকে দেখলে হবে সকল বৃথা ॥"

"ইন্দির কর্ম্ম ইন্দ্রি করে,
মন কেন কেঁদে মরে ;
আছাড় খেয়ে পড়ে মরে,
মধ্যে মধ্যে নকল করে।"

(চঞ্চল মনের ধর্ম্মই হইতেছে সে যাহা দেখিবে অর্থাৎ যাহাই তাহার সামনে উপস্থিত হইবে তাহাকেই নকল করিবে, এই প্রকারে সে এদিক হইতে ওদিক আছাড় খাইয়া মরে। কিন্তু ঐ মন স্থির হইলেই আর কিছু নাই। এই মনের উৎপত্তিস্থল কোথায় ? "ধ্বনিকে অন্তরগত জ্যোত যো জ্যোতিকি সূর্য্যসে আতা হয়—উসকে ভিতর মন হয়—ওহি মনমে লয় হোনা বিষ্ণুকা যো পদ হয়—ইসিমে স্বাসা সমায় জাতা হয়।" —ধ্বনির মধ্যে যে জ্যোতি তাহা আত্মসূর্য্য হইতে আসিতেছে, তাহার ভিতর মনের অবস্থান। উহা স্থির মন। সেই মনেতে লয় হইলে তাহাই বিষ্ণুপদ, সেই বিষ্ণুপদে শ্বাস মিলিয়া যায় অর্থাৎ যাহা স্থির মন তাহাই বিষ্ণুপদ। সেইখান হইতেই শ্বাসের উৎপত্তি, সেইখানেই লয়। পুনরায় লিখিয়াছেন— "জ্যোতকে বাদ মন নিরাকার রূপ। নির্ম্মল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিএ।"—নির্ম্মল আত্মজ্যোতির অতীতে মনের (স্থির মনের) অবস্থান, যাহার রূপ নিরাকার। সেই নির্ম্মল রূপে মনকে (চঞ্চল মনকে) লয় করিতে হইবে। "মনেতে যেটা হয় শরীরেও সেইটে হয়, মনের আবরণ গেলে শরীরের আবরণ যাইবে ক্রমশঃ।")—তাই তিনি গাহিলেন—

ওঁকার ধ্বনির শোনরে সুর
যেখানে জ্যোতি প্রচুর।
দেখ দেখ সুরের ভিতর কত সুর
মন সদা তাইতে পুর।
অভ্যাসেতে হবে সবুর

দর্শন হবে মহাপ্রভুর।
ধর ধর টেনে সুর
কাট সব দিয়ে ঐ ক্ষুর।

মন বারে বারে জপ সদা তারে
জেজন অন্তরেরি অন্তর
সদা থাকে অন্তরে।
ভাব বিনে ভাব কেমনে হবে
চিন্তয় সেই ধ্বনিরে।
জখন ডাকবি তারে
বিরলেতে ধ্যান ধরে।
মন নিএ মন দেতো সুরে
অদ্ভুত রূপ দেখো অন্তরে॥

কসে ধরে টান টানো
কেন সোনো ভেন ভেনানো
অমূল্য ধন কালী জেনো
হৃদপদ্মে বসে আছেন
চেষ্টা করে ধরনা কোনো
করে একান্ত মননো
দুধ ঘি খাওনা কেনো
নির্জ্জনেতে টান টানো॥

প্রাণকর্ম্মের যে শিঁ শিঁ সুর তাহাই ক্ষুর, ঐ ক্ষুর দিয়াই সবকিছু কাটিতে হইবে, তাহা হইলেই স্থির হইবে এবং স্থির হইলেই ত্রিগুণাতীত (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) অবস্থা লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের অতীতে চলিয়া যাইবে। তাই তিনি অধিক জোর দিয়া বলিলেন—**"মনমে কুছ নহি, ধ্যান ধরো সবকুছ হয়।"** আরও বলিলেন— **"ধোকা দেনা—য্যানে মন যো খালি হয় উস্কো দেকে মনমে যো পরমেশ্বরকা রূপ হো জানা—ইসিকো বাঙ্গলামে ফাকি দিয়ে নেয়া কহাতা হয়।"—ধেঁাকা দেওয়া অর্থাৎ চঞ্চল মনের দ্বারাতেই মনকে ফাঁকি দিয়া মনকেই জয় করিতে হইবে অর্থাৎ স্থির করিতে হইবে, ঠিক**

যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। কিন্তু মন যতক্ষণ স্থির না হইবে, চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ কোন কিছুই ঠিক থাকিবে না। **"জিসকো বাতকা ঠিকানা নহি উস্কা বাপ য়ানে ভগবানকাভি ঠিকানা নহি।"** অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকিলে কথারও ঠিক থাকে না, আজ এক রকম কাল এক রকম হইয়া থাকে। অতএব মন যতক্ষণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ স্থির স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বহু দূরে। এই মন দেওয়া সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। গোপিনীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইবার সময় তাঁহার জন্য কিছু উপহার লইয়া যাইতে চান। কিন্তু কি উপহার লইয়া যাইবেন? সবই তাঁহার আছে। তাঁহারা চিন্তা করিলেন এমন জিনিষ দিতে হইবে যাহা ভগবানের নাই। অবশেষে গোপিনীগণ দেখিলেন ভগবানের সবই আছে কিন্তু মন নাই যাহা তাঁহাদের প্রচুর আছে। তাই তাঁহারা নিজেদের মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে দিয়া দিলেন। অর্থাৎ ভগবানের চঞ্চল মন না থাকায় মন নাই, যাহা গোপিনীদের আছে। তাঁহারা চঞ্চল মনকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা থামাইয়া মনেতে মন রাখিলেন, চঞ্চল মনকে স্থির করাইলেন অর্থাৎ মন্মনা হইলেন। ইহারই নাম ভগবানকে মন দেওয়া। **"ভিস্ম য়ানে ডর—যবতক সিরমে তিন বান অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নহি মিলা তবতাই উহ স্থির নহি হোত হয় জোকি অগ্নি য়ানে তেজ করকে ন মারে পিছে ওঁকার ধ্বনি বর্ণমে সুনাতা হয়।"**—ভীষ্ম অর্থাৎ ভয় (সাধন করিতে ভয়), যতক্ষণ তিন বান অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না মস্তকে গিয়া না মিলিবে ততক্ষণ স্থির হইল না এবং বায়ু স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ভয় বর্ত্তমান। অতএব শক্তি পূর্ব্বক উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিতে থাকিলে শেষে স্থির হওয়ায় ওঁকার ধ্বনি শুনিবে এবং তাহাতেই মগ্ন হইলে স্থিরস্বপদ আসিবে। যোগিরাজ গাহিলেন—

শরীরের ধর্ম্ম শরীর করে
তুমি কেন মর আমি আমি করে,
যদি কেহ হইতে তুমি এসংসারে
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জগৎময় তুমি,
তোমা বিনা আছে কে জগতের স্বামি।
অমূল্য ধন মন তাহাকে বুঝ তুমি,
সেই করায় তোমায় জগতের স্বামি।
আমি বলে বেড়াও জগতে তুমি,
তোমা ছাড়া আছে কে জগতে প্রভু,

তন্নিমিত্তে আপনাকে আপনি দেখ সেই প্রভু।
তবে পাইবে আনন্দময়ী আনন্দ,
তখনি তোমার হবে পরমানন্দ।
চিন্তা কর কেন দিবানিশি মন,
তোমা বিনা বন্ধু নাহি অন্যজন॥

১৮৭৩ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী লিখিয়াছেন—**"সূর্য্যনারায়ণ ওঁকারকা রূপ দেখা—শরীর বহুত হলকা হুয়া সফেদ পরদা আঁখকে সামনে মালুম হুয়া ফির সূর্য্যকে ভিতর কিস্নুনকা রূপ - ওহি জগৎময়—সত্ত্ব রজ তম রূপ পাঁচ তত্ত্বমে মিলা পদার্থ আউর সব তত্ত্ব উসসে নিকসা—য়ানে নির্ম্মল ব্রহ্ম।"** —আত্মসূর্য্যনারায়ণরূপী ওঁকারের রূপ দেখিলাম, প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে শরীর খুব হালকা হওয়ায় চোখের সামনে যে সাদা পরদা তাহা বুঝিলাম অর্থাৎ মায়াকে বুঝিলাম। পুনরায় ঐ মায়া চলিয়া যাওয়ায় আত্মসূর্য্যের ভিতর কৃষ্ণের রূপ দেখিলাম, উহা জগৎময় ব্যাপ্ত, উহাই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের রূপ। সমস্ত পদার্থ পাঁচ তত্ত্বে মিলিয়া গেল এবং ইহাও দেখিলাম যে ঐ পাঁচ তত্ত্বও ঐ আত্মসূর্য্য হইতে আসিতেছে, যাহা নির্ম্মল স্বচ্ছ ব্রহ্ম। ১৯শে এপ্রিল ১৮৭৩ খৃঃ লিখিলেন—**"আপনাহি স্বরূপ নারায়ণকা দেখা। এহি আপনা রূপ হয় ফির এহি নিরাকার ওঁকার হয়। ওহি ওঁকার আদি বেদ হয়।"**—নিজ স্বরূপ নারায়ণকে দেখিলাম। ইহাই নিজ রূপ আবার ইহাই নিরাকার ওঁকার। ঐ নিরাকার ওঁকারই আদি বেদ। ৩রা জুন ১৮৭৩ খৃঃ লিখিলেন—**"অব স্বরূপ দর্শন হুয়া—উহ রূপ ত্রিকুটিকে ভিতর হয় - হংস উস্কো কহে জব সংসয় জায় আউর সফেদ দেখে আউর সুদ্ধ ভিতর ভিতর আওএ আউর যায় যো আজ হুয়া—বড়া মজা।"**—এখন স্বরূপ দর্শন হইল, এই স্বরূপ দর্শন ত্রিকুটির ভিতর হয়, উহাকেই হংস বলে; তখন সকল প্রকার সংশয় চলিয়া যায় এবং সবকিছুই সাদা দেখা যায়, কারণ সাদা কোন রঙের মধ্যে নহে। ইহাই শুদ্ধাবস্থা যাহা ভিতর হইতে আসে ও যায়, তাহা আজ হইল। ইহাতে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ১৯শে জুন ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—**"কূটস্থ অক্ষর নারায়ণকে রূপ হোজাতা হয়।"**—কূটস্থ অক্ষর নারায়ণের রূপ হইয়া গেল। পরের দিন ২০শে জুন লিখিয়াছেন—**"আপনা রূপসে ভিন্ন রূপ দেখ পড়া। নারায়ণকা রূপ অন্তর দৃষ্টিমে মালুম হোতা হয়।"**—নিজের রূপ অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ দেখিলাম। নারায়ণের রূপ অন্তর দৃষ্টিতে দেখা যায়। ১৮৭৩ খৃঃ ৮ই জুলাই লিখিয়াছেন—**"এক শ্বেত পুরুষ আপনে মাফিক দেখা।"**

—নিজের মত এক শ্বেত পুরুষকে দেখিলাম। ১৮৭৩ খৃঃ ২৮শে জুলাই লিখিয়াছেন—"**আপনা রূপ দেখা—নারায়ণকা রূপ হয়--বড়া মজা--অব কাম করণেমে আসকত হুয়া।**"—নিজ রূপ দেখিলাম, উহাই নারায়ণের রূপ, এখন বড়ই আনন্দ হইল এবং এখন কাজ করিতে আলস্যবোধ হইতেছে, মনে হইতেছে চুপচাপ পড়িয়া থাকি। এই সময়ে তিনি সারারাত ধরিয়া সাধন করিতেন, ফলে নিদ্রা যাহাতে জয় করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তাই তিনি ১৮৭৩ খৃঃ ১১ই আগষ্ট লিখিলেন—"**আজ বাঁস্থলিকা আওয়াজ আচ্ছা হুয়া সূন্য ভবন মিল রহনা চাহিএ—রাতকা সোনা কইসে ন হো—ইসকা কোসিস করেঙ্গে। নেসা আউর গাঢ়া ও সূন্য আউর সাফ।**"—উত্তম প্রাণায়ামে যে বাঁশির মত শব্দ নির্গত হয়, যাহাকে প্রণব ধ্বনি বলে তাহা আজ খুব ভাল হইল এবং এই প্রণব ধ্বনিকে ধরিয়া শব্দের অতীতে যে মহাশূন্য (ব্রহ্মে) সেই মহাশূন্যে পঁাছিলাম, সেইখানে মিলিয়া থাকিতে হইবে, লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে; কিন্তু সেই লয় প্রাপ্ত হইতে হইলে যে দীর্ঘ সাধন প্রয়োজন সে সময় সংসারে থাকিয়া পাওয়া যায় না, অতএব সারারাত্র সাধন করিতে হইবে এবং সারারাত্র সাধন করিতে হইলে অবশ্যই নিদ্রাকে জয় করিতে হইবে, এখন তাহারই চেষ্টা করিতেছি। এখন ক্রিয়ার নেশা আরও গাঢ় হইল এবং শূন্যব্রহ্ম আরও পরিষ্কার হইল। ১৪ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ—"**অব রাতমে নিদ কম আতা হুয়—বড়া স্থির বড়া নেসা।**"—এখন রাত্রে নিদ্রা কম আসিতেছে ক্রিয়া করিতে করিতে অত্যন্ত স্থির ও নেশা হইতেছে। ৭ই অক্টোবর ১৮৭৩খৃঃ লিখিলেন—"**রাতকো নিদ ন আওএ।**"—আর রাত্রে নিদ্রা আসিতেছে না, নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে জয় হইয়া গিয়াছে, অতএব এখন আর সারারাত্র ক্রিয়া করিতে কোন অসুবিধা নাই। প্রাণ চঞ্চল থাকিলেই দেহবোধ বর্ত্তমান থাকে, অতএব নিদ্রারও প্রয়োজন থাকে। কিন্তু প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন প্রাণ স্থির হইয়া যায় তখন আর নিদ্রার প্রয়োজন হয় না, যোগী এই প্রকারে দীর্ঘ সময় সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে অভ্যস্থ হন। তাঁহার অক্সিজেনেরও (Oxygen) প্রয়োজন হয় না। প্রাণী মাত্রেই অক্সিজেন (Oxygen) লইয়া থাকে এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide) ত্যাগ করিয়া থাকে। এই প্রকারে অক্সিজেন গ্রহণ করায় প্রতিটি কোষ কার্য্যকরী থাকে এবং তাহাদের কার্য্য বর্ত্তমান থাকায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যোগী যোগ ক্রিয়ার দ্বারায় যখন নিজ দেহস্থ প্রতিটি কোষকে কার্য্য রহিত করিতে সমর্থ হন তখন তিনি অক্সিজেন

ছাড়াই অবস্থান করেন এবং অক্সিজেন না লওয়ায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিতে হয় না। এই অবস্থায় কোষগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্য্য রহিত হইলেও সেগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। যোগী যখন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন তখন পুনরায় সমস্ত কোষগুলি সহ হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ও মস্তিকে অক্সিজেন গ্রহণ কার্য্য চালু হওয়ায় সকলেই কার্য্যক্ষম হয়, বাহ্য শ্বাসের গতি চালু হয়—ইহাকেই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বলে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি"—অর্থাৎ দেহের চঞ্চল অবস্থাতেই ঘুমের প্রয়োজন, স্থির অবস্থায় ঘুমের প্রয়োজন নাই। তাই চঞ্চল অবস্থার যে ঘুম তাহা চঞ্চল অবস্থাকেই ফেরৎ দিয়া তিনি স্থির হইলেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌঁছাইয়া গেলেন।

তিনি বলিতেন—"**সকল ধর্ম্মের গুপ্ত মর্ম্ম যে মহাদ্যুতি কূটস্থ তাহাকে জানা চাই। ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া। সত্য ত্রেতা দ্বাপর বলিতে ক্রমশঃ ক্রিয়ার হ্রাস হয় অর্থাৎ সমাধি হইতে বিজ্ঞানপদ, বিজ্ঞানপদ হইতে জ্ঞান, আর জ্ঞান হইতে ক্রিয়া কম। সত্যযুগে কূটস্থে থাকা, ত্রেতাতে কূটস্থ দেখা, দ্বাপরে ক্রিয়ার দ্বারায় আনন্দ লাভ করা, কলিযুগে ক্রিয়া দেওয়া।**" আরও বলিতেন—"**সত্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ত্রেতা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর, দ্বাপর অর্থাৎ ক্রিয়া করার সময় এবং কলি অর্থাৎ ক্রিয়া না করা অবস্থা।**" এই প্রকারে চার যুগকে এই দেহেই জানিতে হইবে, শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"**বেদ সমুদায় ধর্ম্মের মূল অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারায় সব জানা যায়। শ্রুতি অর্থাৎ বিনা কথায় যাহা শোনা যায়, স্মৃতি অর্থাৎ শুনে যে স্মরণ করা ইহাই মর্ম্ম কথিত, মনুষ্যেতে স্থির করিয়াছে ক্রিয়া করিয়া কির্ত্তিকে পায় ইহলোকে মরে ব্রহ্মেতে লীন হইয়া পরম সুখ প্রাপ্তি হয়।**" আরও বলিয়াছেন—"**কথা বিনা যাহা শোনা যায় তাহার নাম শ্রুতি তাহা জানার নাম বেদ, তাহা স্মরণ করিয়া যাহা এক পদার্থ অর্থাৎ ক্রিয়া তাহার নাম শাস্ত্র; ঐ বেদের অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি মিমাংসা হইবার যো নাই কারণ হঠাৎ আসিয়া পড়ে তাহারি দ্বারায় ক্রিয়া করিতে করিতে প্রকাশ হয়। বেদ স্মৃতি সদাচার অর্থাৎ ক্রিয়া আর আত্মার প্রিয় অর্থাৎ স্থির হওয়া এই চার সাক্ষাৎ ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার লক্ষণ জানা যায়।**" গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পারের খেয়া স্বরূপ এই সহজ ক্রিয়া করিতে থাকিলে যে ভবসংসাররূপ বৈতরণী পার হওয়া যায় সে সম্বন্ধে যোগিরাজ ১১ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ

দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—**"ওঁকার শ্বেতরূপ—ওহি জলকা রূপ ওহি আদি রূপ—সহজ স্বভাব সূন্যকা সহজ গুরু বাক্যমে বিশ্বাস করনেসে সহজ সহজ ক্রিয়া করে তো পার উতরে হয়—জয়সা কোই ডুবতা হয় আউর কোই তএরনেওয়ালেকা কমর ইসারেসে পকড়কে দোনো তএর করকে পারলগে আউর লগাওএ আউর আগর উহ জোর করকে পকড়েতো আপ ডুবে আউর বচানে ওয়ালেকোভি ডুবাওএ ওএসেহি গুরু চেলা—কেঁওকি যো গুরু সোই চেলা।"**—ওঁকার রূপ যাহা সাদা তাহাই জলের রূপ তাহাই আদি রূপ, সেই মহাশূন্যে স্থিতি হইলে উহাই তখন সহজ স্বভাব অর্থাৎ আত্ম-ভাব বা স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে প্রাণের যে চঞ্চল অবস্থা তাহা তখন অস্বাভাবিক হইয়া যায়। গুরুবাক্যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই সহজ ক্রিয়া করিতে থাকিলে জন্ম-মৃত্যুশীল ভবসংসার অতিক্রম করা যায়। যেমন কেহ ডুবিয়া যাইতেছে তখন অপর কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিলে সে যদি তাহার কোমর আস্তে করিয়া ধরে তাহা হইলে উভয়েই উঠিতে পারে, কিন্তু সে যদি জোর করিয়া ধরে তাহা হইলে নিজেও ডুবিয়া যায় এবং যে ব্যক্তি উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল সেও ডুবিয়া যায়; এই উভয় ব্যক্তির যেমন সম্পর্ক তেমনি গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, কারণ যিনি গুরু তিনিই শিষ্য। **"এককে আঁখ উঠা বিমারি দেখনেসে বহুত দের তক জয়সা উস্কা ছুয়া ছুতসে উসকোভি আঁখ আতা হয় ওয়সা কূটস্থ অক্ষরকো দেখনেসেভি ওহি রূপ হো জাতা হয়—ইসমে সন্দেহ নহি।"**—যেমন এক ব্যক্তির চোখ উঠিলে অপর কেহ যদি তাহার সেই চোখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকাইয়া থাকে এবং ছোঁয়াছুঁয়ির দরুণ যেমন তাহারও চোখ উঠিয়া যায় তেমনি প্রতিদিন ক্রিয়া করিয়া কূটস্থঅক্ষর দেখিতে দেখিতে নিজেও ঐরূপ হইয়া যায়—ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। তাই তিনি গাহিলেন—

"হরি ভজন বিনা নাইকো গতি,
জিনি অগতির পরমগতি ;
সেখানে গেলে নাই পুনরাগমন,
ইন্দ্রিয় সব হবে আপনি দমন।
সুখ সেখানকার কে বলবে কেমন ;
যার হয়না কখন নিধন,
যে পেএছে অমূল্য ধন ;

অতুল সুখের কে করিবে বর্ণন ,
ভক্তি হলে পাবে চরণ ॥"

২৪শে আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"**বাসনা ছোড় দে তো খুদ বাসুদেব হোয়। বাসু=বাসনা, দেব=মালিক**[1]। **যব বাসনাকো ছোড়ে তো খুদ মালিক হোয়—হমহি সূর্য্যকা রূপ**।"—সমস্ত প্রকার বাসনা ছাড়িয়া দিলে নিজেই বাসুদেব হয় অর্থাৎ মালিক হয়। প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন নিজ সত্তা বিলীন হইয়া সবকিছু আকাশবৎ হয় তখন নিজেই মালিক হয়, কারণ সেই স্বচ্ছ ব্রহ্মাকাশই সর্বত্র বিরাজমান, উহাই মালিক। তাই তিনি গাহিলেন—

"তুম কভি মৎ ছোড়ো
উহ সাঁইকো—
জবতক ন মিলাওএ
আপকো।"

১৮৭৩ খৃঃ ৩রা মে লিখিয়াছেন—"**হমহি সূর্য্যকা রূপ নির্ম্মল জ্যোতি—জব নির্ম্মল জ্যোতি দেখতে হঁয় তব হম ছোড়ায় দুসরা কোই ন দেখতে হয়—লেকন অব নির্ম্মল জ্যোতমে সমানা চাহিয়ে**।"—আমিই আত্মসূর্য্যরূপী নির্ম্মল জ্যোতি, যখন সেই নির্ম্মল জ্যোতি দেখি তখন আমি ছাড়া আর কেহই দেখে না, কিন্তু এবার সেই নির্ম্মল আত্মজ্যাতিতে মিলিয়া যাইতে হইবে, জ্যোতি এবং আমি এক হইতে হইবে, লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। পরদিন লিখিয়াছেন—"**যো বিন্দি সোই সূর্য্য—তব ঘর উজিয়ালা হোতা হয়**।"—কূটস্থে এই যে ধ্রুবতারারূপ বিন্দু দেখা যাইতেছে ইহাই আত্মসূর্য্য, এই আত্মসূর্য্য দর্শনে সবকিছু পরিষ্কার হইতেছে। পরদিন ৫ই মে লিখিয়াছেন—"**নির্ম্মল জ্যোতি ভগবানকা হয়—জ্যোতি আকাশকে মাফিক**।"—ভগবানের সেই নির্ম্মল জ্যোতি, সেই জ্যোতি আকাশের মত। ১৮৭৩ খৃঃ ১২ই আগষ্ট লিখিয়াছেন—"**আসমানকে ত্রিকুটিমে অক্ষর ফির উসিসে জ্যোতরূপ—উস্কা বড়া নির্ম্মল রূপ**।"—কুটস্থের মধ্যে যে আকাশবৎ ত্রিকুটি তাহাই পরম অক্ষর, পুনরায় উহা হইতেই জ্যোতিরূপ, উহা বড় নির্ম্মল। ২৮শে আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ—"**জিভ জব তালুমূলমে লগতা হয় তব খট্টামিঠা সওয়াদ মালুম হোতা হয়—আউর গাঢ়া—অব বহুত স্থির হয়—আজ প্রাণায়াম**

(১) দেব=দিব্‌ অর্থাৎ আকাশ।

থোড়া হুয়া—ওঁকারকা ধ্বনি পিছে তরফ সুনাতা হয়।"—জিহ্বা উঠিয়া যখন তালুমূলে প্রবেশ করে তখন টক-মিষ্টি স্বাদ বোঝা যায়। আজ আরও গাঢ় প্রাণায়াম হওয়ায় অধিক স্থির হইল এবং ওঁকারধ্বনি মস্তকের পিছনে শুনা গেল। ১২ই নভেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ কূটস্থের মধ্যে একটি বিন্দু আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন **"এহি অগম স্থান হয় ইসিমে ঠহরনা চাহিএ।"**– কূটস্থের অন্তর্গত এই যে স্থির বিন্দু ইহা অগম্য স্থান, এই স্থির বিন্দুতে থামিতে হইবে, বিন্দুমাত্র মন চঞ্চল থাকিলে ঐ বিন্দু স্থির হয় না। প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন সবকিছু থামিয়া যায়, যখন মনাতীত, ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় তখন ঐ বিন্দুও স্থির হয়। জীবের যে বর্ত্তমান মন, বুদ্ধি ইহাদের সেই স্থির বিন্দুতে পৌঁছিবার সাধ্য নাই, তাই বলিতেছেন উহা অগম্য স্থান। সেই অগম্য স্থির বিন্দুতে আটকাইয়া থাকিতে হইবে। ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—**"ইহ শরীরকে ভিতর দুসরা এক শরীর হয় এয়সেহী লেকন কালা।"**—এই শরীরের ভিতরে এই রকমই আর একটি শরীর আছে, উহা কালো। ইহাকেই বলা হয় স্বরূপ দর্শন। দর্পনের সামনে দাঁড়াইলে যেমন নিজ শরীর দেখা যায়, তেমনি প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন মন স্থির হইয়া কূটস্থরূপী দর্পনের সামনে স্থির হয় তখন অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নিজরূপ দর্শন হয়। ইহাই কারণশরীর। শরীর তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল শরীরের অন্তর্গত সূক্ষ্ম শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত কারণ শরীর, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম নিদ্রিত হয়, কিন্তু কারণ শরীর নিদ্রিত হয় না। উহাই পরবর্ত্তী দুই শরীরের আধারস্থল বা আশ্রয়স্থল। যোগিরাজ গাহিলেন—

"মায়া রখো ময় ছোড়ো
সতপর আগে বঢ়ো
সিঢ়ি সিঢ়ি আগে চঢ়ো
তব হোগা সুখ বড়ো
ঝুটে মনসুবা ক্যা গড়ো
শ্রীমান সা'মনে খড়ো
ওহি আঁখপর পড়ো
ফির একহি হো পড়ো॥"

"গলেমে মিঠা মালুম হুয়া আউর ভিতর ভিতর চলা আউর বড়া নেশা মালুম হুয়া এয়সা হমেসা চাহিএ।" - জিহ্বা ঊর্দ্ধে উঠিয়া তালুকুহরে প্রবেশ করিল তখন মিষ্ট স্বাদ পাইলাম এবং শ্বাস ভিতরে ভিতরে চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় যে গাঢ় নেশা হইল, এই প্রকার নেশা সব সময় প্রয়োজন। **"নির্ম্মল ব্রহ্ম মালিক, ব্রহ্ম জলকা রূপ হয়, ব্রহ্মই সর্ব্বময়।"**—স্বচ্ছ, আবরণহীন, নির্ম্মল যে ব্রহ্ম তিনিই সবকিছুর মালিক; কারণ সেই ব্রহ্ম হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি। সেই ব্রহ্ম জলের রূপ; কারণ জলের কোন রূপ নাই, যে পাত্রে রাখা যায় সেই রূপই ধারণ করে। এই প্রকার যে অরূপ শূন্যরূপী ব্রহ্ম তাহা আবহ্মস্তম্ব সর্বত্র বর্ত্তমান। **"সূর্য্য হমারা রূপ যো ওঁকার হয় ওহি স্থির ঘর যানেকা রস্তা হয়।"**—আত্মসূর্য্যই আমার রূপ, উহাই ওঁকার, উহাই স্থির ঘরে পৌঁছাইবার রাস্তা, কারণ বারবার ঐ আত্মসূর্য্য দর্শন করিতে করিতে তবেই যোগী স্থিরত্ব অবস্থা লাভ করেন, স্থির অবস্থায় আর দেখাদেখি নাই, জানাজানি নাই। **"নাককে উপর তাককে ভৌকে উপর কপালকে বিচমে তাককে ঠহর রহনা কঠিন হয়—ইসিসে স্থিতিপদ য়ানে সমাধি হোতা হয়।"**— নাকের উপর দুই ভ্রূর মাঝে ললাটে চক্ষুদ্বয় উর্দ্ধস্থিত অবস্থায় স্থির করিয়া তাকাইয়া থাকা বড়ই কঠিন, কিন্তু এই প্রকারে থাকিতে পারিলে স্থিতিপদ অর্থাৎ সমাধি হয়।[১] **"জিভ ডহিনে নাককে ছেদমে ঘুষা ফির বাএ ছেদকে ভিতর এক অঙ্গুল—আব খিচনেসেভি সি এয়সা শব্দ আতা হয় আউর ফেকনেসেভি।"**—জিহ্বা উপরে উঠিয়া ডান দিকের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করিল, পুনরায় বাম দিকের নাকের ছিদ্রে এক আঙ্গুল প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় প্রাণায়াম টানিবার সময় ও ফেলিবার সময় উভয় সময়েই শিঁ এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল। উত্তম প্রাণায়ামে শিঁ শিঁ শব্দ বাহির হয়। **"জিভ দোনো নাককে ছেদকে উপর চলা আউর যো সূন্য বাহর সোই ভিতর দেখলাই দেতা হয়।"**—জিহ্বা আরও উপরে উঠিয়া উভয় নাসাপুট অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উঠিয়া গেল। এই অবস্থায় প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে স্বচ্ছ মহাশূন্য বাহিরে এবং ভিতরে সর্ব্বত্র দেখিতেছি; বাহির এবং ভিতর এক হইয়া গেল। **"আকাশ নারায়ণ হয়—ব্রহ্ম ধ্যান আসল হয় হৃদয়মে স্থিত হয় সত্য রূপ হয়—মায়া ধোকা।"**—এই স্বচ্ছ মহাশূন্যরূপী

(১) বই পড়িয়া বা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ না করিয়া কাহারও এই কর্ম্ম করা উচিত নহে। দীর্ঘ প্রাণায়ামের পর এইভাবে বসিয়া থাকা উচিত।

আকাশ তিনিই নারায়ণ। ব্রহ্ম ধ্যানই আসল, ইহা সকলের করা কর্ত্তব্য [১]। ঠোকর ক্রিয়ার কৌশল দ্বারা (গুরুবক্তৃগম্য) যখন হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয় তখন হৃদয়ে স্থিতি অবস্থা লাভ হওয়ায় প্রকৃত সত্যরূপ প্রকাশিত হয়, তাহার পূর্ব্বে যে চঞ্চলরূপ মায়া তাহা ধোঁকা, অলীক। **"আউর মজা স্থির ঘরকা ওহা মালুম হোতা হয় বহুত দেরতক ঠহরে হয়—নির্ম্মল আকাশবৎ ব্রহ্ম মালুম হোতা হয়।"**—স্থির ঘরে পৌঁছিয়া অধিক আনন্দ হইল এবং ইহাও বুঝিলাম যে ঐ স্থির ঘরে অধিক সময় অবস্থান করিলাম। স্বচ্ছ, নির্ম্মল মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মকে বুঝিলাম। পুনরায় লিখিয়াছেন—**"স্থির বায়ুতে থাকিলে হৃদয় এমত নির্ম্মল হয় যে কথা কহিলে হৃদয়ে ধাক্কা ইহা অনুভব হয়। খেচরি হইলে আকাশেতেই চলিয়া জায় অর্থাৎ চলায় কোন ক্লেশবোধ হয় না। ইচ্ছা হইতে অহঙ্কার সেই ইচ্ছা স্থির হইলেই বুদ্ধি তিনি ঈশ্বর। অলব্ধ ধন পাইলে যেরূপ তৃপ্ত মন হয় তৎ সহস্রগুণ সমাধিতে মন তৃপ্ত হয়—ব্রহ্ম সুদ্ধ অর্থাৎ কোন দ্রব্য হইতে নির্গত হয় নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট নয়।"** নারায়ণ বা শিব পূজা করিবার সময় প্রথমে নারায়ণ বা শিবকে স্নান করাইয়া, তারপর পূজা করিয়া, তারপর সেই দেবতার ধ্যান করিবার বিধি প্রচলিত আছে, ইহাই বাহ্য পূজার নিয়ম। কিন্তু যোগিরাজ বলিতেছেন—**"মহাদেবের প্রথমে স্নান তারপর ধ্যান ইহা অসম্ভব, কারণ প্রথমে ধ্যান উচিত ছিল—মতলব—আত্মাকে জানা উচিত ব্রহ্ম তন্নিমিত্ত প্রথমে স্নান আপনার আবশ্যক পরে ধ্যান।"** এই প্রকারে তিনি অন্তর্মুখী সাধনার উপরই জোর দিতেন বেশি ; তাই দেখা যায় তিনি বাহ্য তীর্থ ভ্রমণ না করিলেও অন্তর্মুখী-ভাবে সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। অন্তর্মুখী তীর্থেরই প্রতীক বাহ্য তীর্থ। যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"কূটস্থ অক্ষর আসল রূপ ওঁকারকা য়ানে স্বাসা হমেসা ধারণ করনেসে বলদেবকা নাম হলধর হুয়া, উহ চন্দ্রমারূপি প্রভাস তীর্থমে (চন্দ্রকা উদয় হোনা প্রভাস তীর্থ হয়) পহলে স্নান কিয়া পিছে ফির সুষম্না উদয় হোনেসে কূটস্থ অক্ষর দেখা তব সরস্বতী নদী স্নান কিয়া—ফির যব স্বাসা স্থির হুয়া তব অগ্নিতীর্থনামামে স্নান কিয়া—ফির জব পঞ্চশ্রোতা জব নিকসে তব পঞ্চবদরিকা নামা তীর্থস্নান কিয়া।"** —কূটস্থ অক্ষরই ওঁকারের আসল রূপ অর্থাৎ শ্বাস সর্ব্বদার জন্য ধারণ করিলে অর্থাৎ দীর্ঘ সময় আপনা হইতেই কেবল-কুম্ভক প্রাপ্ত হইলে

---

(১) পণ্ডিতগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করা যায় না, ইহা ঠিক নহে।

বলদেবের নাম হলধর হইল। কারণ বায়ুই বল, অতএব বায়ুই বলদেব এবং বায়ুই হলধর। কূটস্থে যে কৃষ্ণচন্দ্র দেখা যায় তাহাই প্রভাস তীর্থ, সেই প্রভাস তীর্থে প্রথমে স্নান করিলাম; তারপর যখন সুষুম্নার উদয় হইল তখন কূটস্থ অক্ষর দেখিলাম, তাহাই সরস্বতী নদীতে স্নান। পুনরায় যখন শ্বাস সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া গেল তখন অগ্নিতীর্থে স্নান করিলাম। পুনরায় যখন পঞ্চস্রোত বাহির হইল অর্থাৎ সহস্রার নির্গত অমৃতধারা বাহির হইল তখন পঞ্চবদরি তীর্থ স্নান করিলাম। এইরূপে যোগিরাজ নিজ দেহমধ্যেই সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। বাহ্য তীর্থ ভ্রমণে আত্মলাভ হয় না। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি
তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি
কথং মোক্ষং বরাননে॥[১]

অর্থাৎ তামসিক ব্যক্তিরাই এই তীর্থ সেই তীর্থ ঘুরিয়া বেড়ায়। হে বরাননে, আত্মতীর্থ না জানিলে মোক্ষলাভ হয় না।

পুনরায় লিখিয়াছেন—**"গঙ্গাজিকি লহর আঁখ মুদকে থোড়া থোড়া দেখা।"**—চোখ বুজিয়া সুষুম্নারূপী গঙ্গার ঢেউ বা তরঙ্গ অল্প অল্প দেখিলাম। ইহাকেই বলা হয় লহরীলীলা। কৈলাস শিখরে হর-পার্ব্বতী বিরাজমান অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"শিরকে আধে উপর কৈলাশ পাহাড় য়ানে সহজদল পদ্ম জিসমে হর পার্ব্বতী বিরাজমান দুরসে দেখা যায়।"**—মস্তকের অর্দ্ধেক উপরে কৈলাস পর্ব্বত অর্থাৎ সহস্রদল পদ্ম যেখানে হর-পার্ব্বতী বিরাজমান দূর হইতে দেখা যায়। **"কাশী মহাদেবকে ত্রিশুলকে উপর হেয়, কাশী ইয়ানে প্রকাশ মহাদেব ইয়ানে সুষম্না ইড়া পিঙ্গলা ইয়ানে ত্রিগুণ।"**—কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত, ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন গুণই ত্রিশূল। কাশী অর্থাৎ প্রকাশ এবং মহাদেব অর্থাৎ সুষুম্না অর্থাৎ সত্বগুণ। গোমুখীর চিত্র আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"গোমুখি দেখা।"**—গোমুখ তীর্থ দেখিলাম। **"নাড়ি নক্ষত্র ঠিক হোত সুফল হোয় সব কর্ম্ম, নহিতে বিফল হোত হঁয় সব ধর্ম্ম।"**—জন্মকালে জাতকের জন্মনক্ষত্র যদি ঠিক থাকে অর্থাৎ অনুকূল থাকে তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম সুফল হয়, আর যদি অনুকূল না

---

(১) জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র

থাকে তাহা হইলে সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিফল হয়। **"জিভ উঠকে জয়সা বিলকুল স্বাসা বন্দ হো গয়া ও মিঠা মালুম হোনে লগা।"**—জিহ্বা উঠিয়া যাওয়ায়, তালুকুহরে প্রবেশ করায় বাহিরের শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল, আর বাহিরের দিকে শ্বাসের টানাও নাই ফেলাও নাই। এই অবস্থায় জিহ্বাগ্রে এক মিষ্ট স্বাদ অনুভব হইতে লাগিল। **"সুসম্নায় বায়ু গেলে কুপের মতন গলায় ছিদ্র অনুভব হয়।"**—প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন প্রাণবায়ু সুষুম্নায় প্রবেশ করে তখন কণ্ঠমধ্যে কূপের মত এক ছিদ্র অনুভব হয়। **"স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনা আপনি প্রকাশ অর্থাৎ ইচ্ছারহিত, ইচ্ছা থাকিলে কখন কিছু হয় না।" "অব বড়া মজা হুয়া হয় শ্বাসা একদম সোউত্তক ঘুস গয়া অবিনাসি য়ানে ত্রিকুটিকে টিকিয়া আনে জ্ঞানচক্ষু হর হমেশ আঁখকে সামনে খড়া।"**—এখন বড়ই আনন্দ হইল, শ্বাস সম্পূর্ণরূপে সুষুম্নার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল, তখন বুঝিলাম অক্ষয় অবিনাশী কূটস্থরূপী জ্ঞানচক্ষু সর্ব্বদা চোখের সামনে বর্ত্তমান। **"হমহি নিলকা কোঠি হমহি কিস্নুনজি।"**—আমি নীল বর্ণ কুটি অর্থাৎ নীলমাধব, আমিই কৃষ্ণ। **"জো কিসুণ সোই সূর্য্য সোই পানি।"**—যিনি কৃষ্ণ তিনিই আত্মসূর্য্য তিনিই কারণবারি। **"বারে বারে সূর্য্যকে দেখতে ইচ্ছা করে।" "জো হম সোই সূর্য্যকা জ্যোতি।"**—যাহা আমি তাহাই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি। **"আপন রূপ আসল।"**—নিজ রূপই আসল। **"জগৎকে সার সূর্য্য হয় ওহি রূপ তুমারা হয়।"** জগতের সার আত্মসূর্য্য, কারণ সবকিছুই আত্মসূর্য্য হইতে উৎপন্ন, উহাই তোমার আমার সকলের রূপ। **"তুমহি তুম হো তুম ছোড়ায় দুসরা নহি তব লয় স্পর্শ।"**—তুমিই সেই. তুমি কিন্তু তুমি নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই, প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন এই অবস্থা হয় তখনই লয় স্পর্শ হইল। কপালের উপর একটি সূর্য্য অঙ্কন করিয়া তাহার নীচে লিখিয়াছেন—**"সূর্য্যকা দুসরা রূপ জম ওহি হম—সূর্য্যই হম। জো স্বাসা সোই সূর্য্যকা জ্যোত সোই হম—সূর্য্যসে ইহ স্বাসা আতা হয়—ইহ সমঝনা জল্দি নহি হোতা হয়।"** আত্মসূর্য্যের দ্বিতীয় রূপ যম অর্থাৎ মৃত্যুর স্থান, আবার উহাই আমি। ঐ আত্মসূর্য্যই যম আবার উহাই আমি। যাহা শ্বাস তাহাই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি, আবার উহাই আমি, কারণ ঐ আত্মসূর্য্য হইতে এই শ্বাস আসিতেছে, উহাই শ্বাসের উৎসস্থল; অবশ্য ইহা তাড়াতাড়ি অর্থাৎ অল্প সাধনে বোঝা যায় না, এরজন্য কঠোর

সাধন প্রয়োজন। **"সূর্য্য ও জ্যোত ফির ওহি কারণবারি হোতা হয় উসিসে সব উৎপত্তি আউর উসিসে লয়। অব স্বাসা ভিতর ভিতর জাতা হয় থোড়া বাহর ভি জাতা হয়। আজ মন সঙ্গ দেশেসে একদফা খবার গয়া ইসসে প্রভুকা দর্শন ও ধ্বনি আজন দেখনে সুনা—স্ত্রী পুরুষকা কাল হয় ইস্কে তরফ তাকনা নহি, ভুল করকেভি চাহিএ না।"**—ঐ আত্মসূর্য্য এবং তাহার জ্যোতি উহাই কারণবারি, সেই কারণবারি হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয় হয়। এখন শ্বাস ভিতরে প্রবেশ করিতেছে আবার কিছু বাহিরেও যাইতেছে। প্রাণ-কর্ম্ম করিতে করিতে এমন অবস্থা হইল যে আজ মন সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ বর্জিত হইল, এই অবস্থায় প্রভুর দর্শন হইল এবং ওঁকার ধ্বনির প্রকাশ দেখিলাম ও শুনিলাম। ইহাই স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের কালস্বরূপ, ইহার প্রতি কখনও তাকাইবে না, ভুল করিয়াও দেখিবে না। কারণ প্রাণের যে স্থির অবস্থা তাহার দুইটি দিক্ আছে—একটি বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপ্তি এবং অপরটি কালস্বরূপ নিধন কর্ত্তা। যোগিরাজ বলিতেছেন—এই কালস্বরূপ নিধন কর্ত্তার প্রতি যেন যোগী দৃষ্টি না দেন। অবশ্য উভয় অবস্থাই যোগীর নিকট আসিবে এবং উভয় জ্ঞানকেই লাভ করিতে হইবে, কিন্তু তবুও যোগীর কর্ত্তব্য ঐ কালস্বরূপ নিধন কর্ত্তার দিকে নজর না দেওয়া, নজর দিলেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। তাই তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। **"আজ কিসিকে কুছ কহেসে মন দব গয়া হয়। জিভ বিলকুল আটক রহত হয় আউর স্বাসা ভিতর ভিতর চলতা হয়। অব ইস কদর নেসা হোতা হয় কি নেসাকে মারে আঁখসে সুবাতা নহি হরফ লিখনেকা ন নজর পড়ে—আউর নিদ অয়সা নেসা ঘের আওএ।"**—আজ কোন ব্যক্তিকে কিছু বলায় মন দাবিয়া গিয়াছে। জিহ্বা সম্পূর্ণরূপে উপরে উঠিয়া গিয়া তালুরন্ধ্রে প্রবেশ করায় আটকাইয়া গেল এবং শ্বাসের গতি অভ্যন্তরমুখী হওয়ায় ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। এই অবস্থায় প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধে ওঠায় এমন নেশা হইল যে সেই নেশার তীব্রতায় চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, লিখিবার সময় অক্ষর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না এবং নিদ্রার সময় যেমন ঢুলুনি আসে সেইরকম গাঢ় নেশা ঘিরিয়া আসিল। **"কসাক ভিতর ভিতর প্রণাম করতে বখত্ আঁখ বন্ধা হো যাতা হেয় আউর কুচ্ বুঝাতা নেহি বড়া নেসা হেয় ও বড়া মজা হেয়।"—বলপূর্ব্বক ভিতর ভিতর**

প্রাণকর্ম্ম করিবার সময় চক্ষুদ্বয় আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং কিছুই বুঝিতেছি না, এখন গাঢ় নেশা ও প্রচুর আনন্দ হইতেছে। **"ফি ১লা প্রণাম খিচনে মে তকলিফ, বন্দ করনে মে তকলিফ, ছোড়নেমে আরাম লেকিন্ হাওয়া পেটকে ভিতর নাহিরতা। দুসরা প্রণামমে যো কী গলা ও নাককে ভিতর হেয় তালুতক উঠতা হেয় উচকো লেনেমেভি মযা বন্দ করনেমেভি ঐহি আওর ছোড়নে-মেভি ঐহি লেকিন ছোড়নেমে হাওয়া সিরকে উপর চড়যাতা হেয় আওর বন্দরতা হেয় আওর ভারি মালুম হোতা হেয়। ইসিকা নাম হেয় নেসা ইনেসা কেঁউ না হোয় কেঁকী এক আওরত খুবসুরতকো দেখ করকে উচ্ কে পাওনেকা কেত্বা বড়া নেসা হোতা হেয় আবযো পরমেশ্বর ইয়ানে ব্রহ্ম মায়ারূপ মোহনি স্বরূপ হোকে জগৎকে মোহিনিছেন্ হেয় উচ্ মোহনি রূপকা পরছাঁই দেখ করকে তেত্বা বড়া নেসা হোগা ছোই করতে দেখা।"**—প্রতিটি প্রথম প্রাণায়ামে টানিবার সময় কষ্ট, সামান্য থামাইয়া রাখিবার সময় কষ্ট, ছাড়িবার সময় অর্থাৎ ফেলিবার সময় আরাম, কিন্তু হাওয়া পেটের ভিতর থাকিতেছে না। দ্বিতীয় প্রাণায়ামে যাহা গলা, নাক অতিক্রম করিয়া ভিতরে ভিতরে তালু পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়, অভ্যন্তর-মুখী এই প্রাণায়াম টানিবার সময় যেমন আনন্দ, উভয় প্রান্তে থামাইবার সময়ও আনন্দ এবং ফেলিবার সময়ও তেমনি আনন্দ কিন্তু ফেলিবার সময় যে সুমধুর প্রণবধ্বনি নির্গত হয় তাহাতে ঐ হাওয়া মস্তকোপরি উঠিয়া যায় এবং আটকাইয়া থাকে, ইহাতে মস্তক ভারি বোধ হয়। মস্তকে এই ভারবোধ অবস্থাকেই নেশা বলে। কিন্তু এই নেশা সকলের হয় না কেন? যেমন কোন সুন্দরী নারী দর্শন করিবার পর তাহাকে পাইবার আশায় যে নেশা সকলের হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে নারীই যেমন ঐ নেশার কারণ, তেমনি অভ্যন্তরমুখী উত্তম প্রাণকর্ম্মই ঐ মস্তকভারিরূপ নেশার কারণ। এইরূপ পরমেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম যিনি মায়া দ্বারা মোহিনীস্বরূপ হইয়া এই জগৎকে ভুলাইতেছেন, সেই মোহিনী রূপের ছায়াস্বরূপ ঐ সুন্দরী নারীকে দেখিয়া যে নেশা হয়, তাহার অধিক নেশা ঐ পরমেশ্বরকে দেখিয়া হইতেছে, তাহাই প্রাণায়াম করিতে করিতে দেখিলাম। **"আতে বখত প্রেণামসে শ্বাষ নাহি নিকালেতা আউর জাতে বখত থোড়া নিকালাতা হেয়।"**—অভ্যন্তরমুখী প্রাণায়াম টানিবার সময় শ্বাস কিছুই বাহির হইতেছে না, কিন্তু ফেলিবার সময় অল্প অল্প বাহির হইতেছে। অবশ্য কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিবার পর ফেলিবার সময় আর বাহির হয় না, উহা তখন অভ্যন্তরমুখী চলিতে থাকে।

"প্রণাম করতে বখত পরখ আস্তে আস্তে করতে বখত যরা হাওয়াকা কমৃকের মালুম হোয় তব আপছে আপ রুকযায় আওর যেত্তা দেরতক রাখেনেকা এরেদা হোয় রাখ সেকে—এ মালুম হোতা হেয় মোনকো নির্থন করেনেছে মারতে মারতে স্বাষাকে তরহ আইছা আহুভাব ভায়া।" —প্রাণায়াম করিবার সময় পরখ করিবার জন্য যখন ধীরে ধীরে করিতেছি তখন হাওয়ার কমবেশী বুঝিতেছি। এই প্রকারে প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা হইতেই শ্বাস থামিয়া যায় এবং যতক্ষণ থামাইয়া রাখিতে চাই রাখিতে পারি। ইহাও বুঝিলাম যে মনকে দাবাইতে দাবাইতে অভ্যন্তরমুখী শ্বাসের দিকে যাইতে থাকিলে সম্যকরূপে আপনা হইতেই স্থিরভাব আসে। তাই তিনি এ বিষয়ে পুনরায় লিখিয়াছেন—**"মনযেছে তিরন হোয় উসকা নাম মন্ত্র। তন্‌যেছে ভরণ হোয় উছকা নাম তন্ত্র হেয়।"**—বর্ত্তমান যে চঞ্চল মন, যাহাকে সকলে মন বলিয়া জানে তাহার ত্রাণ অবস্থা অর্থাৎ স্থির অবস্থার নাম মন্ত্র ; এবং যাহার দ্বারা দেহের পোষণ হয় তাহার নাম তন্ত্র। অর্থাৎ প্রতিটি তন্ত্রীর মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহ থাকায় এই দেহের পোষণ হইতেছে, তাই ঐ বায়ুপ্রবাহই তন্ত্র। **"ইছীকে বরাবর মিঠা কৈ নহি হেয় বহুত ভারূ বহুত দেরছে উপরকে প্রণাম করনেছে উপরছে পানি নিকলাতা হেয় হামেসা কান মে ধ্বনি মালুম হোতা হেয় যব্ ধ্যায়ান করকে শুনা যায় চন্দ্রকা কমল মাযতে মাযতে সাফ হোতা হেয় আঁখ বন্দ করনেছে ভিতর চন্দ্রমা দেখাতা হেয় সাফ লেকিন ছান্‌ভর ঠাহরতা হেয় আউর এত্তে তাকৎ হেয়কি যেত্তি দেরতে করে প্রণাম উপর উপর করে কুছ দিনমে মালুম হোতা হেয় কি বাহরছে স্বাসা না নিকলেগা ইসমে বড়া সুখ আউর সবচি চ ওহি মালুম হোতা হেয় ইয়ানে ধন্ তেয়াগী হোত্ হেয়।"**—উপর হইতে প্রবাহিত এই যে অমৃতধারা ইহার মত মিষ্টি আর কিছুই নাই ; মস্তক খুব ভারি, দীর্ঘ সময় ব্যাপী কুটস্থে থাকিয়া প্রাণায়াম করিবার সময় উপর হইতে অর্থাৎ সহস্রার হইতে কারণবারি প্রবাহিত হয়, সব সময় কানে ওঁকারধ্বনি শুনা যায় যাহা ধ্যান করিবার সময় অর্থাৎ ক্রিয়া করিবার সময় শুনা যাইত, কুটস্থে ঐ যে চন্দ্র দেখা যাইতেছে উহার সামনে যে পর্দা বা আবরণ তাহা পুনঃপুনঃ প্রাণকর্ম্ম করিতে থাকিলে চলিয়া যায় এবং স্বচ্ছ নির্ব্বিকার চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তখন চক্ষু বন্ধ করিবামাত্র সেই চন্দ্র ভিতরে অর্থাৎ কুটস্থে পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু এখনও উহা অল্প সময়ের জন্য দেখা যাইতেছে, দীর্ঘ সময় স্থিতি হইতেছে না এবং এখন আমার এই

শক্তি হইয়াছে যে যত দীর্ঘ বা লম্বা প্রাণায়াম করিতেছি ততই বুঝিতেছি যে কিছুদিন পর আর বাহিরে শ্বাস বাহির হইতেছে না, এমন অবস্থায় বড়ই আনন্দ হইতেছে এবং সবকিছুই যে ঐ শ্বাসের আগম-নির্গম গতি রুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ স্থিরাবস্থা তাহা বুঝিলাম অর্থাৎ এই অবস্থাই প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী অবস্থা, ইহার পূর্ব্বে যে ত্যাগ তাহা বাতুলতা মাত্র। **"কাঁসর ঘণ্টাকা ধ্বনি কানমে মালুম হোতা হেয় যব ধ্যায়ান করে।"**—যখন ধ্যান করি অর্থাৎ ক্রিয়া করি তখন কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি কানে শুনিতে পাই। **"খালি আঁখছে চন্দ্র দেখা সবেরে প্রণাম করোত বখত চন্দ্র সূর্য্যকা একমে মিলগাএ হেয় ফির খালি দেখা।"**—সকালে প্রাণায়াম করিতে করিতে খালি চোখে চন্দ্র দেখিলাম, আরও দেখিলাম যে ঐ চন্দ্র সূর্য্য একে মিলিয়া গেল, যখন একে মিলিয়া গেল তখন দুই না থাকায় সবই খালি অর্থাৎ ফাঁকা অর্থাৎ মহাশূন্য দেখিলাম। এই মহাশূন্যই ব্রহ্ম। **"সুরজমে সব কারণবারি ভরা হয়।"**—ঐ আত্মসূর্য্যর মধ্যেই সব কারণবারি ভরা আছে। **"জো বিন্দি সোই ধ্বনিকা রূপ—অব ধ্বনি সমান হয়। আউর সূর্য্যই বিন্দিকা রূপ তো সূর্য্যই শব্দ হয়।"**—কূটস্থে ঐ যে বিন্দু দেখা যায় উহাই ওঁকারধ্বনির রূপ, এখন ঐ ধ্বনি সমান হইয়া গেল এবং ঐ আত্মসূর্য্যই যখন বিন্দুর রূপ তখন ঐ আত্মসূর্য্যই শব্দ অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি অর্থাৎ যাহা আত্মাসূর্য্য তাহাই বিন্দু এবং তাহাই ওঁকারধ্বনি। **"অব অগম স্থানমে গএ য়ানে স্থির।"** —এখন অগম্য স্থানে অর্থাৎ যেখানে সকলে যাইতে পারে না, কেবল যোগিগণই যাইতে সক্ষম সেই অগম্য স্থানে পৌঁছিলাম অর্থাৎ স্থির ঘরে পৌঁছিলাম। **"ব্রহ্মাকে কমুণ্ডল মে হরিকে চরণসে পানি গিরতা হয়—এহি হয় কারণবারি।"**—হরির চরণ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে যে জল পড়িতেছে তাহাই কারণবারি। ব্রহ্মার কমণ্ডলু অর্থাৎ তালুরন্ধ্র এবং হরির চরণ অর্থাৎ সহস্রার। সহস্রার হইতে যে অমৃত ধারা তালুরন্ধ্রে জিহ্বাগ্রে (ঊর্দ্ধ জিহ্বা) আসিয়া পড়ে তাহাই কারণবারি. এই কারণবারি পান করিলে অমর হওয়া যায়। ইহাই তন্ত্রমতে পঞ্চ ম'কারের মদ্যপান। বাহ্য মদ্যপান নহে।

তন্ত্রমতে পঞ্চ ম'কার সাধন প্রধান। ইহা তিন প্রকার—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই সাত্ত্বিক প্রধান। পঞ্চ ম'কার যথা মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। যাহারা রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন তাহারাই বাহ্য পঞ্চ ম'কারের দ্বারা সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না; কিন্তু সাত্ত্বিক পঞ্চ ম'কার স্বতন্ত্র। রাজসিক

বা তামসিক ভাবে পঞ্চ ম'কার সাধন যে নিকৃষ্ট তাহা তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন—

মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তু হ ॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং লভেত বৈ।
সর্ব্বেহপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবাৎ ॥[১]

অর্থাৎ মদ্যপানের দ্বারা যদি মানুষ সিদ্ধিলাভ করে তাহা হইলে মদ্যপায়ী পামরেরাও সিদ্ধিলাভ করুক; মাংস ভক্ষণ করিলেই যদি পুণ্যা গতি হয় তাহা হইলে সকল মাংসাশীরই পুণ্য হোক। হে দেবেশি, স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা যদি মোক্ষলাভ হয় তাহা হইলে স্ত্রীসেবা দ্বারা সকলে মুক্ত হোক।

অতএব সাত্ত্বিকভাবে পঞ্চ ম'কারের প্রথম ম'কার মদ্যপান কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিতেছেন—

সোমধারা ক্ষরেদ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ ॥[২]

অর্থাৎ হে বরাননে, ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা নিঃসৃত হয় তাহা পান করিয়া যিনি আনন্দিত হন তাঁহাকেই 'মদ্যসাধক' বলে।

যোগিরাজ এই মদ্য বা কারণবারি পান করিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ নেশায় মাতিয়া থাকিতেন।

সাত্ত্বিকভাবে দ্বিতীয় ম'কার মাংস ভক্ষণ কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিতেছেন—

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥[৩]

অর্থাৎ মা শব্দে রসনা, রসনার অংশ বাক্য; ইহা রসনার প্রিয়। যে ব্যক্তি রসনাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ বাক্য সংযম করেন তাঁহাকেই মাংসসাধক বলা হয়। গুরুপদেশে তালুমূলে জিহ্বাকে প্রবেশ করাইলে

(১) কুলার্ণবতন্ত্র, ২য় উল্লাস।
(২) আগমসার।
(৩) আগমসার।

কথা বলা যায় না, এই অবস্থায় অধিক প্রাণকর্ম্ম করিলে ইচ্ছার নাশ হয়। তখন ইচ্ছা না থাকায় বাক্য বলে কে? সুতরাং জিহ্বার সংযমে বাক্যের সংযম হয় এবং এই জিহ্বার কর্ম্মী সাধককে 'মাংসসাধক' বলে।

তৃতীয় পঞ্চ ম'কার মৎস্য কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিতেছেন—

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ ॥[১]

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে দুইটি মৎস্য সর্বদা বিচরণ করিতেছে, যে সাধক সেই মৎস্য ভক্ষণ করেন তিনিই 'মৎস্যসাধক'। গঙ্গা ইড়া এবং যমুনা পিঙ্গলা, এই দুই নাড়ীর মধ্যে সর্ব্বদা যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে তাহাই মৎস্য। যে যোগী প্রাণকর্ম্মের দ্বারা প্রাণকে স্থির করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ দুই মৎস্যকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ স্থির করেন তিনিই 'মৎস্যসাধক'।

চতুর্থ ম'কার মুদ্রা কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিতেছেন—

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্ ॥
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥[২]

অর্থাৎ সহস্রদল মহাপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে পারদের ন্যায় নির্ম্মল, কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্যের আভা অপেক্ষাও অধিক প্রকাশ অথচ সুশীতল, অতীব কমনীয়, মহাকুণ্ডলিনী সংযুক্ত যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে যিনি জানিয়াছেন অর্থাৎ গুরুপদেশে যে যোগী আত্মকর্ম্মের দ্বারা এই প্রকারে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই 'মুদ্রাসাধক'।

পঞ্চম ম'কার মৈথুন কাহাকে বলে? মৈথুন তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

মৈথুন পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥

---

(১) আগমসার।
(২) আগমসার।

আকারহংসমারুহ্য একতাচ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদোচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্॥
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদম্।
ষড়ঙ্গঃ পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমিরীতম্।
আবাহনং সীতকারং নৈবেদ্যমুপলেপনম্॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতপাতশ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকপ্রিয়ে॥[১]

অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ। মৈথুন দ্বারা সিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। নাভিচক্রস্থিত কুণ্ডমধ্যে কুঙ্কুমাভাস আরক্তবর্ণ র'কারের (তেজস্তত্ত্বের) সহিত আকাররূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যখন আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনি বা ব্রহ্মযোনির মধ্যে বিন্দুস্বরূপ ম'কারের মিলন হয় অর্থাৎ উর্দ্ধে স্থিতি লাভ হয় তখন মহানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। উর্দ্ধে এইরূপ স্থিতি হইলে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থায় রমণ করার নাম 'রাম'। ইহাই প্রকৃত রাম নাম, ইহা মুখে বলা যায় না। মৈথুন সাধক এই প্রকারে সদা আত্মাতে রমণ করেন তাই রাম নামই তারকব্রহ্ম ইহা নিশ্চিত। হে মহেশানি, মৃত্যুকালে এই রাম নাম যাহাতে স্মরণে থাকে সেজন্য আত্মক্রিয়ায় রত থাকা উচিত, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকালে এই রাম নাম স্মরণ হয় এবং তখন তিনি স্বয়ংই ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া যোগিরাজ লিখিয়াছেন—**"ওঁকার আত্মারাম ওহি রাম হয়।"** এই আত্মতত্ত্বরূপ মৈথুন তত্ত্বই পরম তত্ত্ব, সকল জ্ঞানের কারণস্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ পূজা ও জপাদির ফল প্রদান করিয়া থাকে। গুরূপদেশে এইরূপ ষড়ঙ্গ যোগক্রিয়া দ্বারা

(১) আগমসার।

মন্ত্র সকল প্রসন্ন অর্থাৎ চেতনাপ্রাপ্ত হয়। ন্যাস অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখী প্রাণায়াম করিয়া বাহিরের বায়ু বাহিরে এবং ভিতরের বায়ু ভিতরে, এইরূপে বায়ুকে হৃদয়ে ধারণ করার নাম 'আলিঙ্গন' এবং স্থিতিপদে নিঃশেষরূপে মগ্ন হওয়ার নাম 'চুম্বন'। এইরূপ ধ্যানাবস্থা ১৭২৮ অন্তর্ম্মুখী উত্তম প্রাণায়ামে হইয়া থাকে। কেবলরূপ এই কুম্ভকের অবস্থায় 'আবাহন' হয়, ইহাই 'সীতকার' এবং জিহ্বা উর্দ্ধে রাখিয়া এইরূপে আত্মক্রিয়া সাধন করিতে করিতে যে অমৃত ক্ষরণ হয় তাহাই 'নৈবেদ্য'। অজপারূপ জপক্রিয়া অর্থাৎ আত্মক্রিয়াই 'রমণ' এবং এই রমণ করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ রেতঃপাত হয় এবং উহা হইবামাত্র তৃপ্তিরূপ আনন্দের উদয় হয়, উহাই 'দক্ষিণা' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ-লাভের অবস্থা। এই সাত্ত্বিক মৈথুনতত্ত্ব তথা পঞ্চ ম'কার সাধন মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গোপন রাখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সাত্ত্বিকভাব পরিত্যক্ত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যোগিরাজ বলিয়াছেন—"**এই শরীরই ওঁকার, এই শরীর হইতে সকল উৎপত্তি।**" আর একদিন লিখিয়াছেন—"**আজ মন চঞ্চল হোকে জয়সা প্রাণায়াম করতেথে সো ওয়সা নহি হুয়া—অব শ্বাসা বহুত কম চলনে লগা—বড়া মজা।**"—আজ মন কিছু চঞ্চল হওয়ায় যেমন উত্তম প্রাণায়াম করিতাম তেমন হইল না, তবে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে এখন শ্বাস খুব কম চলিতেছে; এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ হইতেছে। তাহার পর লিখিয়াছেন—"**আজ একদম দম বন্দ—ছোটা জিভ আউর উপর উঠা—আউর বিচমে পানিকা সোতা মালুম হুয়া।**"—আজ একেবারেই দম বন্ধ হইয়া গেল, আর বাহিরে শ্বাসের গতি নাই। ছোট জিহ্বা আরও উপরে উঠিল এবং তালুকুহরে অমৃতধারা অনুভব করিলাম। "**জিসনে কামকো জিতা উসনে সবকুছ কিয়া।**"—যিনি এই প্রকারে সকল প্রকার কামনাকে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনি সবকিছুই করিতে পারেন। প্রাণকর্ম্ম করিলে শ্বাসের গতি যতই স্থির হইবে সকল প্রকার কামনা বাসনা ততই জয় হইবে। "**ওহি একরূপ মহাপুরুষকা জো তমাম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিক হয়।**"—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঐ মহাপুরুষের একই রূপ, তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই; তিনিই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। ইহার পর অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, লয় প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হওয়ারূপ অবস্থায় পৌছিয়া লিখিয়াছেন—

"সূর্য্যই ব্রহ্ম হমহি ব্রহ্ম সর্ব্বব্রহ্ম।"—সহস্র সূর্য্যের প্রভা বিশিষ্ট ঐ আত্মসূর্য্য উহাই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, সবকিছুই ব্রহ্ম। নিজে এবং ব্রহ্ম এক হইয়া গিয়া সবকিছুই ব্রহ্মময় ইহা অনুভব করিতেছেন। **"হমারেই রূপ সব জগই—হম ছোড়ায় কোই নহি, উহ রূপ হয় সূন্য মে ওহা ন দিন ন রাত।"**—এই জগতের সবকিছুতেই আমার রূপ অর্থাৎ আমি ছাড়া এই জগতের কিছুই নাই, আমি ব্যতীত কেহ নাই। এই সর্ব্বংব্রহ্মময়ংজগৎ রূপ মহাশূন্যে অবস্থিত অর্থাৎ এই শূন্যের ভিতর যে শূন্য তাহাতে অবস্থিত যেখানে দিনও নাই, রাত্রও নাই, স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃ প্রকাশ। যোগীর এই অবস্থা এক উত্তুঙ্গ অবস্থা, সকল যোগের শেষ লয় যোগের অবস্থা, বৃহৎ সত্তার সহিত লীন হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য লোপ অবস্থা। ইহা যোগীর চরম ও পরম কাম্য।

যোগিরাজের সাধারণতঃ কোন কঠিন অসুখ হইত না, তবে শরীর থাকিলে কিছু না কিছু অসুখ হইবেই। যোগিরাজের একবার ফোড়া হইয়াছিল, তাই তিনি দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—**"আজ আপনা গাফলিসে ফোড়া হুয়া।"**—আজ নিজের গাফিলতিতে ফোড়া হইয়াছে। দুই দিন পর লিখিয়াছেন—**"আজ রোজকে মাফিক ফোড়েসে প্রাণায়াম নহি হুয়া—অবিনাশিকো য়ানে সূর্য্যকো রাতমে দেখা।"** —প্রতিদিন যেমন উত্তম প্রাণায়াম হইত, আজ ফোড়ার যন্ত্রণায় তেমন উত্তম প্রাণায়াম হইল না, কিন্তু অবিনাশি অর্থাৎ আত্মসূর্য্যকে রাত্রে দেখিলাম। আরও দুইদিন পরে লিখিয়াছেন—**"আজ কুছ দুর্ব্বল শরীর হুয়া লেকন ভিতর ভিতর স্বাসা চলা।"**—এই সময় ফোড়া হওয়ায় তিনি কিছুদিন ভুগিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার শরীর কিছুটা দুর্বল হইয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘ যোগাভ্যাসের ফলে শ্বাসের গতি আপনা হইতেই ভিতর ভিতর চলিতেছে। একটি সূর্য্য আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"হমহি হম হয়। সূর্য্য দেখা আঁখ মুদকে—হমহি সূর্য্য হয়।"**—আমিই সেই আমি অর্থাৎ আমি আমাতেই অবস্থিত, এই অবস্থায় চোখ বুঁজিয়াও আত্মসূর্য্য দেখিলাম, আমিই সেই অবিনাশি আত্মসূর্য্য। **"অলখ নিরঞ্জনকা জব কমল বিকশিত হোয় তব আপহি আপ দেখে—ফির আপরূপি ভগবান হোনা বাঁকি হয়—তব গুরু সমান দাতা নহি মালুম হোয়।"**—প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ষট্ চক্ররূপী কমলদলগুলি বিকশিত হয় তখন নিরাকার নিরবয়ব ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয় এবং তখন নিজেকেই নিজে দেখা যায়। এই

অবস্থায় পৌছিয়া এখন কেবল নিজরূপী অর্থাৎ স্ব-রূপী ভগবান্ হওয়া বাকি আছে অর্থাৎ এখনও নিজরূপী ভগবান্ হইতে পারি নাই, তাহা হইলে গুরুর সমান কেহ দাতা নাই ইহা বোঝা যায়। ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়া, তিনি এবং ভগবান্ মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া, বেদান্ত মতে অদ্বৈতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাধনার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করিয়া নিভৃতে লোকচক্ষের অন্তরালে দিনলিপির মাধ্যমে মহান্ ঘোষণা করিলেন—"**স্বয়ং ভগবান।**" অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই ভগবান্ হইলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসে (তারিখ নাই) লিখিয়াছেন—"**কালা বিন্দি এই স্থির বহুত দের তক্ দেখা আউর কহা মাতারীসে কি বাবা আবত প্রাণমে মরনে লাগে একহি এহি কাহকরকে রোয়া তব্ সামকো গুরুনে কহা উপর লিখা হুয়া গুরুনে বাতালায়া লেকিন আঁখসে কুছ নাহি দেখা কি কুছ নাহি ব্রহ্ম হেয় আনে মালুম হোতা হেয় কি মহাবিদ্যাকা দরশন হোগা।**"—স্থির কালো বিন্দু দীর্ঘ সময় ধরিয়া দেখিলাম এবং মাতাজীকে বলিলাম যদি আগমপ্রাণে মরিয়া যাই এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তারপর সন্ধ্যায় গুরুজীকে বলিলাম, তিনিও সব বলিয়া দিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিলাম না, কেবল ব্রহ্ম অর্থাৎ এই অবস্থায় বুঝিলাম যে এইবার মহাবিদ্যার দর্শন হইবে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে শুক্ল পূর্ণিমাতে আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"**আব মযা হেয় ঐহি সূর্য্যছে সব্ হেয় ঐহি সূর্য্য ১লে দুইকে ছিদ্‌ছেভি ছোটা রহা ঐহি ফির এছাবড়া হুয়া কি সূর্য্যকে মাফিক হুয়া ঐহি সূর্য্যছে হামলোগ ও প্রার্থ্বিব সব পয়দা এহিকে নাম দুইকে ভিতর ছাতি ধরনায়ে ফির উছিকে ভিতর নেবে উসূর্য্য ব্রহ্মকে ভিতর লেয় ফির ব্রহ্মছে সূর্য্যকা উৎপত্তি ইছিতরেছে দুনিয়া চলে যাতা হেয় যোসবদ্ হেয় এছিছে সবদ উৎপত্তি হেয় যেছা আউর উয়াভি ঐ ধ্বনি কাঁহা-**
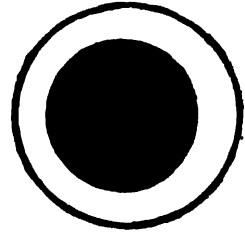
ছেভি ঐ ধ্বনি বিলকুল যোৎ ব্রহ্ম হেয় সূর্য্যকা চন্দ্রভি ঐহি ইছিলিয়ে চন্দ্রধর হেয় উহাছি হামলোগনকে সাত্‌মে বেদকে লিখনিবালে গণেষজি হেয় ইছকা সর্ব্ব ইয় হেয় কি লিখিনাহি মালুম হোত হেয় আউর বেদকা অর্থ গণেষজি মালুম করাতে হেয় যুগুছে আউর প্রণামছে

বাঁষুলিকা আওয়াষ সুনায়াতে আতে প্রণামকে যেছা চাভিকে ছেদমে ফুকনোছা আওয়াষ মালুম হোতা হেয় সূর্য্য আসল হেয় কামকা ইচ্ছা নাহি বহুত স্বাষ পিছেকে তরফ গেয়া বহুত পিছেকে তরফ গেয়া বহুত পিছেকে দরবাযা দেখকর আঁখ সামনেকা বন্দ হো যাতা হেয় ইছে সামনে গীরনেকা ওর মালুম হোতা হেয় কভি কভি বড়ে বড়ে হাত ভরকে দাত্‌বালে সূরথ নজরমে বঠে দেখলাতা হেয় মেয় কহা আসল তত্ত্ব সূর্য্যকে ছোড়তি নাহি।"—এখন বড়ই আনন্দ হইতেছে, ঐ আত্মসূর্য্য হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি, ঐ আত্মসূর্য্যকে প্রথমে বিন্দুস্বরূপ ক্ষুদ্র দেখিতেছিলাম এখন ইহাই এতবড় হইল যে এই আকাশের সূর্য্যের মত। ঐ আত্মসূর্য্য হইতে আমরা সকলে এবং এই জগৎ সংসার সব কিছুরই উৎপত্তি, ইহারই নাম দ্বৈত; পুনরায় ঐ আত্মসূর্য্য মহাশূন্যরূপী ব্রহ্মের ভিতর লয় হইয়া গেল, আবার ঐ শূন্যব্রহ্ম হইতে এই আত্মসূর্য্য উৎপত্তি হইতেছে, এই প্রকারে এই দুনিয়া চলিয়া আসিতেছে। অনাহত, ওঁকার ধ্বনি সহ সমস্ত শব্দ ঐ আত্মসূর্য্য হইতেই আসিতেছে, ঐ ধ্বনি সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মজ্যোতিঃ। ঐ আত্মসূর্য্যই চন্দ্র হইলেন, তাই তিনিই চন্দ্রধর, ঐখানে আমাদের সকলের সাথে বেদের লেখক গণেশজিও আছেন, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যে তিনি কিছুই লেখেন নাই কিন্তু তিনিই আবার বেদের সম্পূর্ণ অর্থ শুঁড়ের দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন এবং চাবির ছিদ্রের ভিতর ফুঁ দিলে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয় প্রাণায়াম করিবার সময় সেই প্রকার বাঁশির মত শব্দ নির্গত হইতেছে; আত্ম-সূর্য্যই আসল, এখন ইচ্ছার নাশ হওয়ায় কোন কিছু করিবার ইচ্ছা নাই, এমন কি কোন প্রকার কামনাও নাই। এখন শ্বাস সম্পূর্ণরূপে পিছনে অর্থাৎ সুষুম্নায় চলিতেছে এবং তন্ময় হইয়া ষট্‌চক্র দেখিতে দেখিতে সামনের চক্ষুদ্বয় বন্ধ হইয়া গেল, এই অবস্থায় সামনের দিকে পড়িয়া যাইতে পারি মনে হইল। এই প্রকার তন্ময় অবস্থায় কূটস্থরূপী দর্পণে বড় বড় হাত ও দাঁতওয়ালা এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বসিয়া আছে দেখিলাম; এই অবস্থায় বলিলাম যে যতই ভয় দেখাও আমি আসল তত্ত্ব যে আত্মসূর্য্য তাহাকে ছাড়িব না। ইহার পর লিখিয়াছেন—**"আখ বন্দ করকে দেখা চিৎমে প্রাণবাউ হেয় আউর প্রাণবাউমে চিৎ হেয় চিৎ ঠেকানে রাখেত কোভি না মরে আদমি দোসরা সকসমে কুচ্‌ যোৎ হেয় লেকিন সাফ নাহি ভাস্না।"**—চক্ষুদ্বয়

বন্ধ করিয়া দেখিলাম যে চেতনেই অর্থাৎ চঞ্চল অবস্থাতেই প্রাণবায়ু আছেন এবং প্রাণবায়ুতেই চেতন বর্ত্তমান অর্থাৎ যাহা প্রাণবায়ু তাহাই চেতন এবং যাহা শ্বাস-প্রশ্বাস তাহাই প্রাণ। সেই চেতনকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুকে যদি ঠিক জায়গায় রাখা যায় তাহা হইলে কেহ মরিবে না অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যদি স্থির করিয়া স্থিরাবস্থায় রাখা যায় তাহা হইলে কেহ মরিবে না। কারণ ঐ অবস্থায় জন্ম রহিত হওয়ায় মরিবে কে? যখন জন্ম নাই, তখন মৃত্যুও নাই। সকলের শরীরে যে সেই আত্মজ্যোতিঃ বর্ত্তমান তাহা দেখিলাম কিন্তু খুব পরিষ্কার নহে। পুনরায় লিখিয়াছেন—**"নাদছে বিষ্ণুছে মিলাতা হেয় কেঁউকি আকাষকা বিষ্ণুকা একরূপ হেয় আউর সবদ আকাষছে নিকালাতা হেয় ইছলিয়ে গিত শুননেছে সবকা দিল খুষ রহাতা হেয় কেউকি আপ রূপছে সব্‌কে খুশি পয়েদা হুতি হেয়।"** —অনাহত বা ওঁকারধ্বনি এবং বিশ্বব্যাপিয়া আছেন যে বিষ্ণু সকলেই মহাকাশে মিলিয়া গেলেন, কারণ সেই স্বচ্ছ স্থির মহাকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়ায় বিষ্ণু ও মহাকাশের একই রূপ অর্থাৎ একই তত্ত্ব। এই যে নাদব্রহ্ম তাহাও ঐ স্বচ্ছ মহাকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মাকাশ হইতেই নির্গত হইতেছে, তাই গান শুনিলে সকলের মন আনন্দিত হয়, কারণ নিজরূপ হইতেই সকলের আনন্দ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ গান, আনন্দ, বিষ্ণু সকলেরই উৎপত্তিস্থল ঐ স্বচ্ছ স্থির মহাকাশ। যোগিরাজ গাহিলেন—

ভাল ভেবে ভাল করনা ও রসনা—
মিছে কাজে বেড়িএ বেড়াও
ভুলেও তাকে ডাকোনা।
সে যে অন্তরে জাগে
সদা আত্মারামরে।
তাহার বিহনে তুমি
রএছো কেমন করে॥

১৮৭১ খৃঃ শুক্লপক্ষ চতুর্থীতে (মাস নাই) লিখিয়াছেন—**"সূর্য্য বড়া দরবাজা হেয় উচ্‌কো চড়নেবালাকা নাম দরবেশ হেয় আব্‌ হাওয়া উপর খিচাতা হেয় গাঢ়া পিছেকা শির বড়া ভারু যো রঙ্গ বিন্দিকা ইয়ানে জিচকা নাম নাহি হেয় ঐহি রঙ্গ প্রণামকা ঐহি রঙ্গ প্রাণকা ঐহি রঙ্গ ব্রহ্মকা যব্‌ এসব রঙ্গ এক হো যায় ভব্‌ আপ রূপভি ভগবন্ত দেখলায়।"**— আত্মসূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বড় দরওয়াজা, সেই দরওয়াজায় যিনি চড়িয়া বসেন অর্থাৎ সেই আত্মসূর্য্যতে যাঁহার স্থায়ী স্থিতিলাভ হইয়াছে তাঁহারই

নাম দরবেশ অর্থাৎ ফকির। কারণ তখন তাঁহার নিজের বলিতে কিছু না থাকায় তিনিই প্রকৃত দরিদ্র। এখন এমন গাঢ় অর্থাৎ উত্তম প্রাণায়াম হইতেছে যে দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু উপর দিকে টানিয়া লইতেছে, মস্তকের পিছন দিকে বড়ই ভারি অনুভব হইতেছে। কূটস্থে যে ক্ষুদ্রবিন্দু অর্থাৎ ধ্রুবতারা দেখা যাইতেছে, উহার যে রঙ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ যে রঙের কোন নাম নাই, এমন যে রঙ সেই রঙ প্রাণায়ামের, সেই রঙ প্রাণের এবং সেই রঙই ব্রহ্মের। যখন এইসব রঙ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় তখন নিজরূপও ভগবান্ হইয়া গিয়াছে ইহা দেখা যায়। ১৮৭১ খৃঃ কার্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীতে দ্বাদশ আত্মসূর্য্যের চিত্র আঁকিয়াছেন। মধ্যে এক বৃহৎ সূর্য্য এবং বৃত্তাকারে একাদশ সূর্য্য; তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"**সূর্য্যকা ভিতর নারায়ণকা সুদর্শন চক্র। বড়কা বিন্দিমে বিচমে জরদ রঙ্গ ওকরেবাদ বেগুনি রঙ্গ উচকে বাদ শপেদী দুসরা বিন্দি করিয়া রঙ্গকা উচকা ভিতর এক খিরিকে তিচকে ভিতর মালুম হোতা হয় আপরূপী ভগবান্ ইসব বিষ্ণুকা চক্রমে দেখা।**"—ঐ আত্মসূর্য্যের ভিতর নারায়ণের সুদর্শন চক্র দেখিলাম। বড় বিন্দু অর্থাৎ বৃহৎ সূর্য্যের মধ্যে জরদ অর্থাৎ পীতবর্ণ, উহার চারিপাশে বেগুনী রঙ এবং তাহাকে ঘিরিয়া আছে সাদা রঙ। এই তিন রঙের বাহিরে বৃত্তাকারে যে একাদশ সূর্য্য তাহাদের রঙ কাল; তাহার ভিতর এক দরজা দেখিলাম এবং সেই দরজার ভিতর নিজরূপী ভগবান্ দেখিলাম। এই সবকিছুর অর্থাৎ সমষ্টি মণ্ডলরূপী যে বিষ্ণুচক্র তাহার ভিতর এই সবকিছু দেখিলাম। পুনরায় লিখিয়াছেন—"**দাহিনা স্বাসা যবতক চলে তবতক সবকুছ দেখে ফির বিনাস হোয়—লেকন পহলে দহিনা চলনেকে বাদ ফির বায়ু চলতা হয় য়ানে বাঁওয়া যো কি স্থির কালরূপ হয়।**"—দক্ষিণ নাসিকায় অর্থাৎ পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাসের গতি থাকে তাহাকে রজঃ গুণ বলে। এই রজঃ গুণ সকল কর্ম্মের প্রেরণা যোগায়, তাই সব কর্ম্ম সম্পাদন হয়। জীব এই প্রকারে রজঃগুণে থাকিলে শেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস চলিবার পর পুনরায় বাম নাসিকায় অর্থাৎ ইড়ায় গতি হয়; এই ইড়াও জীবের কালস্বরূপ অর্থাৎ ইড়াতে থাকিলেও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব জীবকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা ইড়া ও পিঙ্গলার অতীতে সুষুম্নায় যাইতে হইবে; এই সুষুম্নাই বিষ্ণুধাম। কিন্তু ইহাও সত্ত্বগুণান্বিত হওয়ায় যোগী ইড়া পিঙ্গলা ও

সুষুম্নার অতীতে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় অর্থাৎ যেখানে তিন গুণই নাই, যাহা কালাতীত দ্বন্দ্বাতীত সেই স্বচ্ছ মহাশূন্যে লীন হইয়া যান; যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরও নাই অতএব জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। **"আঁখ যয়সে অন্ধেকা ঠহর জয় ওয়সা বিষয়কো জোন দেখে কেবল ব্রহ্মকো দেখে উসকাভি আঁখে থাম যায় অভ্যাস বস ঠহর জায়।"**—অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু যেমন থামিয়া যায়, তেমনি বিষ্ণুকে যিনি দেখেন তাঁহারও তদ্রূপ হয়। ঠিক সেই প্রকার ব্রহ্মকে যিনি দেখেন তাঁহারও মন চক্ষু সব স্থির হইয়া যায়, ইহা অভ্যাস সাপেক্ষ অর্থাৎ প্রতিদিন নিয়মিত ক্রিয়া করিলে স্থিরত্বলাভ হয়। স্থিরত্বই ব্রহ্ম। অতএব প্রতিদিন সকলের ক্রিয়াসাধন অভ্যাস করা উচিত। তাই তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন—**"অভ্যাস দ্বারায় কোন কর্ম্ম না করিলেও করা হয়।"** তিনি সকলকে ক্রিয়াযোগের উপকারিতা সম্বন্ধে বার বার বুঝাইতে গিয়া বলিতেন—**"তোমার নিজের ভাল কিসে হবে তা তুমি নিজেই জান না।"**—যে সব কর্ম্ম তোমরা করিয়া থাক এবং উহাতেই নিজের মঙ্গল হইবে ভাবিয়া থাক মোটেও তাহা নহে, তাই তোমরা নিজেই জান না যে কি কর্ম্ম করিলে সত্যকার মঙ্গল সাধিত হয়। ক্রিয়া করিলেই সকল মঙ্গল হয়। **"এয়সা মালুম হোতা হয় কি কুছ চিজ মিলা অর্থাৎ তৃপ্ত।"**—ক্রিয়া করিতে করিতে কিছু পাইলাম বলিয়া বুঝিলাম অর্থাৎ তৃপ্ত হইলাম, পূর্ণকাম হইলাম। তারপর তিনি গাহিলেন—

"মেঠাই খেয়ে মন কই তৃপ্ত হলো না
এমন ধন কই যাহা কখন যায় না
গুরু তুমি বলে দেও বলে দেওনা
সে যে সর্ব্বত্রেতে আছে বিরাজমানা
অরে তুই দেখনা দেখনা দেখনা
চক্ষুর সম্মুখে বিরাজে সূন্যঘনা
ঐ ব্রহ্মপদ মনেতে মিলায় না
এক হ'লে বাঁকি কিছু থাকবে না
মনের আনন্দ মনে ধরবে না
তখন ব্রহ্ম বিনা আর হবে না
এপদ পাবেনা মূল মন্ত্র বিনা
যন্ত্রি বিনা কেবল যন্ত্র যন্ত্রনা

তাহা বিনা নাই অন্য আরাধনা
এ আরাধনায় সুখ অতুল না
ইহা কদাচিত তুমি ভুলিও না
ভুলিলে পাবে তুমি জম যন্ত্রনা
কলুর চাকে পড়ে প্রাণ রবে না
ঘোরামাত্র সার লাভ কিছুই না
হরিনাম[১] নিতে অলস করনা
নইলে পরমপদ তুমি পাবে না।"

"কালী দেখে কাল ভয় পায়
সে যে কিছু নয় অথচ সর্ব্বময়
নির্জ্জনে ব'সে ভেবে[২] দেখ পাবে সেই ধন
যে কি হরেবিধন ও সকলেরি নিধন
প্রাণ জায় জাক ক্ষতি নাই
পাইবে আমি সেই ধন
হরি ধন অমূল্য রতন।"

"হরি মুখে হারা গেল বাপ
আরতো প্রাণে বাঁচিনা,
প্রাণ প্রাণ ক'রে হ'লাম খুন
প্রাণ যেখানকার সেখানেতো গেলোনা
স্থিরভাবে স্থির হই এ মনতো
এখন স্থির হলো না,
লেগে থাক হরিপদে[৩] হবে অবশ্য তাঁহার করুণা।
জেনে শুনে তুমি হরি বলিতে কখন আলস্য করো না।

(১) হরিনাম অর্থে অন্তর্মুখী প্রাণকর্ম্ম।
(২) ভেবে দেখ অর্থে ক্রিয়া কর।
(৩) হরিপদে লেগে থাকা অর্থে প্রতিদিন নিয়মিত ক্রিয়া করা

"সে যে বিষম ঘটনা ওপ্রাণ বাঁচেনা
যেতেছিল আপন মন্দিরে সেথায় করে ফেললে একখানা।
বেটা যেমন বেটি তেমন বিটির মজায় ঝুলনা।"

"সুরেশ উহ বিখ্যাত জগতমে সুরনকে
মালিক ওহি হোই।
বিশ্বাধার হয় উহ জগতমে
উহ বিনা রহে ন কোই।
গগন সদৃশ আকার ওয়াকো
দেখত স্থির ঘর জাই।
মেঘবর্ণ রঙ্গ ওয়াকো ভলি লহে
অক্ষর জব দেখাই।
শুভাঙ্গ ইসলিএ কহলাওএ বুদ্ধি
সুমতি লে জাই।
লক্ষিকান্ত ওহি রটতুঁ হয়
দারিদ্র সব নসাই।
ইচ্ছা হোএ দরিদ্রতা বঢ়ে ইচ্ছাই
উল্‌ট সন্তোষ হোই।
কমল নয়ন ওয়াকে লোগ কহত হয়
জেকা সোভা বর্ণন ন জাই।
জোগিভির্ধ্যান অগমরূপ হয়
পইহো সব পরিবার থোই।
বন্দে ভক্তা ভবভয় হরং অজপা
সিদ্ধ জব হোই।
সর্ব্বলো কৈকনাথ মিলে তব
বাজত আনন্দ বধাই॥"

"বারতো পকা অবহু মন লেয়া চরণ ভগবান
সুমিরত যাহি হো জাই এবও ছুটে অভিমান
টেক পকড় সাধু বচন হোইহে ওঁকারতান
নামদেব এহি নাম লেত হোগএ অন্তরধ্যান।"

"খেতে দিবি শুতে দিবি,
করতে দিবি সকল কর্ম্ম।
মনগত ইচ্ছা ছেড়ে তুষ্ট হয়,
দেখে আত্মকর্ম্ম ॥"

এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥[১]

অর্থাৎ হে পার্থ, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া যখন যোগী মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। অর্থাৎ আপনাতে আপনি তুষ্টরূপ আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া যোগী যখন সকল প্রকার কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মায় মনের স্থিতি হওয়ায় যাঁহার প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞান বা নিজেকে নিজে জানারূপ আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

"প্রাণবায়ুকো বিন্দুমে ঠহরানেসে বায়ু স্থিতি হোজায়—বায়ু বিন্দ বিধারণং।"—কূটস্থে যে ধ্রুবতারারূপ বিন্দু দেখা যায়, প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে ঐ বিন্দুতে স্থির করিতে পারিলে ৪৯ বায়ুই স্থির হইয়া যায় এবং ধ্যানাবস্থা লাভ হয়। ইহাই বায়ু বিন্দ বিধারণং। "নাদ বেধনা—আওয়াজ সুমার করে নরিকে জিহ্বা অগ্রকর রোকে ওঁকার ধ্যাওএ তব স্থির হোএ ও নেত্র নাসিকা বিচ ধ্যান করে নিরালে বইটকে তব নিরালম্ব প্রাপ্ত হোয়। আনন্দ শব্দশে ধুন হোতা হয়—ধুন সে জ্যোতি—জ্যোতিসে মন হয়—তাহা মন লৌলিন হোতা হয় সো বিষ্ণুকা পদ হয়।"—নাদধ্বনিকে বিদ্ধ করিয়া, ওঁকার স্মরণ করিয়া, জিহ্বাকে তালুকুহরে রাখিয়া ওঁকার ধ্যান করিলে অর্থাৎ ওঁকারক্রিয়া করিতে থাকিলে স্থিরত্বলাভ হয় এবং নেত্র ও নাসিকার মাঝখানে অর্থাৎ কূটস্থে চক্ষুদ্বয় স্থির করিয়া, নিস্তব্ধস্থানে বসিয়া প্রাণকর্ম্ম করিতে থাকিলে নিরালম্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ শূন্যে স্থিতি হওয়ায় অবলম্বনশূন্য হওয়া যায়। আনন্দরূপ শব্দ হইতে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, ধ্বনি হইতে জ্যোতি উৎপন্ন হয় এবং জ্যোতি হইতে মন উৎপন্ন হয়; সেই আত্মজ্যোতিতে মনের লয় হইলে যে স্থিরত্বপদ লাভ হয় তাহাই বিষ্ণুপদ অর্থাৎ সেই মহাস্থিররূপ

(১) গীতা ২।৫৫

মহাশূন্যই বিষ্ণুপদ)। "ইসি তরহ দেখতে দেখতে উস দেখনেকো আপনে আখ উস জগহসে ন হটাওএ—আউর দেখতেহি জায় লেকন জব উতর আওএ তব ফির উসি তরফ আপনা আঁখ ন হঠাওএ আউর থোড়া নিচে দমকো ছোড় ফির অচ্ছি তরহসে উঠাওএ ইসিতরহ দেখতে দেখতে ফির আধিয়ারা ফির খ্যালসে ফাড়তে ফাড়তে সুবহকে মাফিক মালুম হোগা তব জ্যোত বিচমে করিয়া পহলে আগকে মাফিক ও ধুপকে মাফিক জরদরঙ্গ দেখায় উস্কে বিচ আতাসবাজি ও গয়রহ—ফির সবুজ রঙ্গ হোগা তব লাল রঙ্গ—তব হরা—তব নিলা—তব কালা—অধিয়ারা সন্নাটা—ফাড়তে জায় ফির সুভ হোয়—ফির ভিতরসে জ্যোত দেখলায় সামনে অধিঁয়ারা উসিকো দেখে।"—(ঐ আত্মজ্যোতি বা ঐ মহাস্থিররূপ মহাশূন্য বিষ্ণুপদ দেখিতে দেখিতে উহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে হইবে, উহার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিতে হইবে, কিন্তু সেইখান হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া দেখিতেই থাক। পুনরায় যখন সেখান হইতে অর্থাৎ কুটস্থ হইতে নিপতিত হইবে (কূটস্থ হইতে নীচে নামিয়া আসিলেই জগৎ দেখা) তখনও কূটস্থে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি স্থির রাখ, তাহা হইলেই জাগতিক সমস্ত কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, কর্ম্ম বন্ধন থাকিবে না। এই প্রকারে কুটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া উত্তম প্রাণকর্ম্মের সহিত পুনরায় কুটস্থ অভিমুখে উঠিবে। দীর্ঘ সময় এই প্রকারে ষট্চক্রপথে আত্মক্রিয়ায় রত থাকিলে কখনও সন্ধ্যার আকাশের মত, কখনও বা ভোরের আকাশের মত আলোহীন অন্ধকারহীন মহাশূন্য দৃষ্ট হইবে। তাহাব পর যে জ্যোতি দর্শন হইবে তাহা কখনও কাল, কখনও আগুনের মত, কখনও বা রৌদ্রকিরণের মত ; কখনও কখনও তাহা হইতে আতশবাজির মত ফুলকি বিচ্ছুরিত হইবে। পুনরায় সবুজ রং হইবে, তারপর লাল রং হইবে, তারপর নীল রং হইবে, তারপর কাল হইবে, তারপর সন্ধ্যার আকাশের মত মহাশূন্য হইবে। তারপর আরও ক্রিয়া করিতে থাকিলে পুনরায় ভোরের আকাশের মত না অন্ধকার না আলো এই অবস্থা হইবে। আরও অগ্রসর হইলে পুনরায় ভিতর হইতে জ্যোতি দেখা যাইবে এবং শেষে যে সন্ধ্যাকাশরূপ মহাশূন্য দৃষ্ট হইবে তাহাকেই দেখিতে থাক। আলোহীন অন্ধকারহীন অথচ স্বয়ং প্রকাশ স্বচ্ছ ঐ মহাকাশই নির্ম্মল ব্রহ্ম।) "জো ব্রহ্ম সেই সুন্য সোই সূর্য্য জ্যোতি। মহাদেব সো এ হয় সূর্য্যকে ভির।"—(যাহা ব্রহ্ম তাহাই মহাশূন্য তাহাই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি। ঐ আত্মসূর্য্যের ভিতরে যিনি

তিনিই মহাদেব।) **"সূর্য্যই নিরাকার পরমব্রহ্ম স্বরূপ ওঁকার রূপ।"**—(ঐ আত্মসূর্য্যই নিরাকার পরমব্রহ্ম স্বরূপ ওঁকারের রূপ। **"সূর্য্যই ওঁকার মালিক।"**—ঐ আত্মসূর্য্যই ওঁকার মালিক অর্থাৎ সবকিছুর উৎপত্তি ও স্থান।)

উলটি ওয়াসো জ্ঞানকো লাগি	
ইসবিধ দেবা সেবু।	—পিছে লেজানা
গুরগম ভিতর জপে অজপা।	—প্রাণায়াম
হৃদয় পুস্তক কিজিএ॥	—হৃদয় দেখনা
অনভও কথা কিছু ভাই সাধো	
ইহ বিধ পাঠ পঢ়িজেৎ॥	—ভবিষ্যৎ
অনহদ ঘণ্টা ঝালর বাজে।	—অনাহুত শব্দ
অলখ পুরুষকি সেবা॥	—পুরুষোত্তম
পুরাধা নিরন্তর এয়সা সাধো।	—রাতদিন সাধো
বোম বোম সে দেবা॥	—সর্ব্বব্যাপী
গঙ্গা জমনা রহে সরস্বতী।	—ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না
জহঁা জায় ধ্যানকা ধরিজো।	—বন্দ করকে ধ্যান ধরে
ত্রিকুটি মন্দির বৈঠা সাধো।	—ধ্যান ভোঁকে
ওহঁা জায় দর্শন কিজিএ।	—কূটস্থ
সহজ সিংহাসন নির্ভয় সেবো।	—সহজ সমাধি
চিত কি চমর কিজিএ॥	—চিত্ত কি চমর য়ানে মনসে প্রাণায়াম।

১৮৭৩ খৃঃ ১লা নভেম্বর লিখিয়াছেন—**"ওঁকার আউর স্থির বড়া গম্ভির। জো ওঁকার সো মেরা রূপ। ওঁকার সার শব্দ—ওঁকার শব্দ যেয়াদা সোকে সুননে লগে। স্থির ঘর বড়া সুখ।"**—আত্মসূর্য্যই ওঁকার, এই ওঁকার এখন আরও স্থির ও গম্ভীর অর্থাৎ ভারী ধ্বনিযুক্ত। যাহা ওঁকার অর্থাৎ আত্মসূর্য্য তাহাই আমার রূপ। ঐ ওঁকারই সকল শব্দের সার, কারণ ঐ আত্মসূর্য্য হইতেই সকল শব্দের উৎপত্তি। এখন ঐ ওঁকার শব্দ শুইয়া শুইয়া অধিক শুনিতেছি। এই যে স্থিরাবস্থা ইহাতে বড়ই আনন্দ, এমন আনন্দ আর কিছুতেই নাই।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় জীবের এই চার অবস্থার কথা বলিতে গিয়া যোগিরাজ বলিয়াছেন—

জাগ্রত (জাগনা)—সুরতমে প্রাণায়ামকে হমেসা রহনা অর্থাৎ কুটস্থ অক্ষর হমেসা দেখনা—নিরন্তর ব্রহ্মমে লয় রহনা।

স্বপ্ন (অল্প নিদ্রা)—সব সংসারকো স্বপ্নবৎ দেখনা কভি কভি সচ্চা মাননা—উসিমে বিহ্বল রহনা।

সুষুপ্তি (ঘোর নিদ্রা)—ওঁকার অনহদমে থোড়া লগনা আউর ছুট জানা। উসিমে মনকো লয় করনা।

তুরীয়—মহানিদ্রা অর্থাৎ জাগ্রিতমে অজাগ্রিত রহনা। ব্রহ্ম ও মনকো এক করনা এক হো জানা।

জীবের অবস্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ওঁকার—কূটস্থ অক্ষর দোনাচার্য্য—

চক্রব্যূহ মায়া
সকটব্যূহ কর্ম্ম } ইসকে ভিতর জীব বৈঠা হয়।"
কমলাব্যূহ মোহ

"শান্তাকার শান্তাকার কহে সব লোই
শ-অন্তে ভয়া জিসকা ওহি মর্ম্ম পাই
গুরুকৃপা বিনা ভয়ে কইসে মঙ্গল হোই
শ-কে অন্তে আউর ক্যা কেবল ওঁকার হোই
শান্তাকার দেখেপর নয়নমে দুই বিন্দি হোই ॥
ওয়াকো দেখে ওহিরূপ নব ফির হোজাই
ভুজাবল যো সাঁপ চলত ঘরাইমে ওপর নর সোই।
ভুজগ এয়সা বনা হয় সুর নর মুনি সবে খাই ॥
পদ্মনাভ সান্ত্র ওয়াকো কহত হয়
নাভকমল হরদম আই ও জাই ॥"

("বলগো বল আমায় বল
তারে দেখে এলি কোথায়
সকল জ্যোতির জ্যোত
আনন্দেরি শ্রোত
নাচ কালী কোমর নেড়ে
আমার মাথায় ॥")

"কণ্ঠে বসো তুমি হরিরমনি
কে জানে মা তুমি কার রমনি
শিবে শৈবানি ত্রিলোচনিবানি
কাত্যায়নি কাদম্বিনি ভবানি
শুলপানি খড়্গপানি সর্ব্বানি
শি শি শব্দ বলে করবে ধ্বনি
জগতপিতা ভর্ত্তা সংহারিনি
অনাহুত হয় ওঁকার ধ্বনি
ধ্বনিরন্তর জ্যোতি শ্বেতরূপিনি
কে জানে কি কালী কাল নাগিনি
স্বরূপাখ্যানে সে মন রমনি ॥"

"পেএ ছেড়োনা কোন জন, সে জে বিরলের ধন
স্বপ্রকাশ মন, বলার থা পায়না মন
অবর্ণ বর্ণন আছে বেদের লিখন
সে জে অভাবেরি ভাব—মাথার টনকমড়া ভাব,
ভাবতে গেলে কুল না পায় মুনিজন,
কালীঘাটে চলোরে মন যেথায় আছে হরিধন,
যেখানে শ্রীনাথের ধাম আনন্দকানন ॥"

"কার সাদ্ধি ঠোকর মারে
এ অতল স্পর্ষে।
যদি থাকেন ত্রিপুরারি
তবেতো ভরসা করি
নতুবা প্রাণেমরি
সকল যায় ভেসে ॥"

"আঁখ মুদেঁ তুম ক্যা দেখ
বইঠে ব্রামণ রাম

আঁখ আপ মুদেঁ তব
দেখো সহজে আত্মারাম।
আত্মা ক্যা দেখাই পড়ে
ঝুটে ধ্যান ধরো মতি
তদা লক্ষণ আত্মানং
জ্যোতিরূপং প্রপশ্যতি
আত্মা দেখে ক্যা ফল
আউর কৈ্যসে কার্য্য সধায়
পরমাত্মা মনে মন
জয়সে বির্য্য পড় যায়।
হুরে হুর কবলে সোচে
যামে হয় বড় কষ্ট
ভক্তিসে পলমে মিলে তব
এক সর্ব্ব বিষিষ্ট ॥”

“একজন আছে পড়ে
বলোনা বলোনা তারে,
সেজে অন্তরেরি অন্তর
বলবে কেমন করে।
জড়বৎ স্থির সেজে
আবার জিতেছে চপলারে,
মাতালকে মত্ত করায়
গুণ কে বলতে পারে।
সগুণ নির্গুণ সেতো
আমা ছাড়া বইতে নারে,
মন জেনেশুনে কেন না
চিন্তা কর সদা তারে।
অষ্টসিদ্ধি পড়ে আছে
চিন্তামণির নাচ দ্বারে ॥”

"মন রাজাকো ভগবানকে তরফ লগা।
পাঁচো ইন্দ্রিকো লড়াই করে
সব ইচ্ছাকে সাথ
তব সইচ্ছাকো দূর করেগা ॥"

"আঁধি দেখে আঁধি
উ্চ ধায়
কিছু না দেখতে পেএ
কেবল চোখ রগড়ায়।
মিছে কেন মনকে
ভ্রমণ করায়
দেখতো ঘটের ভিতর
স্বরূপ জলধর কায় ॥"

"হে মন দেও তুম সদা হাজিরি,
আপসমে ক্যা তুম করো জারি।
লেও রামনামকা তবিলদারি,
রামকে ধনুয়া রাম তোড়ডারি।
ইহ কাম হয় অত্যন্ত ভারি,
সাঁপকে মারনেসে হয় হুনরি।
মদন হয় দুস্মন বড় ভারি,
মদনকা অগ্নি হয় হমেশা জারি।
নাগরস দেকর উস্কো মারো,
নাগিনকে তব উস্পর জরো।
রগড় রগড় তর উস্কো জারো,
এয়সেকর পরম লাভ করো।
ব্রহ্মপদ কাঞ্চন এককর নিহারো,
অতুল্য ধন হয় তব তুমারো ॥"

"ক্ষিতি চক্রে জাবি
চার বিন্দু দেখতে পাবি
তারমধ্যে বিজ লং প্রথীবি ॥"

এ বিষয়ে যোগিরাজ প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এক অপূর্ব্ব যৌগিক শিক্ষা দিয়াছেন—

প্রশ্ন ব্রহ্মা কিসে কহিদেহু গুরু মুঝে বতায়।
উঃ খানেসে ইচ্ছা উপজে উহ চৌদিশ ধায়।
প্রশ্ন হমতো উসে দেখে নহি ক্যাসা উস্কা কায়।
উঃ হংস উস্কা নাম হয় উস্পর ইচ্ছা জায়।
প্রশ্ন হংস কিসে কহে ইস্কা ক্যা হয় অভিপ্রায়।
উঃ স্বাসা হংসকা রূপ হয় বঢ়ে উল্টা চলায়।
প্রশ্ন আদমি ক্যা পানিতরে মট্টি ছোড়কে যায়।
উঃ গরমি প্রাণায়ামসে পানি শিরদি আয়।
প্রশ্ন হংসকি আওয়াজ দিজিএ আদমিসে মিলায়।
উঃ যং রং লং বং সক্তি বিন্দু মিলদেত সুনায়।
প্রশ্ন ইহ সব ক্যা হয় হমে দিজিএ সমঝায়।
উঃ লং প্রথিবি বিজ হয় এহি সব করায়।
প্রশ্ন লং কইসে প্রথীবিজি দিজিএ বতায়।
উঃ দন্তবর্ণ চৌরঙ্গি ইচ্ছা মনমে দেখায়।
প্রশ্ন নিরাকার ক্যা মনুশ্য রহে প্রথিবি আয়।
উঃ স্বাদরহিত ভোজন নিরাহার বোলায়।
প্রশ্ন আহার বিনা কইসে জিএ পৃথ্বিতল আয়।
উঃ নিঃশব্দ ইচ্ছারহিত মনহি মন জায়।
প্রশ্ন বং বিজকা ক্যা কারখানা দিজিএ দেখায়।
উঃ উস্কাকা শুক্লবর্ণ জলরূপ দর্শায়।
প্রশ্ন জলসে ক্যা ইচ্ছা ভয়া সো দিজিএ বতায়।
উঃ জিহ্বাসে জল গিরে ইচ্ছা মালুম হোজায়।
প্রশ্ন লোভকা ক্যা রূপ হয় কধিতই দেখায়।
উঃ লালমু আখ আঠওর উচকা কহায়।

প্রশ্ন রং রক্তবর্ণ অগ্নিমণ্ডল ক্যোঁওকর দেখায়।
উঃ মারে বান জব শব্দকা বোলে বিনাশ রহায়।
প্রশ্ন যং বায়ুমণ্ডল ধূম্রবর্ণ মদনালায়।
উঃ উহুঁ। বাঞ্ছাতি রিক্তফল কভি ন নশায়।

তাই যোগিরাজ তাঁহার দৈনন্দিন সাধন উপলব্ধির কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"ব্রহ্ম জলকা রূপ হয়। রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা। ধুয়াসে কুছ পতলা ব্রহ্মকা রূপ নিরাকার মালুম হুয়া।"

যোগিরাজ তাঁহার দিনলিপিতে প্রায় সবকিছুই লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার ঐ দিনলিপি হইতে তৎকালীন বাজার দর সম্বন্ধে এক মনোরম তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৯০ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর তিনি প্রাণকৃষ্ণ মোদক নামে কাশীর এক দোকানদারকে ছয় সের সন্দেশের দাম দিয়াছেন তিন টাকা এবং আধমন দুধের দাম দিয়াছেন আড়াই টাকা। ঐ দিনই রামচরণ নামক অপর এক দোকানদারকে দিয়াছেন পাঁচসের তিনপোয়া বুঁদিয়ার দাম দুই টাকা ছয় আনা, দুই সের তিন পোয়া কুচুরির দাম এক টাকা এগার আনা এক পয়সা, পাঁচসের জিলাপির দাম দুই টাকা তিন আনা এবং সাড়ে আট সের মাঠার দাম দুই টাকা সাত আনা।

* * * *

যোগিরাজ তাঁহার দিনলিপিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে যে যৌগিক ব্যাখ্যা বা আন্তর ব্যাখ্যা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা অবিকল দেওয়া হইল—

প্রশ্নঃ—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দেবকী ও বসুদেবের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ, পরে কংস ভয়ে বসুদেব কর্ত্তৃক গোকুলে নন্দভবনে রক্ষা। নন্দ ও যশোদার পুত্র বলিয়া খ্যাত হওয়া, গোকুল হইতে গোপ ও গোপিনী সহিত ব্রজে (বৃন্দাবনে) আগমন, তথায় বলরাম সহিত গোপ সকল সমভিব্যাহারে গোচারণ, উল্লম্ফণ ও প্রলম্ফণ, ননীচুরি হেতু যশোদা কর্ত্তৃক উদুখলে বন্ধন ও হস্ত দ্বারা দুই অর্জ্জুন বৃক্ষ উৎপাটন, কংস প্রেরিত নানা অসুরকে বলরাম সাহায্যে হনন, যমুনা মধ্যস্থ কালিয় দমন, অগ্নিপান, নন্দ ইন্দ্রযজ্ঞ করিবার মানস করিলে তাঁহাকে তাহা হইতে নিবারণ করাইয়া নিজ যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন, ইন্দ্র

কুপিত হইয়া বর্ষাধারা পাতিত করিলে ব্রজগোপ ও গোপিনী রক্ষার্থে গোবর্দ্ধন ধারণ, শৈশবাবস্থায় দুই পদ দিয়া একখানি খাট (শকট) উল্টাইয়া ফেলা, পূতনাকে স্তন পান দ্বারা বধ করা, বেণুরবে ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই সমাহিত, বশীভূত ও নতকরণ, এমন কি পরস্ত্রী সকলকেও নিশাকালে গৃহত্যাগে ও নিজস্বামী হইতে পুত্র ও পরিজন ত্যাগ করাইয়া তাহাদের বস্ত্র হরণ ও পূর্ণিমায় রাস ক্রিয়া করিয়া তাহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণ হইয়া রমণ, পরে বলরাম সহ মথুরায় গিয়া মত্ত হস্তি, চাণুর, মুষ্টিক অন্যান্য অসুর ও পরে কংস বধ করণ ও দ্বারকাপুরি নির্ম্মাণ ও তথায় অবস্থান।

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ	কূটস্থ
মথুরা	মস্তক
দেবকী	শরীর
বসুদেব	আত্মা
কংস	মায়া
গোকুল	কণ্ঠমূলে জিহ্বার দ্বারায় অবস্থিতি করা।
নন্দভবন	স্থিতিপদ
গোপ গোপিনী	ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা আত্ম শরীর সহযোগে।
যশোদা	যশ হয় স্থিতি হইলে।
ব্রজ	চলিয়া যাইতেছে।
বৃন্দাবন	কূটস্থের মধ্যে বনাদি দেখা।
বলরাম	বলপূর্ব্বক বায়ুতে টান স্থির।
গোপ	নানামত ক্রিয়া ত্রিকুটা ব্রহ্মরেখা পঞ্চশ্রোতা ইত্যাদি জিহ্বার স্থান সকল।
গোচারণ	গো শব্দে জিহ্বা, চারণ অর্থাৎ লইয়া যাওয়া অর্থাৎ জিহ্বাকে তালুকুহরে লইয়া যাওয়া।
উল্লম্ফণ	জিহ্বাকে লাফাইয়া উর্দ্ধে উঠান।
প্রলম্ফণ	ভালরূপে জিহ্বা উঠান।
ননীচুরি	চন্দ্রলোপ, চন্দ্র কূটস্থে মিলিয়া যাইল।
যশোদা কর্ত্তৃক	যশ স্থিতি হইলে।
উদুখল	মস্তক।

বন্ধন	আটকাইয়া থাকা।
হস্তদ্বারা	সুষুম্না।
দুই অর্জ্জুন বৃক্ষ	ইড়া ও পিঙ্গলা।
পাতন	ফেলে দেওয়া অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ত্যাগ করিয়া সুষুম্নায় থাকা।
নানা অসুর	অন্য দিকে মন।
হনন	নাশ।
যমুনা	পিঙ্গলা নাড়ী।
মধ্যস্থ	সুষুম্না।
কালিয়	চলার নাম, কাল, কালিয়, জগৎ।
দমন	স্থিতি।
অগ্নিপান	বায়ু দ্বারা জল অগ্নি শোধিত হইয়া শরীরে অগ্নি হয় সেই বায়ু স্থির হইলে অগ্নিপান হইবে।
ইন্দ্রযজ্ঞ	কূটস্থে ব্রহ্মে থাকিয়া আটকাইয়া থাকা।
নিবারণ	মনকে অন্যদিকে যাওয়া হইতে নিবারণ করা।
নিজযজ্ঞ	ক্রিয়ার পর অবস্থা।
ইন্দ্র কুপিত হইয়া বৃষ্টিধারা পাতিত করিল	আসক্তি পূর্ব্বক চক্ষু দ্বারায় বা অনুমান ও মনের দ্বারায় অন্য তত্ত্বেতে থাকিয়া একের পর আর চিন্তা স্বরূপ বৃষ্টি পতিত হইল।
গোবর্দ্ধন ধারণ	ওঁকার ক্রিয়ার নিমিত্ত জিহ্বা বাড়ান ও ধারণ।
শৈশবাবস্থায় দুই পদ দিয়া একখানি খাট/শকট উল্টাইয়া ফেলা	ক্রিয়া প্রাণায়াম দ্বারায় নীচে হইতে মস্তকে উঠান এই খাট/শকট উল্টান।
পূতনাকে স্তনপান করিয়া বধ করা	বক্ষেতে বায়ু স্থির করাতে অনাত্মাকে নাশ করা।
বেণুরব	ক্রিয়ার শি শি শব্দ।
ব্রহ্মাদি	ইচ্ছা সকল।
দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থই মোহিত।	বসিয়া হয় অর্থাৎ সকলের দ্বারায় যাহা ইচ্ছা করে তাহা হয়।
পরস্ত্রী	মায়া।

নিশাকালে	যখন অন্ধকার।
গৃহত্যাগ	আত্মাতে না থাকিয়া পঞ্চতত্ত্বেতে মন।
নিজস্বামী	অহঙ্কার।
পুত্র, আত্মীয়	মায়া।
বস্ত্রহরণ	নিরাবরণ অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
পূর্ণিমায় রাসক্রিড়া	সকলেতেই ব্রহ্ম দেখা।
হস্তি, চাণুর, মুষ্টিক অন্যান্য অসুর ও কংস	সমস্তই মায়া।
দ্বারকাপুরি	কুটস্থ।

* * * *

"সেওয়ায় ভগবানকো জো কোই কাম করে সো বড়া খরাব আদমি হয়—সব মন লুট জায় পর উসপর নজর ন করে—জো ভগবানকো হামেসা ধ্যান করে উসকো কাম উহ করতা হ্যায়।"—যে ব্যক্তি ভগবানকে বাদ দিয়া আর সব কাজ করে সে লোক বড়ই খারাপ। যখন বর্ত্তমান চঞ্চল মনের অস্তিত্ব চলিয়া যায়, মনেতে মন অবস্থান করে, মন্মনা অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন বর্ত্তমান চঞ্চল মনের দিকে আর বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই—প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন এই রকম উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই প্রকৃত ধ্যানাবস্থা। এই প্রকার উন্মনী ধ্যানাবস্থা যিনি সর্ব্বদা ভগবানে লাগাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহার সকল কর্ম্ম তখন ঈশ্বরই করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। কারণ তখন আর তাঁহার কর্ম্ম থাকে না। এই অবস্থায় তাঁহার সকল কর্ম্ম আপনা হইতেই হয়। তাই ২৬শে মার্চ ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"আহস্তে আহস্তে বেমালুম সব কাম হোতা হয়।" —আস্তে আস্তে গোপনে বা কিছু না জানিতেই সমস্ত কর্ম্ম আপনা হইতেই হইতেছে, নিজেকে আর চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে হইতেছে না। এই অবস্থা যোগীর হয় কখন? তিনি বলিয়াছেন—"বিনা ইচ্ছার লাভ বড় লাভ বোধ হয় তদবৎ বিনা কুম্ভকে কুম্ভক বড় আনন্দ।"—যে বস্তুকে পাইতে কখনও ইচ্ছা করে নাই অথচ সেই বস্তু হঠাৎ লাভ হইলে বড় লাভ বলিয়া মনে হয় তদ্রূপ ইচ্ছাকৃত কুম্ভক না করিয়াও যে কুম্ভক আপনা হইতেই হয় তাহা বড়ই আনন্দের। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগী সকল প্রকার ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেন। তাই

তিনি লিখিয়াছেন—**"সর্ব্বশক্তিবানকা হোনেকা আগম মালুম হুয়া জো সকল সব চিজ জানতা হেয় সো সকল সব চিজ কর সেক্তা হেয়। জব সব ঐহি হেয় তো হমভি ঐহি হেয় ত হম সব কুছ কর সেক্তা হয়।"** অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ার সব রহস্য বুঝিলাম, যে ব্যক্তি সব কিছু জানিতে পারে সেই ব্যক্তিই সব কিছু করিতে পারে। যখন সবকিছুই তিনি তখন আমিও তিনি অতএব এখন আমিও সবকিছু করিতে পারি। ১৩ই মে ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—**"ইহ সূর্য্যহি আদি পুরুষ হো জাতা হয় ফির এহি ব্রহ্মকা লিঙ্গরূপ লম্বা মালুম হোতা হয় সোই হম হয়। উসসে এক জ্যোত নিকলতা হয় জো ন দিন ন রাত—উসসে মিল যানেকা নাম হুয়া লয় তবহি শরীরসে বুদা হোতা হয়—আউর যো কুছ ইরাদা করে সো কর সক্তা হয়—দশ রোজ রাতদিন একাগ্রচিত্ত বিনা খাএ পিএ সোএ প্রেমলগাওএ তব ইহ বাত সিদ্ধ হোয় বিনা সব আশা ছোড়নেসে ইহ বাত কএসে হোগা—আগে মর্জি মালিক কি।"** অর্থাৎ এই যে আত্মসূর্য্য দেখিতেছি ইহাই আদি পুরুষ হইয়া গেলেন, আবার ইহাই ব্রহ্মের লম্বা লিঙ্গরূপ হইলেন, উহাই আমি। ব্রহ্মের সেই লিঙ্গরূপ হইতে এক জ্যোতি বাহির হইতেছে যেখানে দিনও নাই রাত্রও নাই স্বয়ং প্রকাশ, সেইখানে মিলিয়া যাওয়ার নাম লয়। এই প্রকার লয় যখন হইল তখন শরীর নিস্পন্দ হইয়া গেল, এই অবস্থায় যাহা কিছু ইচ্ছা করি সবই করিতে পারি ; দশদিন দশরাত্র কোন কিছু খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, কোন কিছু পান না করিয়া, না শুইয়া একাগ্র চিত্ত হইয়া একাসনে আত্মকর্ম্ম করিলে তবেই এই অবস্থা সিদ্ধ হয়, কিন্তু সকল প্রকার আশা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কেমন করিয়া হইবে ? অর্থাৎ মনের তরঙ্গ হইতেই আশার উৎপত্তি। মনের তরঙ্গ যতক্ষণ থাকিবে আশাও থাকিবে। আত্মকর্ম্ম করিতে করিতে যখন সকল প্রকার তরঙ্গ চলিয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে স্থির হইবে তখন আশা থাকিবে না, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতেই সবকিছু সিদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ স্থায়ী স্থিতি-অবস্থা লাভ হয়। তাই তিনি মালিকের উপর সব ভার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার শরণাগতি হইয়া বলিতেছেন—এইবার সামনে যে কঠিন সাধন অর্থাৎ সাধনার যে কঠিন স্তর দেখিতেছি তাহাতে মালিকের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক। এই কঠিন স্তর সম্বন্ধে তিনি ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ খৃঃ লিখিলেন—**"স্বভাব ব্রহ্ম হয়—ইসসে পার জানা মুস্কিল আজ ইন্দ্রিয়োনে সতায়া সবকো মারকে আশা ত্যাগকে আপনে আপ লয় হোনা কাম হয়—লেকন মগন রহনেসে**

আনন্দ রহত হয়—পর বিষয় চৈতন্য নহি রহতা হয়—রাতকে অব এহি এরাদা করতা হয় কি রাতভর বৈঠকে মগন কটাওএ—তাকত কুছ বড়ানা চাহিয়ে।"—আত্মভাবই ব্রহ্ম, ইহাকে অতিক্রম করা কঠিন। তাই আজ সমস্ত ইন্দ্রিয়দের দমন করিয়া, সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া নিজেকে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণরূপে লয় করিয়া দেওয়াই আমার কাজ। সেই নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিলে আনন্দ থাকে, সে অবস্থায় আর বিষয় চৈতন্য অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি থাকে না। তাই এখন ইচ্ছা হইতেছে সারারাত ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সমাধিস্থ অবস্থায় কাটাইতে, সেজন্য অবশ্য আরও কিছু অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে ২৯শে জুন ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—**"অব ভিতর ভিতর কুছ কুছ জানে লাগা—বড়া কঠিন কবারা—ইঁহা কোই হয় নহি কি জিসকো পকড়কে হোসমে আদমি রহে—জয়সে নিদ—লেকন ঠিক নিদ নহি হয়—হমেসা ওঁকার ধ্বনি—রাজা পুরুষোত্তম সামনে খড়ে—সন্তোষামৃত পান—ইস মজেকে আগে কোই মজা জো করে সো চাখে নহিতো রহে গোতা খাতে।"** অর্থাৎ এখন ভিতরে ভিতরে কিছু কিছু প্রবেশ করিলাম, ইহা কঠিন দরজা, এই কঠিন কপাট অতিক্রম করা মুশকিল। এখানে এমন কেহ নাই যাহাকে ধরিয়া হুঁশে থাকা যায় অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যখন সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায় তখন দুই না থাকায় কে কাহাকে ধরিবে? অর্থাৎ জাগতিক খেয়াল বিহীন এক বেহুঁশ অবস্থা। যেমন নিদ্রা, আবার ঠিক নিদ্রাও নহে। এই অবস্থায় সর্ব্বদার জন্য ওঁকার ধ্বনি শুনা যায়। রাজাধিরাজ পুরুষোত্তম সামনে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাই সন্তোষামৃত পান। এই প্রকার আনন্দ পাইবার পূর্ব্বে আর যে সব আনন্দ তাহা কেবল চাখা মাত্র সার, তেমন ব্যক্তি কেবল সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে গোত্তা খাইতেই থাকে। পুনরায় লিখিয়াছেন—**"পিছে মেরাদণ্ডমে স্বাসা মজেসে চলনে লগা—আব ঘরমে আএ—আব বড়া আনন্দ—মুর্দা জিতা হয় জবতওমে লয় হোয়—জিসকা কি ব্রহ্মময় দৃষ্টি হয় উনকে ইচ্ছা করনেকে পহিলে মনোকামনা সিদ্ধ হোয়—অব স্থির হোনেকা লক্ষণ পক আয়া হয়।"**—পিছনে মেরুদণ্ডের ভিতর অর্থাৎ সুষুম্নায় শ্বাস সহজেই চলিতেছে, এখন স্থির ঘরে আসিলাম, এখন বড়ই আনন্দ হইতেছে। এরপর যখন সব কিছু লয় হইয়া গেল তখন আর দেহবোধ থাকিল না অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ সকল প্রকার তরঙ্গ চলিয়া যাওয়ায় যে দেহবোধহীন অবস্থা তাহার জয় হইল অর্থাৎ সেই দেহবোধহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় থাকিবার

পাকাপাকি অভ্যাস সঞ্চয় হইল। অর্থাৎ এই দেহকেই মৃত দেহে পরিণত করিয়া, মৃতবৎ স্থির করিয়া তাহার অভ্যন্তরে অবস্থান করা, ইহাই প্রকৃত শবসাধন। কোন মৃতদেহকে টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া সাধন করিলেই শবসাধন হয় না। এই প্রকার দেহবোধহীন অবস্থাপন্ন যে যোগী তাঁহার সর্ব্বদা ব্রহ্মময় দৃষ্টি হয়, তাঁহার কোন কিছু ইচ্ছা করিবার পূর্ব্বেই সেই মনোবাসনা আপনা হইতেই পূর্ণ হয়। যোগিরাজ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন—এখন ঐ প্রকার স্থির অবস্থার লক্ষণ পাকাপাকি হইল। ইহা যোগীর এক উত্তুঙ্গ অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছাইয়া ৬ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"**ব্রহ্মই অসল হয়—সূর্য্যরূপ হয় ফির উহ রূপ নহি হয় কেবল ব্রহ্ম—অব এক জগই বইঠকা এরাদা করে—সাহস করকে জো করে সো হোয় এয়সা মালুম হোতা হয়—স্ত্রিমাতারি পুরুষরূপ লড়কি মাকারূপ—লড়কা বাপকারূপ—বাপমাতারি সব জাতা হয়—আপনা সব দোনো রূপ রুখ জাতা হয়—পুরুষ প্রকৃতি ছোড়ায় আউর কুছ নহি ইহ অনাদি বনা হয়—উসকা বহুত রূপ হয় ইসলিএ উহ অনন্তরূপ হয়—লেকন একহী রূপকা সকল পসারা হয়।**"—ব্রহ্মই আসল অর্থাৎ আদি। তাহাই আত্মসূর্যরূপী হইলেন, আবার উহাও রহিল না মহাশূন্যে মিলিয়া গিয়া কেবল স্থির ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিলেন। এখন একাসনে কেবল বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে এবং ইহাও বুঝিলাম যে এখন সাহস করিয়া যাহা কিছু করিব তাহাই হইবে। স্ত্রী-মাতা পুরুষরূপ হইলেন, কন্যা মায়ের রূপ এবং পুত্র পিতার রূপ হইলেন। এইভাবে সব মিলিয়া মিশিয়া পিতা-মাতা সহ সকলেই সেই মহাশূন্যে মিশিয়া গেলেন, এমন কি নিজেকে যে স্বতন্ত্র দেখিতেছিলাম, দ্বৈতভাবে দেখিতেছিলাম তাহাও স্তব্ধ হইয়া গিয়া একাকার হইয়া গেল। এই প্রকারে পুরুষ-প্রকৃতি ব্যতীত সর্ব্বত্র আর কিছুই দেখিতেছি না, সেই পুরুষ-প্রকৃতিই অনাদি হইতেছেন। সেই পুরুষ-প্রকৃতিই বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার অনন্তরূপ হইতেছে কিন্তু ব্রহ্মের সেই একই রূপ হইতে সব কিছু প্রসারিত বা বিস্তারিত দেখিতেছি। তাই তিনি সকল ভক্তকে বলিতেন—"**আইনেমে দুই দেখনেসে অহংকার এক দেখনেসে কুছ নহি।**"—আয়নাতে যতক্ষণ দুই দেখা যায় ততক্ষণ অহংকার ইত্যাদি সবই থাকে, কিন্তু যখন সবকিছু মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় তখন আর কিছুই নাই, কারণ দুই না থাকায় অহংকার কাহার হইবে?

যেখানে দুই নাই সেখানে প্রমাণ নাই। এই শরীরে যতক্ষণ ততক্ষণই প্রমাণ। যখন শরীরবোধ নাই তখন দুই নাই। যেমন রৌপ্য একটি ধাতু। এই ধাতুগুণ যাহাতে আছে তাহাও রৌপ্য। এই দুই বস্তু বা গুণ যেখানে নাই তাহা প্রমাণাতীত স্থান। তত্ত্বের ক্রিয়া করিয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা তত্ত্বাতীত স্থান। দুই থাকায় দুঃখ, দুঃখাতীত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বদা দ্বন্দ্বাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা কর্ত্তব্য। দুই থাকিলেই দ্বন্দ্ব, ব্রহ্ম দ্বন্দ্বাতীত। একারণ প্রমাণ ও প্রমেয় দ্বারায় ব্রহ্ম নিরূপণ করা যায় না। ক্রিয়া করিলে যে সমস্ত রূপ দেখা যায়, ঐ সকল রূপ কি, কোথা হইতে আসে এবং কি প্রকারে দেখা যায়, এই সকল চিন্তা করিয়া মনেতে একটি দ্বেষ জন্মাইল এবং উহা দেখিবার নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইল। দৃশ্য বস্তু মাত্রই নাশবান্, সকল অবয়বের মধ্যে অণুস্বরূপে যে ব্রহ্ম আছেন তাহার অতীত যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাই তত্ত্বজ্ঞান। উপরোক্ত রূপ সকল দেখিয়া মনে নানা প্রকার তর্ক উপস্থিত হইল অর্থাৎ উহা প্রকৃত কি ভ্রম? এই তর্ক মনে উদিত হওয়ায় উহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া দ্বেষ জন্মাইল; ইহাতেও ব্রহ্ম নাই। তর্ক বিতর্কের দ্বারায় অবশেষে স্থির হইল যে এই সকল চঞ্চল মনের কর্ম্ম। স্থির মনই ব্রহ্ম। আর ঐ সকল রূপের বিষয় এত সূক্ষ্মরূপে মনে হইয়াছিল যাহা অনুভব করা যায় নাই। এইরূপ নির্ণয় দ্বেষের কর্ম্ম কিন্তু দ্বেষেতেও ব্রহ্ম নাই কারণ ব্রহ্ম তত্ত্বাতীত। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি নাই তখন দুই নাই। অতএব দুই না থাকায় দ্বেষ হিংসা তর্ক প্রভৃতি নাই। ঐ অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিলেই তত্ত্বজ্ঞান। তখন বাদ জল্প বিতণ্ডা প্রভৃতির পর শূন্যতত্ত্ব। সেই শূন্যতত্ত্বই ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম তত্ত্বাতীত। যেখানে দুই সেখানেই প্রমাণ, কিন্তু প্রমাণের অতীত ক্রিয়ার পর অবস্থা; কারণ সেখানে দুই না থাকায় প্রমাণ নাই। তবে কি এক আছে? সে একেরও থাকা না থাকা দুই সমান; কারণ যে এক বলিবে সেও যদি এক হইয়া গেল তখন একের থাকা আর না থাকা দুই সমান। অতএব ব্রহ্ম প্রমাণাতীত, ব্রহ্মের প্রমাণ ব্রহ্মই হইতেছেন। এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ দ্বারায়। যেমন চক্ষু দ্বারায় রূপ দেখা যায় কিন্তু মৃত দেহেও চক্ষু আছে তবুও দেখিতে পায় না কেন? চক্ষুর দ্বার দিয়া যে শক্তি দ্বারায় দেখা যায় তাহা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মতেজ। সকল তেজের আধার ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন তেজ নাই অথচ তেজ। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা উৎপন্ন হয়। উৎ=ঊর্দ্ধে, পন্ন=স্থিতি। তখন প্রাণবায়ু স্থির হইয়া

ব্রহ্মেতে মিলিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা উৎপন্ন হইল অর্থাৎ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না তাহা হইল, ইহাই জ্ঞান, ইহা নিজ বোধরূপ। তবে এই ব্রহ্মের উপমা কি ? সাধ্য, সাধনা ও সাধর্ম্ম। সাধ্য—যাহাকে সাধা যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম। সাধনা—যাহার দ্বারায় সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় অর্থাৎ ক্রিয়া। সাধর্ম্ম—ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলেই অন্যদিকে মন যায়, অন্যদিকে মন গেলেই লক্ষ্য হয় এবং লক্ষ্য হইলেই কষ্ট হয়। অন্যদিকে মন যাওয়া পৃথিবীর কর্ম্ম। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকাই দোষ। প্রবৃত্তিতে থাকিলেই জন্ম হয়। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় যে দোষ হইতেছে তাহাই ফল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় মনে যে সকল ইচ্ছা উৎপন্ন হইতেছে ঐ সকল ইচ্ছানুসারে নানান কর্ম্ম হইতেছে, আর ঐ কর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্ত জন্ম হইতেছে। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা না থাকিলে কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম না থাকিলে ফল বা প্রবৃত্তি নাই, অতএব জন্ম নাই। অতএব জন্ম-মৃত্যু রোধ করিতে হইলে তর্ক বিতর্ক না করিয়া, বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ক্রিয়া কর। এইরূপে ক্রিয়া করার নামই সাধন। এই সাধন করিয়া তেজের তেজ মহাতেজ অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ, যেখানে তেজ নাই অথচ তেজ তাহাতে থাকার নাম পঞ্চতপা।

বর্ত্তমান না থাকিলে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। তাই ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের অপেক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমান ত্যাগ করিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ কালের অধীন, কাল না থাকিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যখন প্রত্যক্ষ হয় তাহা বর্ত্তমান, অতএব বর্ত্তমানের অভাবে বা কালের অভাবে প্রত্যক্ষ নাই। আবার যখন প্রত্যক্ষ নাই তখন ভূত, ভবিষ্যৎ, কাল, বর্ত্তমান কিছুই নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভূত, ভবিষ্যৎ, কাল, বর্ত্তমান কিছুই নাই, অতএব প্রত্যক্ষও নাই। এই যে ক্রিয়ার পরাবস্থা তাহা ক্রিয়া সাপেক্ষ। ইহাই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ইহাই স্তুতি। ক্রিয়া করিতে কাহারও অনিচ্ছা জন্মাইলে ক্রিয়ার সুখ্যাতি করিয়া, প্রত্যক্ষ ও দৃষ্টান্তের দ্বারায় তাহাকে বুঝাইয়া তাহার ক্রিয়াতে উৎসাহ বৃদ্ধি করার নাম স্তুতি অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে ভাল হয়, মঙ্গল হয় এবং বহুলোকের উত্তমা গতি হইয়াছে ইহা বলা কর্ত্তব্য। আবার ক্রিয়া লইয়া যাহারা ক্রিয়া করে না, ছাড়িয়া দেয় তাহাদের নিন্দা করা উচিত। এই ক্রিয়া করিলে যে সকল প্রকার হিত হয় তাহা তাহাকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া

দেওয়া উচিত। কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হয় তাহা আয়ুর্ব্বেদে লেখা আছে এবং সেই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলে যখন রোগের উপশম হয় দেখা যায় তখন ইহা প্রামাণিক। তেমনি মনের উপশম বা মনের ত্রাণ করিবার নিমিত্ত যে ক্রিয়া তাহাও প্রামাণিক। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে যেমন রোগের উপশম হয় না, তেমনি উপযুক্ত গুরুর নিকট মনকে ত্রাণ করিবার উপায় না পাওয়ায় মন্ত্র ব্যর্থ হয়। মনের ত্রাণ অবস্থার নামই মন্ত্র। যাঁহাদের প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহারা আপ্ত। সেই আপ্তেরা পরের দুঃখে আর্দ্র হইয়া ক্রিয়ার উপদেশ দিয়া থাকেন। সম্যক প্রকারে মনকে দান করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়। ইহাই সম্প্রদান এবং প্রকৃষ্টরূপে মনকে দান করিতে পারিলে তাহা কখনও ছাড়ে না; অতএব যখন ছাড়ে না, সর্ব্বদা আটকাইয়া থাকে তখন অবশ্যই নিত্য। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে গভীর নেশা, তাহার পর যে অল্প নেশা তাহাকেই ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা বলা হয়। যোগী এই অবস্থায় থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করেন, তাই তিনি সমস্ত কার্য্য করিয়াও কিছুই করেন না। অবশ্য ক্রিয়া পাইবা-মাত্র ক্রিয়ার পর অবস্থা উপলব্ধি হয় না, ইহা দীর্ঘ অভ্যাস সাপেক্ষ। অতএব ক্রিয়া পাওয়াটা ক্রিয়ার পর অবস্থার হেতু নহে, ক্রিয়া করাটা হেতু। ক্রিয়া করাটা অধ্যাপনা এবং বারংবার করার নাম অভ্যাস। যখনই ক্রিয়া করা হয় তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ সমাধি হয়, তাই অধ্যাপনা বা অভ্যাসই যে ক্রিয়ার পর অবস্থার হেতু বা কারণ তাহার আর প্রতিষেধ নাই। অতীন্দ্রিয় যে ক্রিয়ার পর অবস্থা (সমাধি) তাহাতে কোথায় ছিলাম, কি অবস্থায় বা কেমন সুখে ছিলাম তাহা নির্ণয় করা যায় না, কারণ যে নির্ণয় করিবে সে মন নাই। উহা সকল প্রকার তত্ত্বাতীত, গুণাতীত; সত্ত্বাতীত ও অস্পর্শ হওয়ায় উহার নিত্যত্বের প্রতিষেধ নাই এবং উহা ব্যক্ত করিবারও কোন উপায় নাই। ব্যক্তিতে বিশেষ প্রকারে গুণের আশ্রয় থাকায় মূর্ত্তি বলে। কৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজা কর; কিন্তু কৃষ্ণেতে যে বিশেষ গুণ আছে, তাঁহার মূর্ত্তি যাহা পূজা করিতেছ, তাহাতে ঐ বিশেষ গুণ থাকা দূরে থাকুক, সামান্য যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তাহাও নাই। বিশেষ গুণ অর্থাৎ অনন্ত গুণ সম্পন্ন যে নারায়ণ উত্তম পুরুষ, যাঁহার মূর্ত্তি তোমার আমার সকলের মধ্যে আছেন তাঁহাকে জানিলেই সত্য নারায়ণ নতুবা মিথ্যা নারায়ণ।

আত্মার নিমিত্ত বুদ্ধি নহে। বুদ্ধির বিষয় সকল চঞ্চল মনের হইতেছে, স্থির মনে কিছুই নাই; কারণ ব্রহ্ম সকল কালেই একভাবে আছেন, অপরিবর্ত্তনশীল। মন, আত্মা এসকল কেবল সংজ্ঞাভেদ মাত্র। যখন মন আত্মাতে তখন আত্মা, আবার যখন তত্ত্বেতে তখন মন। (ইন্দ্রিয় সকল মনের অধীন, মন আত্মার অধীন, আত্মা পরমাত্মার অধীন। এক ব্রহ্মই সমস্ত কিছু হইতেছেন। পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসের অনুবন্ধতে হর্ষ, ভয়, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব জন্মে যে সত্ত্বগুণের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, সে এজন্মেও সত্ত্বগুণের কার্য্য করিবে এবং পরজন্মেও করিবে। পূর্ব্বজন্মে যে সত্ত্বগুণে ছিল এজন্মে সে শৈশবাবস্থা হইতেই ধার্ম্মিক হইবে, আর যে তমোগুণে ছিল সে স্বভাবতই হিংস্রক বা মন্দগতি হইবে। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার লক্ষণ সকল দেখা যায়। যেমন কেহ ব্যাঙ দেখিলে ভীত হয় আবার কেহ হাত দিয়া ধরে। কেহ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়, কেহ অণুমাত্র শোক করে না। কিন্তু পূর্ব্বজন্মানুসারে আত্মার হর্ষ, বিষাদ, ভয়, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি কিছুই নাই। ইচ্ছা মাত্রই মনের হইতেছে; ইচ্ছা রহিতের জন্ম নাই। আত্মা যখন ইচ্ছা রহিত, যখন ইচ্ছা গলিয়া গেল, তখন আত্মার আবার জন্ম কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু আত্মা গুণবিশিষ্ট হইলেই জন্ম) যেমন বৃক্ষের গুণ যাইলে বৃক্ষ শুকাইয়া যায় তেমনি আত্মা নির্গুণ হইলেই ব্রহ্মে লয় হন। ব্রহ্ম অনন্ত, এবং অনন্ত ব্রহ্ম হইতেই সবকিছু হইয়াছে। এই নিমিত্ত ব্রহ্মের ক্ষমতাও অনন্ত। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি অসীমক্ষমতাবান্। ব্রহ্মাণুর সন্নিকর্ষে তিন লোক, তাই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে তিনি তিন লোকই দেখিতে পান। তবে স্থিরত্বের তারতম্য হেতু এবং মন বা গুণের সন্নিকর্ষ হেতু অবস্থাভেদে পৃথক পৃথক দেখা যায়, যেমন মূলাধারে জগধাত্রী সরস্বতী গণেশ ও ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। এই দেখা কর্ম্মও ভূতের ধর্ম্ম হইতেছে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই দেখা নাই। তাহা হইলে না দেখাই যদি ধর্ম্ম হইল তবে দেখা যায় কেন? ব্রহ্মাণুর যে বিভাগে যাহার যে প্রকার প্রকাশ হয় তখন সেই প্রকার দেখা যায় কারণ ব্রহ্মের প্রত্যেক অণুতে তিন লোক। ঐ অবস্থা সূক্ষ্মরূপে ভূতে প্রতিঘাত হওয়ায় পৃথক দেখা যায় অতএব ঐ দেখাও ভৌতিক ধর্ম্ম। কূটস্থের মহৎ জ্যোতিঃ অন্যান্য পার্থিব জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করায় দিবসে উল্কাপাতের ন্যায় দেখা যায় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিবিশিষ্ট দেব ও সিদ্ধগণকে উহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় (যোনিমুদ্রায়)। যখন ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ

আপনা আপনি ব্রহ্মে থাকিলে তখন সবকিছু দেখিতে লাগিলে, কারণ একটি ব্রহ্মাণুর একাংশে জগৎ রহিয়াছে—প্রমাণ গীতা "একাংশেন স্থিতো জগৎ।" আবার আরও অধিক প্রাণকর্ম্ম ও ওঁকার ক্রিয়া করিতে করিতে যখন সমান তেজোবিশিষ্ট হইলে তখন ছোট বড় না থাকায় এবং ভৌতিক ধর্ম্মের অতীতে যাওয়ায় কেহ কাহাকেও আবরণ করিতে পারিল না। যোগিগণ এই প্রকার তেজোবিশিষ্ট ও নিরাবরণ প্রাপ্ত হওয়ায় না দেখিয়াও সবকিছু দেখিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মতেজ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে কিন্তু অসমান হওয়ায় অপ্রকাশ এবং সমান হইলেই প্রকাশ। ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দ্বারায় প্রকাশ হওয়ায় ভিতরের মূর্ত্তি সকল অন্তর্দৃষ্টি দ্বারায় দেখা যায়, আবার ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হইলে দেখাশুনা ইত্যাদি কোন কর্ম্মই থাকে না, যেমন জলে লবণ। তখন অজ্ঞানের প্রকাশরূপ স্বচ্ছ গুণ না থাকায় কূটস্থও দেখা যায় না। ক্রিয়া করিয়া স্থির হইলেই বুদ্ধি, ঐ অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিলেই অধিষ্ঠান, স্থির থাকিলেই যেখানে সেখানে গতি এবং গতি হইলেই আকৃতি দেখা যায়; কিন্তু যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা শূন্য ব্রহ্ম তখন কিছুই নাই, যখন উহার বিপরীত তখনই দেখা শুনা। এই দেখা শুনার বিনাশ থাকায় উহা অনিত্য কারণ দেখা ও না দেখা এক সঙ্গে না হওয়ায় নিত্য নহে। অতএব ব্রহ্মে না থাকায় অবয়বান্তর অর্থাৎ অন্যদিকে মন দেওয়ায় গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি উপাধি হইতেছে। এই সকল উপাধি মিথ্যা; কারণ ব্রহ্মে না থাকায় গুণান্তর হেতু এই প্রকার হইতেছে। আত্মা ও মন দুই এক। আত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থায় নির্লিপ্ত, আবার যখন সুখ দুঃখ মানিয়া লইতেছেন তখন মন। যুগপৎ উৎপত্তি বিভুর, মনের নহে। কেন? যখন চঞ্চল মন স্থির হইয়া বিভু হইতেছেন তখন আত্মা উভয়ই দেখিতে সক্ষম। মন যতক্ষণ বাহিরে ততক্ষণ চঞ্চল, আবার যখন স্থির হইয়া মনে প্রবেশ করিল তখন বিভু; বিভু অর্থাৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্মে যুগপৎ সংযোগ ও যুগপৎ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জ্ঞান ক্রিয়ার পর অবস্থাতে হইয়া থাকে, চঞ্চল মনের হয় না। মন স্থির হইলেই বুদ্ধি, কারণ তখন দেখা, না দেখা, জানা, না জানা কিছুই না থাকায় বিরোধ নাই এবং বিরোধ না থাকায় যখন সমস্ত নিত্য হইল তখন বুদ্ধিও নিত্য। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ ইচ্ছারহিত হওয়াই জ্ঞান। ঐ অবস্থা বা জ্ঞান আত্মক্রিয়ার দ্বারায়

হইয়া থাকে। যে সাধনের দ্বারায় জানা যায় সেই সাধনকে সম্যক্ প্রকারে করার নামও জ্ঞান; ক্রিয়ার পর অবস্থায় জ্ঞান হয়। ঐ অবস্থাকে প্রাপ্ত হওয়ার সাধন ক্রিয়া এবং সম্যক্ প্রকারে ক্রিয়া করিলে অর্থাৎ উত্তমরূপে ক্রিয়া করিলেই জ্ঞান হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাকে জানা যায়। এই সম্যক্ প্রকারে ক্রিয়া করাটা আত্মার, কারণ আত্মা না থাকিলে ক্রিয়া করে কে? আত্মা হইতে সংস্কার হওয়ায় আত্মাতে মনের সন্নিকর্ষ হয়, তখন ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা জাগে এবং ক্রিয়া করিতে করিতে মন আত্মাতে মিশিয়া যায়, এইরূপে আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষ হওয়াতে স্মরণ হয়। যেমন আগামীকাল প্রাতে কোথাও যাইবার প্রয়োজন আছে মনে হইল। পরদিন প্রাতে পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ হওয়ায় সেই স্থানে গমন করিল, এইরূপ পূর্ব্ব জন্মেরও। এ জন্মের আত্মা ও মনের যখন ঐক্য বা সন্নিকর্ষ হইল তখন পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত সকল মনে উদয় হইল এবং তাহা করিল। আত্মার গুণ মন এই নিমিত্ত দুইই এক। ঐ মন স্থির হইয়া আত্মায় আসিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, তখন আত্মা ও মনের যুগপৎ উৎপত্তি হয় না কারণ দুই নাই; যেমন দধি দুগ্ধ এক হওয়ায় জানিবার কেহ নাই। শরীর, মন ও আত্মার সংযোগে জীবন। এই জীবন আত্মা ও মনের সংযোগে কর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া অনুভব করিয়া থাকেন, আবার এই জীবনই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা (বিভু) লাভ করিতে সক্ষম। মনই বহির্জ্ঞানের সংস্কার করে অর্থাৎ বাহিরের বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় অনুভব করে। ইহাতে কিন্তু আত্মার সংযোগের উৎপত্তি হয় না, কারণ আত্মা নির্লিপ্ত। আত্মা নির্লিপ্ত হওয়ায় দেখাশুনা ইত্যাদি মনের। এ সকল শরীর ও মনের বহির্জ্ঞান সংস্কারে হইয়া থাকে। শরীর ভোগায়তন হওয়ায় সুখ দুঃখ সবই শরীরের মনের দ্বারা হইতেছে। স্মরণ করিলেই যে মনেতে সব সময় দেখা যায় তাহা নহে, আবার যাহা দেখা যায় তাহাও কেবল মনের দ্বারায় নহে; আত্মায় মনের সংযোগ হওয়ায় দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মকে জানা মনের নহে, আবরণ দূর হইলে অর্থাৎ নিরাবরণ হইলেই জানা যায়। মন আত্মার সহিত সন্নিকর্ষ হওয়াই স্মৃতির হেতু, যাহা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মন আত্মাতে যাইয়া চেষ্টা করিতে করিতে মনে স্মরণীয় বস্তুর ক্রমে স্মরণ হয়, যেমন দুগ্ধ মনে হইবামাত্র দুগ্ধের রূপ গুণ আস্বাদন একেবারে মনে হয় না, যুগপৎ উৎপত্তি হয় না। যদি সকল

বস্তুর চিহ্ন একেবারে দেখা যাইত তাহা হইলে স্মরণেরও যুগপৎ উৎপত্তি হইত। আবার অধিক আত্মকর্ম্ম করিতে করিতে যখন সমস্তই একেবারে দেখা গেল তখন যুগপৎ উৎপত্তি ও অযুগপৎ উৎপত্তি কিছুই নাই অর্থাৎ আত্মার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, যুগপৎ উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি কিছুই নাই, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী; ব্রহ্মের এক অণুর মধ্যে পঞ্চতত্ত্ব বর্ত্তমান। ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকার নাম দুঃখ। যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা নাই তাহার সুখ দুঃখ নাই, কারণ সুখ দুঃখ মনের। আত্মা সর্ব্বব্যাপী অনন্ত জীবরূপে রহিয়াছেন, এই প্রকারে জীব স্বরূপ শিব (আত্মা) বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছেন, তাই তিনি বিশ্বেশ্বর। চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্ম শূন্যরূপে রহিয়াছেন। পদার্থ মাত্রই পঞ্চতত্ত্বে গঠিত এবং তত্ত্ব মাত্রেই জীব আছেন। নির্জীব পদার্থের জীব সকল যোগিদিগের বোধগম্য। এই নিমিত্ত যোগীরা (অর্থাৎ যাঁহাদের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে; যুক্ততম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন) ধ্যান করেন না, কারণ তাঁহাদের ধ্যান ধ্যাতা ও ধ্যেয় সমস্তই এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দেখিতেছেন। তাঁহার কোন বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর না হইলেও জ্ঞানের দ্বারা তাহা জানিবার কোন বাধা নাই।

মনোযোগ পূর্ব্বক ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়া, নতুবা ক্রিয়া নহে। তেমনি মনোযোগ পূর্ব্বক সংসারে থাকিলেই সংসারে থাকা, নচেৎ সংসারে থাকিয়াও নাই। অর্থাৎ যতক্ষণ মন বা ইচ্ছা বর্ত্তমান ততক্ষণই সংসার, যখন মন বা ইচ্ছা নাই তখন সংসারও নাই। মন বা ইচ্ছা না থাকিলে নিয়ম ও কর্ম্মও নাই, অতএব ধারণা ধ্যান ও সমাধিও নাই। স্মরণীয় বস্তু অনেক সময় স্মরণ করিতে না পারায় মন ঐ স্মরণীয় বস্তুতে প্রবেশ করিতে করিতে যখন মনের মুমূর্ষু অবস্থা হয় অর্থাৎ মনের উৎসাহহীনাবস্থায় বা নিবৃত্তি অবস্থায় যে স্মরণ হয় তাহার নাম প্রণিধান। আবার যে বস্তু মনে নাই, তাহার চিহ্নের চিন্তা অর্থাৎ সেই বস্তু কেমন, কি গুণসম্পন্ন ইত্যাদি স্মরণের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে মনের আটকাইয়া থাকার নাম নিবন্ধ। এইরূপ স্মরণীয় বস্তু একবার মনে উদয় হইল; যাহাতে ঐ বস্তু উত্তমরূপে মনে থাকে তাহার জন্য উহাতে বারংবার মন দেওয়ার নাম অভ্যাস। ইহা আত্মার কর্ম্ম হইতেছে, এইজন্য স্মরণের হেতু আত্মা, কারণ আত্মা না থাকিলে কিছুই হইত না। কিন্তু যখন স্মরণের চিহ্নানুসন্ধান করিতে হইতেছে তখন স্মরণের সর্ব্বদা বিদ্যমানতার অভাব হইতেছে, আবার বিনা চিহ্নে স্মরণ হয় না, কারণ স্মরণের আশ্রয় চিহ্ন

হইতেছে। স্মরণীয় বস্তু বা তাহার চিহ্ন না থাকিলে চিন্তা হইতেই পারে না। এই প্রকারে একবার স্মরণকে নিত্য আবার অনিত্য বলায় আত্মাকেও নিত্য ও অনিত্য বলা হইল। কিন্তু তাহা নহে কারণ বুদ্ধি ও পরাবুদ্ধি দ্বারা আত্মা পরমাত্মাতে লীন হইয়া স্থির আছেন, উহার স্মরণে দুই বস্তুর অবস্থিতি, অতএব স্মরণ বুদ্ধি দ্বারা হইতেছে এইজন্য বুদ্ধিই স্মরণের হেতু হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্মরণ বুদ্ধি কিছুই নাই। আবার যখন ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন মন ঐ ক্রিয়ার পর অবস্থাকে স্মরণ করিতে লাগিল এই নিমিত্ত স্মরণে দুই হইল।

(পূর্ব্বকৃত ফলের অনুবন্ধই এই শরীর উৎপত্তির কারণ। এই শরীরের প্রারম্ভেই পূর্ব্ব শরীরের প্রবৃত্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাঁদে, তাকায়, ইত্যাদি। এবং ঐ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে ইহ জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মও হইয়া থাকে; আর ঐ সকল ভোগের নিমিত্ত আত্মা এই শরীরে অবস্থান করিয়া থাকেন কিন্তু স্বতন্ত্র ব্রহ্ম যেমন নির্লিপ্ত তেমনিই থাকেন। কেবল কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বুদবুদাকারে আত্মা এই শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন যাহাকে লোকে আমি আমি বলে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম সকল আত্মায় বিশেষরূপে আটকাইয়া থাকায় এই অনাবশ্যক ভোগ হইয়া থাকে) কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন কর্ম্মের ক্ষয় দেখা যাইতেছে তখন কর্ম্ম নিমিত্ত শরীরের উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব? কর্ম্ম নিমিত্ত আত্মার সহিত শরীরের উৎপত্তি ও সুখ দুঃখ। কিন্তু কর্ম্ম ক্ষয় হইলে আত্মা না থাকায় দেহ থাকে না; তখন আত্মা ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই বৈরাগ্য হয় এবং বৈরাগ্য হইলেই আসক্তি পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যের সহিত কর্ম্ম আর হয় না। এইরূপে কর্ম্মক্ষয় হওয়ায় পুরুষ নিষ্কর্ম্মা হয়; এই নিষ্কর্ম্মাবস্থায় কর্ম্মের হেতু না থাকায় পুনরায় শরীরের উৎপত্তি হয় না। তখন ঐ অকর্ম্মাবস্থাই হেতু হয়। উত্তম পুরুষের গুণ কূটস্থ, কূটস্থের গুণ আত্মা, আত্মার গুণ মন এবং মনের গুণ ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারায় সমস্ত ভূতের কার্য্য হইয়া থাকে এবং কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকলেরই ব্রহ্মে লয় হয়, তাই তখন আর দেহ থাকে না অর্থাৎ দেহবোধ থাকে না। তখন শরীর ও দর্শন উভয়ই নাই। পুনরায় ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় ক্রমে ক্রমে দেহবোধ জাগিয়া ওঠে। অতএব যাহার যেমন ক্রিয়া তাহার সেই প্রকার দেখাশুনা শেষে লয় অর্থাৎ যে যেমন উত্তম ক্রিয়া করিবে তাহার তেমনি দেখা শুনা ও

শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অনাসক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারা যায়, কারণ তখন পঞ্চভূতে মন না থাকায় কোন কর্ম্মের উপেক্ষা থাকে না। তখন ইন্দ্রিয় সকল মনে, মন আত্মায় এবং আত্মা ব্রহ্মে মিলিয়া যায়। আবার যখন ব্রহ্ম আত্মায়, আত্মা মনে, মন ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয় পঞ্চতত্ত্বে মিলিতেছে তখন দেহবোধ সহ বিষয় সকল জাগিয়া উঠিতেছে অর্থাৎ একই ব্রহ্ম কখনও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আবার কখনও পঞ্চতত্ত্বে শরীরে থাকিতেছেন। ইহাই জীবন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার মিলনই জীবন এবং তাহার বিপরীত অদৃশ্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাই ব্রহ্ম। অতএব ক্রিয়া না করিলে যখন ঐ অবস্থার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার উৎপত্তি হয় না, যাহা একমাত্র কাম্য, তখন সকলেরই ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে সর্ব্বদাই ক্রিয়া সাধনে রত রহিয়াছে আর যে বুদ্ধি সর্ব্বদাই ব্রহ্মে রহিয়াছে, সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার অন্যথা হয় না। আবার যে ব্যক্তি ক্রিয়া পাইয়াও ক্রিয়া করা কষ্টকর বিবেচনায় ছাড়িয়া দেয়, সে সাধন ত্যাগ নিমিত্ত মহাদুঃখে থাকে ; ক্রিয়া না করিলেই দুঃখ এবং ক্রিয়া করিলেই সুখ হয় ইহা নিশ্চিত। বুদ্ধি ও পরাবুদ্ধিকে সম্যক্ প্রকারে জানিলেই মোক্ষ, ইহাই আগম। মহর্ষিগণ উপদেশ দ্বারায় অর্থাৎ কুটস্থ দ্বারায় স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি অন্য দিকে মন দিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে মন রহিয়াছে তাহাদের মিথ্যা দৃষ্টি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় শরীরের সৃষ্টি ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

কোন কিছু দেখার নাম প্রবৃত্তি। এই যে কৃষ্ণকে দেখিতেছ তাহাও প্রবৃত্তি এবং না দেখাই নিবৃত্তি। যাহা চলে তাহাই সংসার। এই চলাটি চলিয়া আসিতেছে এই নিমিত্ত অনাদি। সেই চলার দিকে প্রবৃত্তি যাওয়ায় উহাকে সত্য বলিয়া মনে হয়। এই মিথ্যাকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারায় অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় অর্থাৎ আর চলা না থাকায় নিবৃত্তি। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকাকেই ধর্ম্ম বলে এবং এই আটকাইয়া থাকায় নিবৃত্তি এই নিমিত্ত কোন দোষ নাই, কিন্তু আটকাইয়া না থাকিলেই যে প্রবৃত্তি তাহাই দোষ। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া না থাকায় দেহবোধ জাগিয়া ওঠে এবং দেহবোধ জাগিলেই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাই দোষ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকায় একভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাব। যিনি ঐ অবস্থায় সর্ব্বদা থাকেন তাঁহারই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা, কারণ ঐ অবস্থায় উপরোক্ত

রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি সব এক হইয়া যায়, এইজন্য ক্রিয়ার পর অবস্থা সবের নাশক হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মাতে থাকায় মোহ ইত্যাদির নিবৃত্তি হওয়ায় সবকিছুরই অনুৎপত্তি তখন এক ভাবোৎপত্তি হওয়ায় অন্যদিকে মন যায় না অতএব অন্য দিকে মন না যাওয়ায় আর জন্ম হয় না। জন্ম অর্থাৎ অন্যদিকে মন দিয়া তাহাতে স্থিতি। ঐ স্থিতি অর্থাৎ এই জন্মে পঞ্চতত্ত্বে প্রকৃষ্টরূপে লাগিয়া থাকাই প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিতে থাকাই ক্লেশ। ক্রিয়ার পর অবস্থা অব্যক্ত, এই অব্যক্ত হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় সমস্ত ব্যক্ত হইতেছে। দেখার দ্বারায় দেখা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারায় সমস্ত দেখা যাইতেছে কিন্তু সেই ব্রহ্মে থাকিলে কিছুই দেখা যায় না, যেমন মূর্ত্তি দ্বারায় মূর্ত্তি দেখা যায় না, যে মূর্ত্তি দেখিতেছ সেই মূর্ত্তিই যদি নিজে হইলে তবে দেখিবে কে? ক্রিয়া করার পূর্ব্বে অসৎ তাহার পর ক্রিয়া করিয়া সৎ অর্থাৎ কূটস্থ দেখা। ফলাকাঙ্খা রহিত কর্ম্ম করিয়া অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা কিছু হয় তাহা হইয়াও না হওয়ার মধ্যে। কর্ম্মফল সকল স্বভাব দ্বারায় হইতেছে, ঈশ্বর হেতু নহেন। উত্তমপুরুষের ফলাকাঙ্খার সহিত কোন কর্ম্ম নাই, আত্মা গুণবিশিষ্ট (সত্ত্ব রজ তম) হইয়া শরীরে থাকায় মিথ্যা আমি সমস্ত ভোগ করিতেছে; আর ঈশ্বর ভিতর ভিতর নির্লিপ্ত রহিয়াছেন যেমন আত্মার পর পরমাত্মা কূটস্থ ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নাম ঈশ্বরত্ব; আত্মা ও ঈশ্বর এক কেবল গুণভেদ মাত্র। আত্মা ছাড়া অন্য দিকে মন দেওয়ার নাম অধর্ম্ম, ক্রিয়া করাই ধর্ম্ম এবং ক্রিয়া করিয়া ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ক্রিয়া করিয়া নেশাবৃদ্ধি করার নাম ধর্ম্ম সঞ্চয়। এই প্রকারে ক্রিয়া করিয়া এক হইয়া গেলেই সমাধি অর্থাৎ সমানরূপে ব্রহ্মেতে থাকা। তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যাওয়ায় আর দুই নাই। যেখানে দুই সেখানে ঈশ্বর নাই, অতএব ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমাতীত। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চক্ষে দেখা, দুই না থাকিলে কে কাহাকে দেখিবে? যাহা মনে করা তাহাই অনুমান, সেখানেও দুই। যাহা হঠাৎ উপস্থিত হয় তাহাই আগম, ইহাতেও দুই বর্ত্তমান। যেখানে দুই সেখানে ঈশ্বর নাই, এই নিমিত্ত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমাতীত। ঈশ্বরকে সাধন করা যায় কিন্তু উপসাধন করা যায় না, কারণ পৃথিবীর অণুর বল অপেক্ষা ব্রহ্মাণুর বল লক্ষগুণ অধিক। একলক্ষ ব্রহ্মাণুতে একটি মৃত্তিকার অণু, দশ হাজার ব্রহ্মাণুতে একটি জলের অণু; এইজন্য মৃত্তিকা হইতে জলের বল অধিক। এক হাজার ব্রহ্মাণুতে একটি

তেজের অণু, একশত ব্রহ্মাণুতে একটি বায়ুর অণু এবং দশ ব্রহ্মাণুতে একটি শূন্যের অণু। এই নিমিত্ত জল অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু এবং বায়ু অপেক্ষা শূন্যের বল অধিক। সেই লক্ষ ব্রহ্মাণু যখন একটির মধ্যে আসিল তখন একটির মধ্যে লক্ষগুণ শক্তি হইল। যোগিগণ এই প্রকারে ব্রহ্মাণুর মধ্যে থাকায় তাঁহাদের পঞ্চতত্ত্বের ও কালের উপর আধিপত্য হয় এবং সর্ব্বশক্তিমান হন। তিনি তখন ব্রহ্মে বিচরণ করায় ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মাইলেই ব্রাহ্মণ হইবেন তাহা নহে। যদিও সবকিছু ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি হইতেছে এই নিমিত্ত সকলকেই ব্রাহ্মণ বলা চলে, কিন্তু ব্রহ্মে না থাকিয়া শরীররূপ গৃহে থাকায় সে গৃহস্থ। যেমন গরম বস্তুতে যে প্রকার মিথ্যা অগ্নি, ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইয়াও সেই প্রকার সকলেই মিথ্যা ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুসারে মাতৃগর্ভ হইতে যখন ভূমিষ্ঠ হইল, তখন সকলেই গৃহস্থ কারণ ঐ সময়ে আত্মা প্রকৃষ্টরূপে শরীররূপ গৃহতে আসিলেন। আবার ক্রিয়া করিতে করিতে যখন দেহবোধ চলিয়া গেল তখন শরীররূপ গৃহে না থাকায় ব্রাহ্মণ; তখন আর পুনর্বার শরীর ধারণ হয় না। যাঁহার সুকৃতি আছে তিনিই ক্রিয়া পাইয়া এবং ক্রিয়া করিয়া সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্ম দেখেন, তাঁহাকেই ঋষি বলা হয়। ঋষি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা কূটস্থে আছেন। যিনি ব্রহ্মকে জানেন না তাঁহাকে কে কোথায় ঋষি বলিয়া থাকে? এই প্রকারের ঋষি কূটস্থকে দেখিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন, অন্ধকে নাচ দেখাইবার জন্য কে কোথায় নাচিয়া থাকে? সেই প্রকার যাহার সুকৃতি, প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই তাহাকে কে উপদেশ দিয়া থাকে? ক্রিয়ার পর অবস্থার নিমিত্ত উপদেশের প্রয়োজন। মন্ত্র অর্থাৎ যে মনকে ত্রাণ করে অর্থাৎ যাহার দ্বারায় চঞ্চল মন স্থির হয় অর্থাৎ ক্রিয়া। স্থির হইলেই ত্রাণ আর স্থির হইয়া যে স্থিরত্বে থাকে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলে; এই কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। যিনি এই কর্ম্মকে কর্ম্ম বলেন, তাঁহার পত্নী না থাকায় তিনি গৃহস্থ নহেন অর্থাৎ পত্নী-স্বরূপা প্রকৃতিতে না থাকায় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি না থাকায় তিনি গৃহস্থ নহেন; তাই গৃহস্থের নাম জায়মান অর্থাৎ যে জন্মিতেছে এরূপ অর্থাৎ চলায়মান। এই গৃহস্থই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় কূটস্থে থাকিলেই ঋষি হন। আর যাঁহারা অন্য দিকে মন দেন না, সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অমর হন, আবার অমর হইব তাহাও মনে হয় না, গুহায় অর্থাৎ ব্রহ্মযোনিতে থাকিতে থাকিতে সবকিছু ত্যাগ হওয়ায় 'আমিই সেই পুরুষ' এইরূপ অনুভব হওয়ায় সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় এবং ইহার পরে আর

কিছু নাই বুঝিতে পারেন তিনি মনীষী। অতএব প্রথম তপস্যা কূটস্থে থাকা, দ্বিতীয় তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যকুলে বাস অর্থাৎ ব্রহ্মতে থাকিয়া কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপ আত্মাতে থাকা এবং তৃতীয় তপস্যা আত্মাকে কূটস্থে রাখিয়া আটকাইয়া থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। এই সকল কর্ম্মে ভাল লোক হয়। যিনি এই নিষ্কাম কর্ম্ম করেন অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম করেন তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না অর্থাৎ বিয়োগ হয় না অর্থাৎ ব্রহ্মে যোগ হইতে অন্যদিকে যায় না; তিনি তখন সমান ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া লীন হন অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান।

অন্যদিকে মন দেওয়ায় মনে বিষয়ের উৎপত্তি হয়, ইহার নাম অহঙ্কার অর্থাৎ আমি বুদ্ধি হওয়াতেই বিষয়ে মন যায় এবং এই অহঙ্কারই আত্মাতে থাকিতে দেয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মাতে থাকিলে বিষয়ে নাই, আবার বিষয়ে থাকিলে আত্মাতে নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অহঙ্কার, জন্ম, প্রবৃত্তি প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়, এই সকলের নাশে মোক্ষ হয়, ইহাই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সকল মিথ্যা সঙ্কল্প যখন না থাকে তখন আত্মায় মন থাকে, এই অবস্থার নাম মুক্তাবস্থা। ইহাই সকলের কাম্য। পৃথিবীর বস্তু দেখিতে উত্তম কিন্তু ভিতরে বিষের তুল্য; উপরে উপরে দেখিলেই মন অকৃষ্ট করে, আর ভিতর দেখিলেই ত্যাগ হয়, ইহাই মায়া, ইহা চঞ্চলতার প্রকাশ। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত অর্থাৎ অন্য দিকে মন। এই অন্য দিকে মন দিলেই অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলেই অযুক্ত। তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় বিষয় সকল মনে আবৃত হওয়ায় ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুপলব্ধি। বিষয়ে মন যাওয়ায় ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হয়, এই দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মন ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুভব করিতে পারে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন মনে থাকায় ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যাইতে না পারায় গন্ধাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। ক্রিয়ার পর অবস্থা আর প্রলয় দুইই এক। তিন গুণের অতীত এই ক্রিয়ার পর অবস্থা। যখন ভাব হইতেছে তখন দুই হইল। আবার প্রকৃষ্ট প্রকারে যখন অভাব হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইল তখন নিরবয়ব, যখন নিরবয়ব তখন কিছুই নাই, তখন ব্রহ্মে লীন হওয়ায় নিবৃত্তি হইল অর্থাৎ সকল প্রকার বৃত্তি শূন্য হইল। তাই সকল বস্তুর লয় কল্পনা হইতে পারে না, কারণ তখন তুমিই লয় হইয়া গিয়াছ, অন্যান্য বস্তু যেমন তেমনই রহিয়াছে। নিরবয়ব যখন হইল তখন সমস্ত

পদার্থের পরমাণু বিশেষরূপে বিভাগ হইয়া ব্রহ্মে মিশিয়া গেল অর্থাৎ পৃথিবীর অণু জলে, জলের অণু তেজে, তেজের অণু বায়ুতে, বায়ুর অণু শূন্যে, শূন্যের অণু ব্রহ্মে; এই প্রকারে যাহা বিস্তার হইয়াছিল তাহা সঙ্কুচিত হইল, পরে যেখানে ব্রহ্মাণুও নাই সেইখানে আটকাইয়া থাকিল। ইহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। আকাশ অতিশয় সূক্ষ্ম হেতু যেমন অনুভব করিতে পারা যায় না অথচ কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, তেমনি আকাশাপেক্ষা সূক্ষ্ম নিরবয়ব ব্রহ্মাণু অনুভব করিতে পারা যায় না, অথচ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা কিছুই নহে, এই কিছুই নহে অবস্থাই ব্রহ্ম, উহাতেই সকলকে লয় হইতে হইবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন মূর্ত্তি দেখা যায় না, উহা সর্ব্বগত। মন যখন কোন বস্তুতে তখন আবরণ, আর যখন কোন বস্তুতে আটকাইয়া নাই তখন নিরাবরণ। ক্রিয়ার পর অবস্থার আকাশ সর্ব্বগত ও নিরাবরণ। তাই ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই হিতকারী নহে। তিনিই অভয়পদ, বিভু, পবিত্র ও মহান্ হইতেছেন। তিনিই সকলের আদি, নিধি এবং কূটস্থ স্বরূপ বিশাল নেত্র এবং চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র হইতেছেন। এই ক্রিয়ার পরাবস্থা হঠাৎই আসে, কিন্তু যখন আসে সেই অবস্থায় যত দীর্ঘ সময় থাকা যায় তাহাই ভাল বা সেই অবস্থায় থাকা উচিত। এই অবস্থাকে ভঙ্গ করা আত্মহত্যার সমান।

* * * *

যোগিরাজকে কি বৈষ্ণব বলা যায়? তিনি কি শৈব, শাক্ত, সৌর অথবা গাণপত্য? তিনি কিছুই নহেন, আবার তিনি সবই। এ বিষয়ে তিনি নিজেই তাঁহার দিনলিপিতে প্রমাণ রাখিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার কৃষ্ণ বিষ্ণু দেখিয়াছেন, সকল প্রকার শিব মহাদেব দেখিয়াছেন, সকল প্রকার কালী সহ নানান দেবী দেখিয়াছেন, সৌরমতে নানাপ্রকার আত্মসূর্য্য দেখিয়াছেন, গণপতি দেখিয়াছেন। তিনি কোন বিশেষ মত বা পথের সাধক ছিলেন না, সকল মতের বা পথের মিলন তাঁহাতে ঘটিয়াছিল। তিনিই একাধারে পরম বৈষ্ণব, একাধারে পরম শৈব, পরম শাক্ত, পরম সৌর এবং পরম গাণপত্য। এ বিষয়ে তাঁহার যাহা কিছু দর্শন হইয়াছে এবং দিনলিপিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে দেওয়া হইল :—

১। **"ইহাঁ কালীজি বিরাজমান—খালি কালী নহি সবকোই স্থানে কুছ নাহি আউর সব কুছ—আহা ক্যা মজা হয়।"**—এইখানে কালী বিরাজমান, কেবল কালী নহে পরন্তু সকলেই অর্থাৎ কিছুই নহে আবার সব কিছুই। এই দর্শনে ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন—আহা কি মজা।

২। **"লোল জিহ্বা মালুম হুয়া কালীকা। ইহ জিহ্বা জব তালুমুলমে লপট জাতা হ্যায়। জিভ আউর উঠা আউর ইহ মালুম হোতা হ্যায় কি নিদ ছোড় দেনা। আউর বড়া মজা মালুম হুয়া আউর বাসুলিকা আওয়াজ আউর সাফ বজনে লগা।"**—কালীর লালসাযুক্ত লকলকে জিহ্বা বুঝিলাম। আমার এই বর্ত্তমান জিহ্বা যখন তালুমূলে আটকাইয়া গেল তখনই ইহা বুঝিলাম। ইহারই প্রতীক স্বরূপ মা কালীর জিহ্বা বহির্ম্মুখী। জিহ্বা আরও উপরে উঠিল এবং ইহা বুঝিলাম যে এই অবস্থায় নিদ্রা ছাড়িয়া দিব। তখন খুবই মজা হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি স্বরূপ প্রাণায়ামের সময় বাঁশির আওয়াজ আরও পরিষ্কার বাজিতে লাগিল।

৩। **"মহাদেব ও কালী দরশন হুয়া—আজ থোড়া সফা ব্রহ্ম দেখা।"** —মহাদেব ও কালী দর্শন হইল, আজ কিছুটা পরিষ্কার ব্রহ্ম দেখিলাম।

৪। **"হাড়কা কালী দেখা, ফটিককা আউর জ্যোতিকা কালী দেখা।"** —হাড়ের কালী দেখিলাম। ফটিক এবং জ্যোতির কালী দেখিলাম।

৫। **"সূর্য্যহি কালীকা রূপ।"**—আত্মসূর্য্যই কালীর রূপ।

৬। **"নীলবর্ণ কালীজিকা শিরকা উপর দেখা।"**—মস্তকের উপরে সহস্রারে নীলবর্ণ কালী দেখিলাম।

৭। সিংহের উপর এক দেবী মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন— **"আধার চক্রমে জো দেবী শ্বেতবর্ণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান সিংহবাহিনিকো দেখা—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি।"**—শ্বেতবর্ণ শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা সিংহবাহিনী দেবীকে আধার চক্রে অর্থাৎ মূলাধার চক্রে দেখিলাম। তিনিই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপা জগদ্ধাত্রী। এই দেহরূপ জগতকে তিনিই ধারণ করিয়া আছেন।

৮। **"কালীকা চরণ দেখা।"**—কালীর চরণ দেখিলাম। **"কালীর নাম অর্থাৎ সূর্ষের ধ্যান ও প্রাণায়াম কালীর পা এক ঐ পা দুই হইয়াছে বাঁ পা ও ডান পা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা।"**—আত্মসূর্য্যের ধ্যানই কালীর নাম। সুষুম্নান্তর্গত প্রাণায়ামই কালীর পা, উহা এক, কিন্তু ঐ এক পা দুই হইয়াছে অর্থাৎ চঞ্চল হইয়া ইড়া পিঙ্গলায় গতি হওয়ায় দুই পা হইয়াছে। ইড়া অর্থাৎ চন্দ্র এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য। ইড়া অর্থাৎ

বাঁ পা এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ ডান পা। মায়ের এই ইড়া ও পিঙ্গলারূপী চরণ দুইটিকে ধরিলেই মাকে পাওয়া যায়। হাড়-মাংসের স্থুল চরণদ্বয়ের চলিবার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। ইড়া পিঙ্গলারূপী চরণদ্বয় আছে বলিয়াই স্থুল চরণের অস্তিত্ব। চরণ অর্থে যাহা বিচরণ করে। ইড়া পিঙ্গলায় শ্বাস বিচরণ করে বলিয়াই দেহের অস্তিত্ব। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন— **"চরণ স্থানে দোনো শ্বাসা যয়সা চরণ এ স্থান ছোড়কে জাতা হয় ওএসাহি শক্তি শ্বাসাকা।"**—চরণ অর্থাৎ দুই শ্বাস, চরণ যেমন এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে গমন করে, শ্বাসও তেমনি এই দেহকে ছাড়িয়া নূতন দেহে গমন করে।

৯। কপালের উপর একটি সূর্য্য আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন— **"সূর্য্য ওহি কালী-সূর্য্যকা রূপ আউর হমারা রূপ এক হয়।"**—এই যে আত্মসূর্য্য দেখিতেছি উহাই কালী। সেই আত্মসূর্য্যের রূপ এবং আমার রূপ একই অর্থাৎ যাহা কালীর রূপ তাহাই আমার রূপ, অভিন্ন। কয়েক দিন পর পুনরায় লিখিয়াছেন—**"সূর্য্যই কালী সোই কালী হম সোই হম।"** অর্থাৎ যাহা আত্মসূর্য্য তাহাই কালী, তাহা আমিই, সেই কালী আমিই। ইহার ঠিক দুই দিন পর লিখিয়াছেন—**"সূর্য্যই ব্রহ্মরূপ হয় এবং সূর্য্যই জগত আধার হয় ওহি অটল ছত্র—ওহি সূর্য্য ফির হম নিরাকার ব্রহ্ম হোতে হয়—অব শ্বাসাকা চলনা ও ন চলনা মালুম ন হোয়—বড়া মজা।"**—এই আত্মসূর্য্য যাহা দেখিতেছি তাহাই ব্রহ্মরূপ এবং ইহাই জগতের আধার স্থল। সবকিছুই ইহা হইতে উৎপত্তি এবং ইহাতেই লয় হয়। ইহাই সবকিছুর দৃঢ় বা অচঞ্চল আচ্ছাদন। এই আত্মসূর্য্যরূপী কালীদর্শনে আগম নিগমরূপী শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে কি চলিতেছে না কিছুই বোঝা যায় না অর্থাৎ কেবল-কুম্ভক অবস্থা। এই অবস্থায় বড়ই মজা অর্থাৎ আনন্দ। সেই আত্মসূর্য্যই আমি নিরাকার ব্রহ্ম।

১০। **"কভি কভি নিলা যোকি ঠাণ্ডি কালীকা রঙ্গ হেয় রটন্তি নাম উনকা এসা ব্যাপ্ত হুয়া কি জব্ প্রণামকো বটতে হেয় তব্বা বিচ্ বিচ্মে ঐহি রঙ্গকা সূর্য্য নজড় পড়াতা হেয়, কালীত এক হেয় লেকিন রঙ্গমে পরভেদ হেয়।"**—কখনও কখনও শান্ত নীল বর্ণের কালী দেখি যাহাকে রটন্তী বলা হয়। যখন প্রাণায়াম করিতে বসি তখন সেই কালী এমন হন যে কখনও কখনও ঐ রঙের আত্মসূর্য্য দেখা যায়। কালী একই কিন্তু বিভিন্ন রঙের দেখায় বলিয়া পৃথক মনে হয়।

১১। **"শক্তি ও মহাদেবকা লিঙ্গ দেখা।"**—মহামায়ার শক্তি ও মহাদেবের লিঙ্গ দেখিলাম।

১২। **"কালিকা খড়গ দেখা।"**—কালীর খড়্গ দেখিলাম।

১৩। **"শক্তিরূপ ভগবতী দেখা।"**—শক্তিরূপা ভগবতী দুর্গা দেখিলাম।

১৪। **"ছিন্নমস্তা রূপ দেখা।"**—ছিন্নমস্তা রূপ দেখিলাম।

১৫। **"আদ্যাশক্তি দেখা।"**—আদ্যাশক্তি অর্থাৎ সেই মহামায়া সনাতনী মহাদুর্গাকে দেখিলাম।

১৬। **"আজ সোনেকা কালীসে ভেট হুয়া।"**—আজ সোনার কালীর সঙ্গে দেখা হইল।

১৭। **"সূর্য্যকে ঝালর য়ানে কিরীট। সূর্য্যসে কালীকা খড়গ হয়। সূর্য্যই মালিক। ওহি উত্তমরূপ সূর্য্যকা হয়।"**—সেই আত্মসূর্য্যের ঝালর অর্থাৎ কিরীট। সেই আত্মসূর্য্য হইতেই কালীর খড়্গ হয়, সেই সূর্য্যই মালিক অর্থাৎ প্রধান। উহাই সেই আত্মসূর্য্যের উত্তমরূপ।

১৮। **"দুই চাঁদ—মহাদেব কালী দর্শন হুয়া।"**- দুইটি চাঁদ অর্থাৎ মহাদেব ও কালী দর্শন হইল।

১৯। একটি শ্যামা মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"শ্যামাসুন্দরী রূপ। কালীরূপ দেখা বহুত দেরতক।"**—এই প্রকার শ্যামাসুন্দরী রূপ দেখিলাম। দীর্ঘ সময় কালীরূপ দেখিলাম। ১৮৭৩ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট কালীর গলার মালা আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"মহাকাল—এহি আপনা রূপ—এহি ঘটাকাশ—এহি কালীজিকে মালা গলেমে—ইহ মালা গলজায় য়ানে নহি রহে তো সবকে উপর অজর অমর ঘর হয়—ওঁহা জানেসে স্থির ঘরকা থ মিলতা হয়—উসি স্থিরমে আজ দো মিনিট রহে—সবেরে, হুঁই হমেশা রহনা চাহি। হমহি সূর্য্য হয় ফির উলটকে সূর্য্য হমহি—হমহি নিরাকার ব্রহ্ম।"**—ইহাই মহাকাল, ইহাই নিজের রূপ, ইহাই ঘটাকাশ, আবার ইহাই কালীর গলার মালা। এই মালা যখন গলিয়া যায় অর্থাৎ যখন থাকে না, তাহাই সবার উপর অজর অমর ঘর ; সেইখানে পৌছাইলে স্থির ঘরের ঠাঁই পাওয়া যায়, সেই স্থিরঘরে আজ সকালে দুই মিনিট অবস্থান করিলাম। সেই স্থির ঘরে সর্ব্বদার জন্য থাকা চাই। আমিই আত্মসূর্য্য আবার উল্টাইলে ঐ আত্মসূর্য্যই আমি, আমিই নিরাকার ব্রহ্ম।

২০। **"ইড়া পিঙ্গলা ষট্‌চক্র যোকী সুষুম্নামে মিলকে পত্নুকে রূপ সাফ মালুম হোতা হেয় উহিকে উপর সরস্বতী হেয় দেখা।"**—ইড়া পিঙ্গলা ও ষট্‌চক্র যাহা সুষুম্নাতে মিলিয়া পায়ের রূপ হইল তাহা পরিষ্কার বুঝিলাম, উহার উপর সরস্বতী আছেন দেখিলাম।

২১। **"সূর্য্যকে ভিতর পদ্মকা বন বীণাপাণিকে দেখা।"**—আত্মসূর্য্যের ভিতর যে পদ্মবন অর্থাৎ ষট্‌চক্রের অবস্থান সেখানে বীণাপাণিকে দেখিলাম।

২২। **"বিদ্যুৎপ্রভা পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ বাগদেবী দেখা"**—বিদ্যুতের মত প্রভা বিশিষ্ট পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ বাগ্‌দেবী দেখিলাম।

২৩। হাতির পিঠে সাবিত্রী ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"সরস্বতী বিনায়ক অর্থাৎ সাবিত্রী সহ ব্রহ্মা হস্তিবাহন দেখা।"**—সরস্বতী ও গণেশ অর্থাৎ ব্রহ্মা ও তাঁহার পত্নী সাবিত্রী সহ হস্তিবাহন দেখিলাম।

২৪। **"গণেশ কূটস্থ অক্ষরকে ভিতর য়ানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেখা।"**—কূটস্থ অক্ষরের ভিতর গণেশ অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেখিলাম।

২৫। **"অব ধ্বনি মুনে রাধাজিকা দর্শন ভয়া।"**—এখন ওঁকার ধ্বনির মধ্যে রাধাজির দর্শন হইল।

২৬। **"সূর্য্যকে ভিতর গণেশকা মূর্ত্তি সাফ দেখা।"**—আত্মসূর্য্যের ভিতর গণেশের মূর্ত্তি পরিষ্কার দেখিলাম।

২৭। **"বইশুণ্ডকা গণেশ নারায়ণসে নিকিলে দেখা।"**—শুঁড় ছাড়া গণেশ নারায়ণ হইতে বাহির হইলেন দেখিলাম।

২৮। সর্পবৎ কুলকুণ্ডলিনীর চিত্র আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"এহি কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা সয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টিনীং ভুজগাকার রূপিনিং—এয়সা দেখনেমে আতা হয়।"**—ইহাই কুলকুণ্ডলিনী, ইহা সর্পরূপে সাড়েতিন পাকে সয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন এই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় একটি ওঁকার ক্রিয়ার ছক্ অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"শরীরকে ঈশান কোনমে শয়ম্ভু কুণ্ডলিনী বেষ্টিত জ্বলন্ত গন্ধককা রংমশালকে মাফিক লেকন স্থির শ্বেতবর্ণ সর্পাকার দেখা।"**—শরীরের ঈশান কোনে সেই কুলকুণ্ডলিনী সর্পাকার রূপে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন যাহা জ্বলন্ত গন্ধকের রংমশালের মত দেখিতে, কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে স্থির ও শ্বেতবর্ণ।

২৯। ২২শে জানুয়ারি ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"**চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতি দোনো তরফ দেখা—বিশ্বনাথকা লিঙ্গ সুষুম্নারূপ বিচমে দেখা—তন্ত্রপ্রমাণং —যোনি ব্রহ্ম হৃদাকারং অন্তরাত্মনি চিন্তয়েৎ।**"—কূটস্থে দুই পাশে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি দেখিলাম, তাহার মাঝে সুষুম্নারূপ বিশ্বনাথের লিঙ্গ দেখিলাম। এ বিষয়ে তন্ত্রে প্রমাণ আছে যে উহাই সেই ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ সবকিছুর উৎপত্তিস্থল যাহা অন্তর্ম্মুখী ধ্যানে লাভ করা যায়। পুনরায় একটি দ্বিদলপদ্ম আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"**দ্বিদলপদ্ম কোটি চন্দ্রপ্রভা জসা দেখা।**"—দ্বিদলপদ্ম অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র যাহা কোটি কোটি চন্দ্রপ্রভা বিশিষ্ট দেখিলাম। ১২ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"**পাঁচ সূর্য্যকা উদয় সূর্য্যহি হয় শ্বেত ধ্বজা। সূর্য্য নারায়ণ মালিক—ওহি সূর্য্য মালিক—ওহি সহস্রাংশু হয়।**"—পাঁচ সূর্য্যের উদয় হইল, সেই আত্মসূর্য্যই শ্বেতধ্বজা। সেই আত্মসূর্য্যই নারায়ণ (সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ)। তিনিই মালিক এবং তিনিই সহস্র সূর্য্যের কিরণ বিশিষ্ট। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া সঞ্জয় বলিয়াছেন—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥[1]

সঞ্জয় অর্থে সম্যক্রূপে জয় হইলে যাঁহার প্রকাশ হয় অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি। সেই দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মনের সমীপে উক্ত হইল। দিবি শব্দে আকাশ। আকাশে যদি সহস্র সূর্য্যের প্রভা একসঙ্গে উদিত হয়, তাহা হইলে সেই মহাত্মার প্রভাব সদৃশী হইতে পারে। অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ রূপের কোন তুলনা হয় না, উহাই কূটস্থ ব্রহ্মের বৃহৎ রূপ। তাই বলিতেছেন যদি সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি একত্র মিলিত হয় তাহা হইলে ঐ মহান্ আত্মার মত হইতে পারে।[2]

---

(১) গীতা ১১।১২

(২) এই সূর্য্য এবং মহাশূন্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের নানান জায়গায় ঋষিরা নানাভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোন্ সূর্য্য এবং কোন্ মহাশূন্য সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তিকালে সকল পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ আকাশে উদীয়মান সূর্য্য এবং দৃশ্যমান এই আকাশকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যোগিরাজ বলিয়াছেন আকাশের এই সূর্য্যও অনিত্য, অতএব শাস্ত্রোক্ত ঐ সূর্য্য হইল আত্মসূর্য্য; যাহা নিত্য, শাশ্বত ও অবিনাশী। উহা কেবল যোগিগণই দেখিতে সক্ষম। গীতাতে অর্জ্জুনও ঐ আত্মসূর্য্যের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন আকাশের এই সূর্য্যের মত সহস্র সূর্য্য যদি একত্রে উদিত হয় তাহা হইলে

এই সহস্রাংশু দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥[১]

সেই মহান্ আত্মসূর্য্যের মত হইতে পারে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে গীতাতে এই সূর্য্যের কথা বলা হয় নাই, উহা আত্মসূর্য্য। এই ভাষ্য কেবল যোগিরাজই করিয়াছেন কারণ এই উপলব্ধি তাঁহার হইয়াছিল, আবার শুধু উপলব্ধিই নহে তিনি উহা বার বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যাহা অর্জ্জুনেরও হইয়াছিল।

আবার শাস্ত্রোক্ত মহাশূন্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সকল পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ দৃশ্যমান এই শূন্যকেই বলিয়াছেন বা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বহু উর্দ্ধে যে শূন্য তাহাকেই বলিয়াছেন। কিন্তু যোগিরাজ বলিয়াছেন এই শূন্য পঞ্চভূতের শেষ ভূত যাহা স্থূল থেকে সূক্ষ্ম হইতে হইতে শেষ সূক্ষ্ম মহাভূত। অতএব এই শূন্যও স্থূল হওয়ায় মহাশূন্য নহে। এই শূন্যও অনিত্য; তবে ইহা সীমাহীন হওয়ায় পরিমাপ করা যায় না। এই শূন্য শেষ মহাভূত হওয়ায় ইহারও গুণ আছে, ইহা গুণাতীত নহে। তাই তিনি মহাশূন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন এই শূন্যের ভিতরে যে শূন্য অর্থাৎ যে শূন্যের অস্তিত্বে এই শূন্যের অস্তিত্ব, যিনি স্বচ্ছ অবিনাশী ও নির্গুণ, যাহা হইতে এই শূন্যের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় তিনিই মহাশূন্য এবং সেই মহাশূন্যই ব্রহ্ম। সেই মহাশূন্য এই শূন্যের অভ্যন্তরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। সেই মহাশূন্যের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষদর্শন তাঁহার বার বার হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এই ভাষ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে তাঁহার উপলব্ধির দিনলিপিগুলি দেখিলে বোঝা যায় তিনি সাধন করিয়া সেই স্বচ্ছ অবিনাশী নির্গুণ মহাশূন্যরূপী পরব্রহ্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন, লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই বেদান্ত প্রতিপাদ্য সাধনার শেষ বা চূড়ান্ত অবস্থা। সেই মহাশূন্যরূপী পরব্রহ্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইলে আর দুই বলিবার কেহ থাকে না, উহাই অদ্বৈত অবস্থা। আর তাহার পূর্ব্বে সকলেরই দ্বৈত অবস্থা। এই আত্মসূর্য্য ও মহাশূন্যকে জানাই গীতা ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য জ্ঞান বা চূড়ান্ত অবস্থা। দিব্ শব্দে আকাশ অর্থাৎ সেই স্বচ্ছ অবিনাশী মহাশূন্য। সেই মহাশূন্য হইতে যাহার উৎপত্তি অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ তিনিই দেবতা হইতেছেন। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন ঐ কৃষ্ণও মহাশূন্যে মিলিয়া গেলেন, কারণ উহাও অনিত্য। কেবল সেই মহাশূন্যই নিত্য হইতেছেন; ইহাই যোগিরাজের বক্তব্য।

(১) গীতা ১১।১৮

তুমিই অক্ষর পরম ব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য, তুমিই এই বিশ্বের প্রকৃত আশ্রয়স্থল, তুমিই অব্যয় ও শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা এবং তুমিই সনাতন পুরুষ ইহাই আমার অভিমত। অর্থাৎ তুমিই কূটস্থ চৈতন্য ও স্থিরপ্রাণরূপ অক্ষর পুরুষ কারণ তোমার ক্ষয় নাই। আর কূটস্থের উর্দ্ধে সহস্রারে তুমিই অব্যক্তরূপী মহাপ্রাণ পরমব্রহ্ম; একমাত্র জানিবার বস্তু, তাই তোমাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অতএব তোমাকে জানিলে আর জানিবার কিছু বাকি থাকে না, তাই তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমিই জগতের প্রধান আশ্রয় কারণ অব্যক্ত ব্রহ্মের যে স্থিরাবস্থা সেই স্থিরাবস্থার শেষ না থাকায় জগতের আধার স্বরূপ পরমাশ্রয় ও নিত্য অর্থাৎ স্থির প্রাণ। তুমিই শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের পালক কারণ সনাতন ধর্ম্মের যোগক্রিয়ার অভ্যন্তরে তুমিই গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছ যাহা গুরূপদেশরূপ উপায় দ্বারা একমাত্র এই রহস্য ভেদ করিতে পারা যায়। আর তুমিই সনাতন আদি পুরুষ কাবণ তোমার আগেও কেহ নাই পরেও কেহ নাই, ইহাই আমার অভিমত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে যেমন অর্জ্জুন এই অমিততেজ বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তেমনি বাবাজি মহারাজের প্রসাদে যোগিরাজও অর্জ্জুনের ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন, সহস্র সূর্য্যের কিরণ বিশিষ্ট সহস্রাংশু দেখিতেছেন। ইহাই শশিসূর্য্যনেত্রম্।

এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের মত সাধকও অতি ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু যোগিরাজ বলিতেছেন—"আদিত্য সেরা পুরুষ হয়—অব সহজে আওএ জায়।"—ঐ সহস্রাংশুই সেরা পুরুষ অর্থাৎ প্রধান, উহা এখন চোখ বুঝিলে সহজেই দর্শন হইতেছে এবং চোখ খুলিলে চলিয়া যাইতেছে, এই অবস্থা তাঁহার এখন সহজ স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার কয়েকদিন পর একটি সহস্রদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"অয়সা হজারো চক্র ময় হরফ সমেত মালুম হোতা হয় সহস্রারমে।"—সহস্রারে যে হাজার দল বিশিষ্ট চক্র তাহার প্রতিটি দলের বীজ সমেত দেখিলাম।

৩০। "শ্বেত দ্বীপবাসি নারায়ণ দেখা।"—শ্বেত দ্বীপ অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপ বা বিষ্ণুধাম। কূটস্থে যে চন্দ্র লক্ষিত হয় সেই চন্দ্রের অন্তর্গত নারায়ণকে দেখিলাম। পুনরায় লিখিয়াছেন—"সূর্য্য নারায়ণ রূপ দেখা।"—কূটস্থে যে আত্মসূর্য্য দেখা যায় তাহার অন্তর্গত নারায়ণকে দেখিলাম। আবার লিখিয়াছেন—"জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখা, বড়া আনন্দ

হুয়া।"—সেই চন্দ্র সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবকে দেখিলাম এবং বড়ই আনন্দ হইল। ইহার পর লিখিয়াছেন— **"জ্যোতিরূপ লাল ডোরা সুষুম্নাকো কিনারে মেহিন দেখা—পহলে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখা ফির শূন্যমে সমায় গয়া।"**—সুষুম্নার ধারে লাল ডোরাকাটা মিহি জ্যোতি-রূপ দেখিলাম। ইহার পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দেখিলাম কিন্তু উহা শূন্যের ভিতর যে শূন্য সেই মহাশূন্যে মিলিয়া গেল। ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়া লিখিলেন—**"নক্ষত্র লোক দেখা।"**—যেখানে বৃহৎ চন্দ্র সূর্য্য নাই অথচ সবকিছুরই প্রকাশ, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাসমূহের অবস্থান-স্থান দিবা সর্ব্বরীকে দেখিলাম। নক্ষত্র—ন ক্ষয়ঃ অত্র = যেখানে অবস্থান করিলে আর ক্ষয় নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ স্থিরাবস্থা। এই প্রকার স্থিরাবস্থায় কূটস্থের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে স্থির ধ্রুবতারারূপ উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়।

৩১। **"জ্যোতরূপ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ দেখা।"**—জ্যোতিরূপ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ দেখিলাম।

৩২। দুইটি কাল মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"রাধাকৃষ্ণ সাধিষ্ঠান পদ্মে কৃষ্ণবর্ণ দেখা।"**—সাধিষ্ঠান পদ্মে কৃষ্ণবর্ণ রাধাকৃষ্ণ দেখিলাম।

৩৩। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—**"মহাদেবকা ত্রিশূল—বিষ্ণুকা সুদর্শন চক্র—ব্রহ্মাকা দণ্ড পঞ্চদেবতা দেখা—সত্য হে ভগবান।"**—মহাদেবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, ব্রহ্মার দণ্ড ও পঞ্চদেবতা (গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা) দেখিলাম। ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন হে ভগবান্ তুমিই সত্য।

৩৪। **"সপ্তঋষি ও চার মনু দেখা।"**—সপ্তঋষি ও চার মনু দেখিলাম। সপ্তঋষি—ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু। মনু—ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ। চতুর্দ্দশ মনুর কথা জানা যায়—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। কিন্তু যোগিরাজ চার মনু দেখিতেছেন। এবিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥[১]

(১) গীতা ১০।৬

অর্থাৎ সাত মহর্ষি, তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তি চারিজন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ; চৌদ্দজন মনু ইঁহারা সকলে আমার প্রভাবযুক্ত এবং হিরণ্য-গর্ভরূপ আমারই সংকল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্ত লোক যাঁহাদের সন্তান। এখানে যোগিরাজ পূর্ব্ববর্ত্তি ঐ চার মনুকে অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে দেখিতেছেন।

৩৫। **"শ্রীনাথকা দর্শন হুয়া।"**—শ্রীনাথ অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুর দর্শন হইল।

৩৬। **"শেষনাগপর হরি সয়ন কিএ হয় হৃদয়মে দেখাতা হয়।"**—হৃদয়পদ্মে দেখিলাম শেষনাগের উপর হরি শয়ন করিয়া আছেন। অর্থাৎ অনন্তনাগরূপ শয্যায় শয়নকারী নারায়ণকে দেখিলাম।

৩৭। **"কৃষ্ণকা শেষনাগপর শয়ন—এয়সা রূপ আঁখোসে দেখা।"**—কৃষ্ণ শেষনাগের উপর শয়ন করিয়া আছেন এইরূপ খালি চোখে দেখিলাম। এই রূপ কেমন তাহা দিনলিপিতে আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

৩৮। **"অনন্তদেব দেখা।"**—অনন্তদেব নারায়ণকে দেখিলাম।

৩৯। **"রুদ্ররাজ দেখা।"**—রুদ্ররাজ শিবকে দেখিলাম।

৪০। **"মৎস্যাবতার দেখা।"**—বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে মৎস্যা-বতারকে দেখিলাম। দশ অবতার—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী।

৪১। **"বরাহঅবতার দেখা।"**—দশ অবতারের মধ্যে বরাহাবতারকে দেখিলাম।

৪২। **"শিব সনক শক্তি—রামচন্দ্রকা ধনুক দেখা"**—শিব, ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক ও শক্তিরূপা জগদ্ধাত্রি এবং রামচন্দ্রের ধনুক দেখিলাম।

৪৩। **"নারদকা বিন্ দেখা।"**—নারদের বীণা দেখিলাম।

৪৪। **"মোগল দরবান ভগবানকা দেখা।"**—ভগবানের মোগলরূপী দরোয়ানকে দেখিলাম। এখানে তিনি দিনলিপিতে একটি মুসলমানের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

৪৫। **"বিষ্ণুজিকা পদম দেখা।"**—বিষ্ণুপদ দেখিলাম।

৪৬। **"নারায়ণ দেখা।"**—নারায়ণকে দেখিলাম।

৪৭। **"পঞ্চানন শক্তিরূপ দেখা।"**—পঞ্চানন অর্থাৎ শিবের শক্তি-রূপকে দেখিলাম অর্থাৎ শিবশক্তি। এখানে তিনি শিব এবং তাঁহার শক্তিকে অভিন্ন দেখিয়াছেন।

৪৮। **"লক্ষ্মীনারায়ণ দেখা।"**—লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখিলাম।

৪৯। **"ত্রিশুল মহাদেবকা দেখা।"**—মহাদেবের ত্রিশূল দেখিলাম।

৫০। **"কৃষ্ণ কালীজি ভয় রাহ দেখা লেকিন কুছ বোলে নেহি।"** —কৃষ্ণকালী হইলেন দেখিলাম অর্থাৎ কৃষ্ণকালীরূপ কিন্তু কিছু বলিলেন না।

৫১। **"কৃষ্ণকা রূপ—ওঁকার হরিকা রূপ দেখা।"**—কৃষ্ণের রূপ, হরির ওঁকার রূপ দেখিলাম।

৫২। **"সর্ব্বঘট বিরাজমান ওঁকারসে পরে পুরুষোত্তম নারায়ণকা রূপ ইসি ঘটমে সূর্য্যকো দেখত দেখত মালুম হোতা হয়।"**—এখানে তিনি দিনলিপিতে একটি পুরুষোত্তম নারায়ণের রূপ আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—এই দেহরূপ ঘটে কুটস্থে স্থিতি প্রাপ্তি হওয়ায় যে আত্মসূর্য্য দেখা যায় সেই আত্মসূর্য্যকে দেখিতে দেখিতে ওঁকারের অতীত সর্ব্বঘট বিরাজমান যে পুরুষোত্তম নারায়ণ তাহা বুঝিলাম।

৫৩। **"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেখা"**—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দেখিলাম। এই প্রধান তিন দেবতাকে তিনি একই সঙ্গে দেখিতেছেন।

৫৪। **"দশমহাবিদ্যা দেখা।"**—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাদেবীকে দেখিলাম।

৫৫। **"কল্প বৃক্ষ নাল—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ পঞ্চদেবতা দেখা। কল্পবৃক্ষ অসল।"**—কল্পবৃক্ষ নাল এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সহ পঞ্চদেবতা দেখিলাম। ঐ কল্পবৃক্ষ বা কল্পতরুই আসল। **"ভারি পরদা বিচকা জিসমে লখান জায় উহ পরমপুরুষ যো অনাদি নিরাকার আপনে মে হয় য়ানে আঁখ এক যো হয় কল্পবৃক্ষ। উস্কে বাদ ফির এক লম্বা দেখা যো লেজাতা অভয়পদকো উহ সূর্য্যসে পয়দা হয় যো সূর্য্য সুন্যমে মিলা হয়। এহি হয় শিবলিঙ্গ ইসকা বর্ণনকো করসকে এহি তুমহো ইহ ছোড়ায়কে দুসরা কোই নহি।"**—কুটস্থের মধ্যে যে ভারি পরদা তাহাতে যাহা দেখা যায় তিনিই পরমপুরুষ, আবার তিনিই অনাদিমধ্যান্ত নিরাকার স্বয়ম্ভু স্বরূপ, আবার যখন স্বচ্ছ কুটস্থরূপী একচক্ষু তখন তিনিই কল্পবৃক্ষ বা কল্পতরু। ইহার পর এক লম্বা দেখিলাম যিনি অভয়পদে পৌছাইয়া দেন, যিনি আত্ম-সূর্য্য হইতে উৎপত্তি হন, আবার সেই আত্মসূর্য্য মহাশূন্যে মিলিয়া যান। এই যে লম্বা জ্যোতিরূপ দেখিতেছি ইহাই শিবলিঙ্গ, ইহার বর্ণনা যোগিগণই করিতে পারেন, ইহাই তুমি আমি সকলে আবার ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই।

৫৬। **"কিসোর মূৰ্ত্তি দেখা।"**—ভগবানের কিশোর মূর্ত্তি দেখিলাম।

৫৭। **"জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখা—বড়া আনন্দ হুয়া।"**—জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখিলাম, বড়ই আনন্দ হইল।

৫৮। গুরু নানকের এক মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—**"নানকসাব সূর্য্যকা মূর্ত্ত হয়।"**—নানকসাহেব আত্মসূর্য্যের মূর্ত্তিমান্ প্রতীক।

৫৯। **"দ্বিদল পদ্ম (আজ্ঞা চক্র) জয়সা দেখনা চাহিএ"**—

দ্বিদলপদ্মরূপী আজ্ঞাচক্র যেমনটি দেখা চাই।

*　*　*　*

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া ইহা বলা যায় যে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞের যে যে অবস্থাগুলির বর্ণনা ক্রমানুযায়ী ব্যক্ত করিয়াছেন, যোগিরাজের উপলব্ধির ডায়েরিগুলি দেখিলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁহারও সেই সকল উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে হইয়া আর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তিনি ছিলেন ভারতের অন্যতম ঋষি।

ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন মহাযোগী, উপদেশ দিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বর কি ?"

যোগিরাজ বলিলেন—"ঈশ্বর কি জান ? এই যে তুমি 'ঈশ্বর কি' কথাটি যে শক্তির দ্বারায় বলিলে তিনিই ঈশ্বর। তিনি না থাকিলে 'ঈশ্বর কি' কথাটিও তুমি বলিতে পারিতে না। তিনিই সর্ব্বদা জীবকে ধারণ করিয়া আছেন তাই তিনি জগদ্ধাত্রী। রা অর্থে বিশ্ব এবং ধা অর্থে ধারণ করা। তিনিই জীবদেহকে ধারণ করিয়া আছেন, তাই তিনি রাধা।"

অপর একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"মৃত্যু কি ?"

যোগিরাজ বলিলেন—"প্রাকৃতিক কারণে চঞ্চল প্রাণ স্থির হইয়া যাওয়াই মৃত্যু পদবাচ্য। সেই অবস্থায় জীবের কর্ম্ম সংস্কার থাকে। কিন্তু সমাধি অবস্থার যে স্থির অবস্থা তাহাও মৃতবৎ, সে সময় কর্ম্ম সংস্কার থাকে না। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে শ্বাস গ্রহণকে জীবের জীবিত অবস্থা বলে এবং শ্বাস ত্যাগকে মৃত্যু অবস্থা বলে। কারণ শ্বাস

ত্যাগ করিয়া আর যদি গ্রহণ করা না যায় তাহা হইলেই জীবের মৃত্যু হয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগ ইহা যদি যথাক্রমে জীবের জীবিত ও মৃত অবস্থা হয়, তাহা হইলে উহা জীবশরীরে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। জনম-মরণ সর্ব্বদাই হইতেছে। সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। অতএব উহা প্রকৃত মৃত্যু নহে। উহা জীবের খোলস বদলান। কারণ এই প্রকার মৃত্যু ঘটিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আসা যাওয়া চলিতেই থাকে। প্রকৃত মৃত্যু ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়া, উৎপত্তিস্থলে পৌছিয়া যাওয়া, যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন থাকে না অর্থাৎ আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥[১]

হে অর্জ্জুন; ব্রহ্মলোক হইতেও সকলে পুনরাবর্ত্তনশীল হয়; কিন্তু আমাকে (আত্মাকে) পাইলে পুনরাবর্ত্তন রোধ হয়। অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে অস্থায়ী স্থিতিরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তৎপ্রাপ্তিরূপ স্থিতি লাভ না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তির সম্ভাবনা নাই। অস্থায়ী স্থিতি হওয়ার দরুন ঐ স্থিতি রহিত হইলেই মন আবার উর্দ্ধস্থান হইতে নিম্নে চ্যুত হয় এবং প্রাণ পুনরায় চঞ্চল হওয়ায় পুনঃ শ্বাস গ্রহণরূপ পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তদূর্দ্ধে স্থায়ী স্থিতি হয় অর্থাৎ মনের লয় অবস্থা হয়, সে স্থিতির আর শেষ নাই, উহাই নিঃশেষরূপ স্থিতি। দেহান্তের পূর্ব্বে এইরূপ স্থিতিলাভ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

১৮৮৬ খৃঃ (তারিখ নাই) দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"কথোপকথন নবহাধর সহিত।" নবহাধর সহিত অর্থে অহিমতেজাঃ আত্মসূর্য্যের প্রত্যাদেশ বা দৈববাণী শুনিলেন অর্থাৎ আত্মসূর্য্যরূপী মালিকের সহিত এক বাদানুবাদ হইল যে তাঁহার আয়ু কত? উত্তর লেখা নাই। প্রশ্ন—মৃত্যু কোথায়? উত্তর—কাশীতে। প্রশ্ন—যে রাস্তায় যাইতেছি ইহা ঠিক? উত্তর—যোগসাধন রীতি।

এই অমিততেজাঃ আত্মসূর্য্য সম্বন্ধে যোগিরাজ বার বার বলিয়াছেন যে ইহাই মালিক, সবকিছুর উৎসস্থল, অবস্থানস্থল এবং লয়স্থল। ইহাই ভগবান্ এবং পরিশেষে ইহাই ব্রহ্ম। এই আত্মসূর্য্য ব্যতীত আর কিছু

(১) গীতা ৮।১৬

নাই, ইহা অদ্বিতীয়। এই আত্মসূর্য্য সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং ইহা চিরসৎ শুদ্ধ নির্ম্মল মহাশূন্যরূপী পরব্রহ্ম। এই জগদাদি যাহা প্রত্যক্ষ হয় এ সবই সেই চির নির্ম্মল আত্মসূর্য্যেরই চঞ্চলতার প্রকাশ, যাহাকে অবিদ্যা ও মায়া বলে; এ সবের মধ্য দিয়া আত্মসূর্য্যরূপী পরব্রহ্মই প্রতিভাসিত। এই আত্মসূর্য্য যাঁহার প্রত্যক্ষদর্শন হয় এবং পরিশেষে ইহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যান সেই যোগীই অদ্বৈতবাদী এবং তাহার পূর্ব্বে সকলেই দ্বৈতবাদী। তাই তিনি বলিতেন—"সাধকের সাধনা যেখানে শেষ, যোগীর সাধনা সেখানে শুরু।"

দশম পরিচ্ছেদ

মহাসমাধি

যোগিরাজ গরুড়েশ্বরে যে বাড়ি ক্রয় করিয়া বাস করিতেন সেই বাড়িতে পূর্ব্ব হইতেই তিনটি শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা সমেত বাড়িটি কেনা হইয়াছিল। কাশীমণি দেবী প্রতিদিনই সেই শিব পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল নিজে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে কাশীতে শিব প্রতিষ্ঠা করা মহা পুণ্যের কাজ। সেকারণে শিবধাম কাশীতে অনেকেই বাড়িতে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন কাশীমণি দেবী এই ইচ্ছা তাঁহার পিতার (দেবনারায়ণ বাচস্পতি) নিকট ব্যক্ত করিলে পিতা বলিয়াছিলেন বাড়িতে শিব প্রতিষ্ঠা করিলে কালে ঐ শিবের ঠিক মত সেবা হয় না, সেজন্য শিব প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল। বরং যে শিব তুমি পূজা করিতেছ তাহাকেই নিজের প্রতিষ্ঠিত শিব মনে করিয়া পূজা কর। সেই হইতে কাশীমণি দেবী সারা জীবন ঐ শিবকেই ভক্তিভরে পূজা করিতেন।

একদিন যথারীতি সকালে কাশীমণি দেবী শিবপূজা করিতেছেন, এমন সময় যোগিরাজ দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাশীমণি দেবী ভাবিলেন এ সময়ে উনি কোন দিনও এদিকে আসেন না, আজ হঠাৎ আসিলেন কেন ? কাশীমণি দেবী ফিরিয়া তাকাইলেন।

যোগিরাজ মৃদু হাসিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে কাশীমণি দেবীকে বলিলেন— "দেখ, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। এবার যাবার সময় হয়েছে, আর মাত্র ছয় মাস থাকব, তারপর চলে যাব। তোমরা শোক কোরো না, কেবল তোমাকেই জানিয়ে রাখলাম।" তিনি আরও বলিলেন—"আমার দেহত্যাগের পর যে ঘরে আমি থাকি সেই ঘরেই দেহটি রেখে দিও, আমি পরে আবার ফিরে আসব। আর যদি তা না পার তবে ঐ ঘরেই সমাধি দিও।"

কাশীমণি দেবী এসব কথার কোন গুরুত্ব দেন নি। ভাবিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী হয়ত কোন খেয়াল বশতঃ ঐ রকম কথা বলিয়া থাকিবেন।

এবার মহাযোগী তাঁহার মহাপ্রস্থানের দিনক্ষণ ঠিক করিয়াছেন এবং

মর্ত্যলীলার সমাপ্তি ঘটাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ভক্তদেরও প্রস্তুত করিতে হইবে, তাই প্রায় তিন মাস পূর্ব হইতে কয়েকজন উন্নত ভক্তের নিকটও সে কথা ব্যক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন আগাইয়া আসিতে লাগিল। ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার এক মাস পূর্বে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ব্রণ (Carbuncle) দেখা দিল। এই কার্‌বাঙ্কল্‌ রোগকে উপলক্ষ্য করিয়াই মহাযোগী মরদেহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় কর্ম্মস্থল দিল্লী হইতে অবিলম্বে বাড়ি পৌঁছাইলেন।

ভক্তদের বিরামহীন সেবা চলিতে লাগিল। গৃহচিকিৎসক পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার ভক্ত কলিকাতার মেডিকেল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হেমচন্দ্র সেন আসিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কোন সুলক্ষণ দেখা গেল না। হেমবাবু অস্ত্রোপচার করিবেন মনস্থ করিয়া যোগিরাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। যোগিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"প্রকৃতির নিয়মে থাকাই ভাল।" চিকিৎসক বুঝিলেন অস্ত্রোপচারে তাঁহার ইচ্ছা নাই। তাই চিকিৎসক অস্ত্রোপচারে নিরত হইয়া ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার করিয়া বুক-পিঠ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু যিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত তাঁহাকে কি বাঁধিয়া রাখা যায়; মহাযোগী সম্মত নহেন দেখিয়া অনুপায় চিকিৎসক বন্ধন মোচন করিলেন। যোগিরাজ নিজে একপ্রকার নিম তৈল তৈয়ারী করিয়া ভক্তদের নানা ব্যাধিতে ব্যবহার করিতে দিতেন। সেই তৈলও ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু রোগের কোন প্রকার সুলক্ষণ দেখা গেল না। চিকিৎসক হেমবাবু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যোগিরাজ নীচের বৈঠকখানা ঘরে যে চৌকির উপর বসিয়া প্রতিদিন ভক্তদের সহিত আলোচনা করিতেন, যেখানে বসিয়া ভক্তদের পূর্ণ করিতেন ব্রহ্ম জ্ঞানের বন্যায়, সেই চৌকিতেই শুইয়া আছেন মহাযোগী। ভক্তদের সদা আনাগোনা ও সেবা চলিতেছে। সকল শ্রেণীর মানুষ আসিয়া যোগিরাজের খবর লইতেছে, সকলেই চিন্তিত। রাজপুত ব্রাহ্মণ ভক্ত কৃষ্ণারাম সর্বদা ছায়ার মত লাগিয়া আছে যোগিরাজের সেবায়। মন প্রাণ দিয়া কৃষ্ণারাম সেবা করিতেছে গুরুমহারাজের। একমাত্র চেষ্টা কেমন করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে। কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই

চলিয়াছে। চিকিৎসকরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। বিরামহীন সেবার মাঝেও অশ্রুধারা নামিয়া আসে কৃষ্ণারামের। সকলেরই ইচ্ছা তাঁহারাও যোগিরাজের সেবা করেন। বাড়ির মহিলারাও তাহাই চান। তখনকার পর্দানসিন সমাজে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা অপর পুরুষদের সম্মুখে আসিতেন না। কৃষ্ণারামের বিরামহীন সেবা এবং সেই সাথে বহু ভক্তের আনাগোনায় বাড়ির স্ত্রীলোকেরা সে সুযোগ পান না। কৃষ্ণারাম একাই একশ। সে নিজেই সেবা করিবে। তাহার ধারণা সে নিজে সেবা না করিলে বোধহয় গুরুমহারাজজীর সেবা ঠিকমত হইবে না। কাজেই আর কেহ সেবা করিবার সুযোগ পায় না।

কৃষ্ণারামের অক্লান্ত সেবায় মহাযোগী বড়ই সন্তুষ্ট। মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বদিন স্নেহভরে ডাকিলেন কৃষ্ণারামকে, বলিলেন—"কৃষ্ণারাম, তোমার সেবায় আমি বড় সন্তুষ্ট। তোমার কি চাই বল। যা চাইবে তাই পাবে।"

করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণারাম। চোখ থেকে নেমে আসে গঙ্গা যমুনার ধারা, কণ্ঠ শুকিয়ে আসে, পা কাঁপে কৃষ্ণারামের।

স্নেহগম্ভীর কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হল—"বল কৃষ্ণারাম কি চাই তোমার? আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট।"

অশ্রুসজল নয়নে, কম্পিত কণ্ঠে, ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে কৃষ্ণারাম বলে—"আমার চাইবার মত কিছু নাই। কেবল একটাই প্রার্থনা, আপনার শ্রীচরণে যেন স্থান পাই।"

যোগিরাজ মৃদু হাসিয়া বলেন—"তাই পাবে কৃষ্ণারাম।"

কৃষ্ণারাম লুটাইয়া পড়ে যোগিরাজের চরণতলে।

কৃষ্ণারামজীর নির্লোভতার আর একটি ঘটনা যোগিরাজের অন্যতম শিষ্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের প্রমুখাৎ জানা যায়। যোগিরাজের মহাপ্রয়াণের অনেক দিন পর একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সহ কাশীধাম আসিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য স্থান সকল দর্শন শেষে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—"সান্যাল মহাশয়, শুনেছি কাশী সাধুদের জায়গা। আমাকে যথার্থ সাধু দর্শন করাতে পারেন।"

সান্যাল মহাশয় বলিলেন—"আপনি কি কোন বেশধারী নামকরা সাধু দেখতে চান, নাকি আমি যাঁকে যথার্থ সাধু বলে জানি তেমন সাধু দেখবেন?"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—"আপনি যাঁকে প্রকৃত সাধু বলে জানেন তাঁকেই দেখান।"

তাঁহারা উভয়ে গেলেন কাশীর গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক পল্লী রাণামহলে, কৃষ্ণারামের আস্তানায়। কৃষ্ণারাম থাকিতেন উদয়পুর ষ্টেটের রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে। কৃষ্ণারাম বসিয়া আছেন ঊর্দ্ধনেত্রে, যেন কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। দেখিলেই মনে হয় সংসারের সকল বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত। কে এল কে গেল কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই। তাঁহারা উভয়ে সন্তর্পণে আসন গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণারাম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

কিছুক্ষণ পর সান্যাল মহাশয় বলিলেন—"কৃষ্ণারামজী, আমরা এসেছি।"

কৃষ্ণারাম নামিয়া আসিলেন অনিত্যধামে।

সান্যাল মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন রবীন্দ্রনাথের সহিত। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় তাঁহার সহিত ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া তৃপ্ত হইলেন। যাইবার কালে রবীন্দ্রনাথ দশটি টাকা দিলেন কৃষ্ণারামজীকে। বলিলেন—"এই অর্থ আপনার সেবায় লাগলে আনন্দিত হব।"

কৃষ্ণারাম বলিলেন—"আমার এখন অর্থের কোন প্রয়োজন নেই।"

রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে পুনরায় বলিলেন—"টাকাগুলি আপনার সেবায় লাগুক এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

কৃষ্ণারাম প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"ঠিক আছে মনে করুন ঐ টাকা আমারই। এখন আপনার কাছে গচ্ছিত রাখুন, যখন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেব।"

* * * *

যোগিরাজের প্রিয় শিষ্য দেওঘরের পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য[১] সহ বহু ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আর এক প্রিয় ভক্ত স্বামী প্রণবানন্দ তখন উদয়পুরে ছিলেন। গুরুদেবের অন্তিম অবস্থার খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি কাশী যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ প্রণবানন্দ দেখিলেন তাঁহার গুরুদেব অলৌকিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"প্রণবানন্দ, আর তাড়াতাড়ি করে লাভ নেই। তুমি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি দেহত্যাগ করব।"

প্রণবানন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। যোগিরাজ সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"কাঁদছ কেন? দেহ গেলেও সদ্‌গুরুসত্তা থাকে। আমি সর্ব্বদাই আছি।"

যোগিরাজের আর এক ভক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[২] তখন হরিদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। যোগিরাজের তিরোধানের কয়েকদিন পূর্ব্বে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন তাঁহার গুরুদেব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"সত্বর কাশী চলে এসো।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্বর কাশী চলিয়া আসিলেন। দেখিলেন গুরুদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এইভাবে মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে যোগিরাজ তাঁহার বহু ভক্তকে সজাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

---

(১) ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরে কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। যোগিরাজের দেহত্যাগের সময় তিনি কাশীতে উপস্থিত ছিলেন না। কারণ মহাপ্রয়াণের পরদিন অর্থাৎ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৫, বাংলা ১১ই আশ্বিন ১৩০২, শুক্রবার যোগিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় একটি পোষ্টকার্ড দ্বারা কলিকাতার বৃন্দাবন বোস লেনের ঠিকানায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিখিয়াছেন—"গত কল্য বৈকাল পাঁচটা পঁচিশ মিনিটের সময় পিতাঠাকুরের ৺কাশীলাভ হইয়াছে। মহাশয় কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য স্থানীয় যে সকল মহাশয়গণকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করা উচিত বিবেচনা করেন করিবেন। যাহাতে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় আপনাদের তাহাই কর্ত্তব্য। পত্রের দ্বারা ভারার্পণ করিলাম।"

পূর্ব্বে বহু গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে যোগিরাজের মহাপ্রয়াণ সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। যদিও তিনি তাঁহার গুরুদেবের দেহত্যাগের খবর পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন।

(অনুমত্যানুসারে পত্রখানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল।)

(২) ইনি পরে কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন।

Benaras

To,
The Treasury officer of Benaras.

Sir,
I request the favour of forwarding the accompanying Pension Roll for renewal.

Inspector General of Military works No. 4642 dt. 6th October 1880 and offg. Assistant to Accountant General NNP and audh No. 5678 dt. Allahabad 9th October 1880 for Rs. 29/4/6 four months drawn upto April 1891. I am in caste Brahmin. Date of my birth is May 1826 *

I have the honour to be
Sir
your most obedient servent,.
Shama Charan Lahiree,
Guroodeshwar
Benaras City.

Benaras
7th May 1891.

* এই পত্রে যোগিরাজ তাঁহার যে জন্ম মাস ও বছর লিখিয়াছেন তাহা সঠিক নহে, যদিও চাকুরিক্ষেত্রে এই জন্ম সময় দেওয়া ছিল ঠিকই। ডায়েরিমধ্যে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত যে জন্মপত্রিকা আছে এবং সেখানে যে জন্মসময় লিখিত আছে তাহাকেই আমরা সঠিক জন্মসময় বলিয়া ধরিয়াছি। পরিশিষ্ট ক-তে যোগিরাজের স্বহস্ত লিখিত সেই জন্মপত্রিকা দেওয়া হইল এবং ঐ কোষ্ঠীর বিচার করিয়াছেন শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

যোগিরাজ যে ঘরে অবস্থান করিতেন সে ঘরে পর্য্যাপ্ত জানালা দরজা না থাকায় আলো কম প্রবেশ করিত। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন দুপুরে অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে শুইয়া আছেন মহাযোগী। সামনের বৈঠকখানায় পর্য্যবেক্ষণরত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়। হঠাৎ তিনি দেখিলেন তাঁহার পিতা বিছানা হইতে উঠিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক দেওয়াল আলমারীর নিকট গিয়া কিছুক্ষণ কতকগুলি পুস্তক নাড়াচাড়া করিলেন এবং শেষে সুস্থ সবল মানুষের মত হাঁটিয়া গিয়া পুনরায় বিছানায় শয়ন করিলেন।

ইহা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যদি এতই সুস্থ তাহলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেড-প্যানে মলমূত্র ত্যাগ করেন কেন? অন্ততঃ নালায় বসে মলমূত্র ত্যাগ করতে পারেন?"

যোগিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কোথায় ছিলি?"

তিনকড়িবাবু বলিলেন—"পাশের ঘর থেকে সব দেখছিলাম।"

মহাযোগী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"সকলের ইচ্ছা একটু সেবা করে, তাই বিছানায় শুয়ে আছি। শুয়ে না থাকলে তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হবে কি করে?"

অবশেষে গরুড়েশ্বরের বাড়ির[১] ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর, বাংলা ১৩০২ সালের ১০ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, মহাষ্টমী। যোগিরাজ রোগশয্যায় অবস্থান করিয়াও যেমন প্রতিদিন চৌকির উপর শুইয়া অথবা বসিয়া ভক্তদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তেমনি ঐ দিনও অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি শ্লোক মৃদুস্বরে ব্যাখ্যা করিতেছেন। গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে অগণিত ভক্ত শুনিতেছেন। সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত, অশ্রুসিক্ত। বাহিরে মহাষ্টমীর বাজনা বাজিতেছে। দিনমণি সেদিনের মত পাটে বসিতেছেন।

অশ্রুসজল নয়নে, কম্পিত কণ্ঠে ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার অবর্ত্তমানে আমরা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ব, তখন আমাদের উপায় কি হবে?"

যোগিরাজ অভয় দিয়া বলিলেন—"ঋষিসেবিত এই অমর যোগসাধন

(১) যোগিরাজের বসতবাড়ির বর্ত্তমান ঠিকানা ডি/৩১/৫৮, মদনপুরা বারাণসী। গরুড়েশ্বর বর্ত্তমানে মদনপুরার অন্তর্গত হইয়াছে। সেখানে বর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরপুরুষেরা বসবাস করিতেছেন। যোগিরাজের লক্ষ লক্ষ পদাশ্রিত বা অনুগামী ভক্তদের কাছে ঐ বাড়ি তীর্থস্বরূপ।

যারা করে তারা কখনও নিরাশ্রয় হয় না। এই প্রাণকর্ম্ম কোন দিনই লুপ্ত হবার নয়। ইহা চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। মানুষ যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে ততই প্রাণকর্ম্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, কারণ ইহা বিজ্ঞান সম্মত সাধন।"

অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র। ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া আরও বলিলেন—"এই মহান্ ও অমর যোগ যাহা গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হয়ে পুনঃস্থাপনা করে গেলাম তাহা ভবিষ্যতে প্রতি ঘরে ঘরে লোকে চর্চা করবে এবং ক্রমে মানুষ মুক্তিপথের দিকে এগিয়ে যাবে। প্রাচীন কালের মত মানুষের জীবন্মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।"

যোগিরাজ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অশ্রুধারাসিক্ত ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন--"আমার যাবার সময় হয়েছে। তোমরা শোক কোর না। নশ্বর দেহ গেলেও সদ্গুরুসত্তা থাকে। আমি সর্ব্বদা তোমাদের মাঝে আছি।"

ঐ চৌকির উপরেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মহাসমাধি মগ্ন অবস্থায় তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। তখন বৈকাল পাঁচটা পঁচিশ মিনিট।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ কঠিন হইল না। ভক্তগণ পুষ্পমাল্য চন্দন প্রভৃতি দ্বারা মরদেহ সজ্জিত করিলেন। বহু নরনারী তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনেকে মত প্রকাশ করিলেন তাঁহার মরদেহকে সমাধি দেওয়া উচিত। কিন্তু পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন যোগিরাজ সিদ্ধ যোগিপুরুষ হইলেও গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। অতএব গৃহীর নিয়মানুসারে তাঁহার দেহের অগ্নিসংস্কার করাই উচিত। শেষে বিরাট শোভাযাত্রা ও কীর্ত্তনাদি সহ তাঁহার মরদেহ মণিকর্ণিকা ঘাটে আনয়ন করা হইল। সেখানেও বহু নরনারী ও সাধুসন্ন্যাসীরা আসিয়া তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। শাস্ত্রমতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুখাগ্নি করিবার পর তাঁহার লীলাদেহের অগ্নিসৎকার করা হইল। সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সাধু, সন্ন্যাসী ও নারীপুরুষের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"হরহর মহাদেব শম্ভো।" শোকাশ্রুধারা নামিয়া আসিল শত শত ভক্তের নয়নে। বিশ্বনাথ মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

এদিকে শোকাতুরা কাশীমণি দেবী ভুলিয়া গিয়াছেন ছয়মাস পূর্ব্বের যোগিরাজের সেই কথা। কাশীমণি দেবী সহ কয়েকজন মহিলা কেবলমাত্র

বাড়িতে আছেন। সকলেই শোকে মুহ্যমান। এমন সময় কাশীমণি দেবীর হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, যোগিরাজ প্রদত্ত ছয়মাস পূর্ব্বের কথা। তাড়াতাড়ি ভ্রাতা রাজচন্দ্র সান্যালকে ডাকিয়া শ্মশানে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি গিয়া দেখিলেন চিতা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

কেন তাঁহার এমন ভুল হইল—শোকাতুরা কাশীমণি দেবী হায় হায় করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্মশান যাত্রীরা ফিরিয়া আসিল। কাশীমণি দেবীর ভ্রাতা পণ্ডিত ভগবান সান্যাল সবকিছু শুনিয়া বলিলেন—"এ ভুল তিনিই করাইয়া দিয়াছেন। মহাযোগী সর্ব্বদা বাস্তব খেয়ালে থাকিতেন না। হয়ত তেমন কোন খেয়াল বশতঃই বলিয়াছিলেন। পরে আবার তিনিই দেখিয়াছিলেন যে তিনি গৃহী মানুষ, গৃহীর নিয়ম অনুসারে দাহ করাই উচিত। তাই তিনিই ঐ ভুল করাইয়াছেন। সেজন্য শোক করাউচিত নহে।"

যে কথা তিনি কাশীমণি দেবীকে বলিয়াছিলেন অনুরূপভাবে সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা যে তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার স্বহস্ত লিখিত ডায়েরী হইতে। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"আজ **এরাদা হয় কি অনহদ ধ্বনি মে ধ্যান সাম সে কল সাম তক লগাওয়ে অগর হম মর জায় তো কোই হমকো ন ফেকে—ইহাঁই গাড়কে রখে য়া ওয়েসেহি বইঠায়কে রখে—হম ফির জাগেঙ্গে।**" অর্থাৎ আজ ইচ্ছা হইতেছে যে অনাহত ধ্বনিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া আজ সন্ধ্যা হইতে কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিব, যদি আমি এই অবস্থায় মরিয়া যাই তাহা হইলে কেহ যেন আমাকে ফেলিয়া না দেয়—এইখানেই পুঁতিয়া রাখিবে অথবা ঐভাবে বসাইয়া রাখিবে—আমি আবার জাগিব।

যোগিরাজের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য দেওঘরের পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দীর্ঘ পত্রে কোন এক ক্রিয়াবানকে তাঁহার গুরুদেবের নশ্বর দেহত্যাগ কালীন সময়ের বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন[১]—

---

(১) অনুমত্যানুসারে উক্ত পত্রখানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল। তিনি যোগিরাজের আদরনীয় শিষ্য ছিলেন এবং সাধনায় খুব উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহু মানুষকে আত্মানুসন্ধানের পথ দেখাইয়াছিলেন। বাংলাদেশের বহু মানুষ যোগদীক্ষা পাইতে ইচ্ছুক হইলে যোগিরাজ তাহাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনেক সময় প্রেরণ করিতেন। যোগিরাজের যত গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করা হইত তাহার বেশীর ভাগই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে হইত।

নমস্কারান্তরমিদং,

"দীক্ষাগুরু যদি সিদ্ধ না হন তাহা হইলে অসিদ্ধ গুরুর ঔষধাদি দরকার হইতে পারে এবং তাহা করাও উচিত। সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষের কিছুই দরকার হয় না। বায়ুর বিকারে যতপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে এবং তাহাও বায়ুর চঞ্চলতায় ঘটিয়া থাকে ; যিনি সিদ্ধ বা মুক্ত তিনি সর্ব্বদাই স্থির বায়ুতে রমণ করিয়া থাকেন। যেখানে স্থির বায়ু সেখানে ব্যাধি কোথায়? তবে জীবভাবাপন্ন মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহারা নিজের মত করিয়া দেখে বলিয়া সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষগণকে ঔষধাদির দ্বারা আরোগ্য করিবার মানসে ধাবিত হইয়া থাকে। ইহা কেবল তাহাদের অদূরদর্শিতার ফল। তাহারা না বুঝিয়া সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষের ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া অবমাননা করিয়া থাকে, তাহাও তাহারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহাদের সাধুর ভান্ দেখাইয়া সাধু হইবার ইচ্ছা থাকে তাহারাই বলিয়া থাকে সিদ্ধ মুক্ত পুরুষেরও ব্যাধি হইয়া থাকে ও তাঁহারা ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। কারণ ইহা না বলিলে তাহাদের প্রতিপত্তি কিরূপে হইতে পারে। কারণ তাহাদের নিজের ব্যাধি হইলে ঔষধ খাওয়া চাই, কারণ মরিবার ভয় আছে। সুতরাং সিদ্ধরাও ঔষধ খাইয়া থাকেন এবং খাওয়ানও উচিত, না খাওয়াইলে পাপ আছে ইহা তাঁহারাই বলিয়া থাকেন। সিদ্ধ বা মুক্তপুরুষকে সাধারণ মানবের মতন গণ্য করা ইহা কি একটা মহাপাতক নহে? সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ যাঁহারা তাঁহারা ধরা পড়িবার ভয়ে অনেক সময় সাধারণ জীবভাবের মতন কার্য্য সকল দেখাইয়া থাকেন, তাহাতেই যাহারা সাধারণ ব্যক্তি তাঁহারা বলিয়া থাকেন সিদ্ধ বা মুক্তপুরুষরাও ঔষধ সেবন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ব্যাধিও হইয়া থাকে এবং ভাল মন্দ কার্য্যও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে কিছুই করেন না এবং তাঁহাদের ব্যাধিও হয় না তাহা সাধারণে অবগত নহে। ইহা গুরুদেবের দেহত্যাগ সময়েও ঘটিয়াছিল। গুরুদেবের কোন শিষ্য যিনি লোকসমাজে গুরুদেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, তিনি তাঁহাকে রোগী মনে করিয়া ঔষধ ও চিকিৎসা করিবার বাহ্যিক ব্যস্ততা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু গুরুদেব নিজে তাঁহার পুত্র তিনকড়িবাবুকে এই কথা বলেন 'আমার কোন চিকিৎসা করান ভাল নহে, স্বভাবের উপর থাকাই ভাল।' যাহারা খোদার উপর খোদকারি করিতে যায় তাহারা কিরূপ প্রকৃতির লোক বুঝিতে পারি। মনে করুন তাঁহার যদি ব্যাধিই হইয়া থাকিবে তাহা

হইলে তাঁহার মল মূত্রে অসুখ জনিত দুর্গন্ধ ছিল না। কেন? এবং ঘায়ে যে পুঁজ হইয়াছিল অন্ততঃ তাহাতে দুর্গন্ধ হওয়া চাই, তাহাও ছিল না। তাঁহার পুঁজে কোন প্রকার দুর্গন্ধ ছিল না। এ সকল দেখিয়াও কি লোকের চৈতন্য হয় না? হায় হায় ইহারা কি মনে করিয়াছে তিনি কি সামান্য বেশধারী সাধু মহাত্মা ছিলেন? তিনি কি কারণে দেহত্যাগ করিলেন এবং মুক্ত যেভাবে দেহত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিও সেইভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সামান্য মানবের ন্যায় বোধ করা উচিত নহে। কে তাঁহার চিকিৎসা করিবে? তাহার জ্ঞান রাখা উচিত অহংকারী জীব অহং মদে মত্ত হইয়া নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি নাই। তিনি যে দেহত্যাগ করিবেন তাহা গত আগষ্ট মাসে আমাকে বলিয়াছিলেন এবং আমিও তাহা আট দশ জনকে বলিয়াছিলাম.................।"

(ইহার পর বাকি অংশটুকু পাওয়া যায় নাই)

*　　*　　*　　*

এই মহাযোগীকে দেখিলে মনে হইত যেন একটি স্বর্গের শিশু জগৎ-জননীর অভয়ক্রোড়ে পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন। আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ এই মহাযোগীর দেহে বার্দ্ধক্য স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেবল মাথার কেশগুলিই সাদা হইয়াছিল, কিন্তু শরীরে কোথাও একটা টোল খায় নাই। এই মহাযোগী ইচ্ছামাত্র তাঁহার স্থূল দেহকে নূতনভাবে গঠিত করিতে পারিতেন, সে শক্তি তাঁহার ছিল।[১] কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, বরং বলিতেন যাহাকে একদিন না একদিন অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেই দেহের প্রয়োজন শেষ হইলে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

তিনি তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেও ভক্তদের নিকট সদা বিরাজমান। এই মহাযোগীর আশীর্ব্বাদ তাঁহার অসংখ্য উন্নত শিষ্যদের জীবনে কতকখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা তাঁহার কয়েকজন ভক্তকে দেখিলেই বোঝা যায়।

---

(১) কোন্ কোন্ সাধন প্রক্রিয়ায় কায়কল্প পরিবর্ত্তন করা যায়, নূতন দেহলাভ করা যায় তাহা তাঁহার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাহা গূঢ় সাধনতত্ত্ব হেতু প্রকাশ করা হইল না।

মহাযোগী অন্তিম মুহূর্তে কৃষ্ণারামের সেবায় তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর চাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণারাম পার্থিব কামনা বাসনার উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি সেদিন কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিয়াছিলেন যে গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর কিছু তাঁহার কাম্য নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কৃষ্ণারাম থাকিতেন উত্তরবাহিনী জাহ্নবীর কোলে রাণামহল ঘাটের উপরে অবস্থিত উদয়পুর ষ্টেটের রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে। মহাপ্রয়াণের পুণ্য মুহূর্তে তাঁহার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন যোগিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এবং অপর পার্শ্বে বসিয়া আছেন যোগিরাজের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক বংশীধরজী। প্রয়াণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত. শ্বাসের গতি উর্দ্ধমুখী কিন্তু কৃষ্ণারামজী ধীর স্নিগ্ধ অকম্পিত স্বরে কণ্ঠস্থ গীতা আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। পুরুষোত্তম যোগের শেষ শ্লোক "এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু মহাব্যোমে লীন হইল। চির গম্ভীর ও অচঞ্চল তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এবং বংশীধরজীর কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিল।

কাশীমণি দেবী পরলোক যাত্রার উদ্দেশ্যে শয্যায় শুইয়া আছেন। কোন রোগ তাঁহার হয় নাই, বার্দ্ধক্যতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। হঠাৎ তাঁহার পৌত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"এখনই তোব ঠাকুরদাদা আসবেন, তাঁকে বসতে দিতে হবে তো।"

পৌত্র জিজ্ঞাসা করেন—"ঠাকুরদাদা এখন কোথায় আছেন?"

মৃদু হাস্য করিয়া কাশীমণি দেবী বলিলেন—"বিশ্বনাথের বাড়িতে আছেন।"

পৌত্র কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"তিনি কি প্রতিদিনই আপনার নিকট আসেন?"

পুনরায় স্মিত হাস্যে কাশীমণি দেবী বলেন—"হ্যাঁ, প্রতিদিনই তিনি আসেন আমাকে দেখতে। এখানে বসেন, অনেক কথাও বলেন। আজও আসবেন, তাই তোকে আসন পেতে দিতে বলছি।"

আসন পাতিয়া দেন পৌত্র। তাহার কয়েকদিন পর সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন কাশীমণিদেবী।

তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামপদারথজী প্রতিদিন আসিয়া যোগিরাজের ব্যবহৃত পুণ্যকক্ষে বসিয়া কিছু সময় ধ্যান-ধারণা করিয়া চলিয়া যাইতেন।

বার্দ্ধক্যহেতু ক্রমে তাঁহার শরীর অপটু হইল, চোখেও ভাল দেখিতে পান না, তবুও লাঠিতে ভর করিয়া প্রতিদিন আসা চাই। এইভাবে একদিন আসিবার কালে রাস্তায় পড়িয়া যান রামপদারথজী। যোগিরাজের কনিষ্ঠ পৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় সেই সময় ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত বয়সে এত কষ্ট করে প্রতিদিন আসার কি প্রয়োজন?"

পা কাটিয়া গিয়াছে, তবুও মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া রামপদারথজী বলিলেন—"গুরুমহারাজ আমাকে অনেক কৃপা করেছেন, কিন্তু আমি এতই অপদার্থ যে জীবনে কিছুই করতে পারি নি। তাই প্রতিদিন তাঁর দরবারে একবার করে হাজিরা দিয়ে যাই। সাধুর দরবার, যেদিন তাঁর কৃপা হবে সেদিন উদ্ধার হয়ে যাব।"

ক্রমে ভক্ত রামপদারথজী বার্দ্ধক্যবশতঃ আর তাঁহার পুণ্য গুরুগৃহে হাজিরা দিতে পারেন না। অবশেষে অন্তিমকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে, গুরুমহারাজ এসে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা আসন পেতে বসতে দে।"

ভ্রাতুষ্পুত্র জিজ্ঞাসা করেন—"কোথায় আপনার গুরুমহারাজ?"

হাত বাড়াইয়া অন্তিমযাত্রী রামপদারথজী স্মিত হাস্য করিয়া বলেন—"ঐ ত গুরুমহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছিস না? আসন পেতে বসতে দে।"

ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাই করেন। অল্প সময় পরে প্রাণাধিক গুরুমহারাজকে স্মরণ করিতে করিতে রামপদারথজীর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

যোগিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিমতী দেবীর কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতেন। তিনি প্রায় ৮৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ব্বসন্ধ্যায় বাড়িতে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন হইতেছিল এবং তিনি দোতলার বারান্দায় বসিয়া তাহা শুনিতেছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার শরীর খারাপ লাগিল তাই তিনি ঘরে আসিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সত্যচরণ আসিতেই তিনি বলিলেন—"এখানে আসন পেতে দে, বাবা আমাকে নিতে এসেছেন, বসতে দে।"

তাঁহার কথায় সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় বিস্মিত হইলেন এবং যে আসনখানি একদা কাশীমণি দেবীর মহাপ্রয়াণের সময় যোগিরাজের উদ্দেশ্যে

পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই আসনখানি পাতিয়া দিলেন। সেইদিনই শেষরাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার চিরাভ্যস্ত 'ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী' 'রামায় রামচন্দ্রায়' প্রভৃতি প্রাভাতিক প্রিয় স্তোত্রগুলি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু মহাপ্রাণে মিশিয়া গেল।

যোগিরাজের একান্ত সেবক বংশীধর খান্না পরবর্ত্তিকালে কাশী হইতে ২০ মাইল দূরে যোগিরাজের বংশধরদের জমিদারীতে নায়েবির কাজ করিতেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন বলিয়া জমিদারীর সমস্ত কাজ দেখাশুনার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল, সেজন্য তিনি গুরুর ধন জীবন দিয়া রক্ষা করিতেন।

তিনি বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁহার এক আত্মীয় বেণীপ্রসাদ ক্ষত্রী একদিন বলিলেন—"এবার কাশীবাস করুন, তা না হলে কি এই জঙ্গলে মরে পড়ে থাকবেন?"

বংশীধরজী বলিলেন—"গুরুমহারাজ আমাকে অনেক কৃপা করেছেন কিন্তু আমি কিছুই করতে পারি নি। তাই এই শরীরের দ্বারা যা কিছু কর্ম্ম হয়, সবই তাঁর কাজ; সেজন্য এই শরীর তাঁর চরণেই অর্পণ করেছি। তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি জঙ্গলে ফেলবেন অথবা তাঁর চরণে স্থান দেবেন, সেজন্য আমার কোন চিন্তা নাই।"

একদিন যোগিরাজপৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় জমিদারীতে গিয়া বংশীধরজীকে বলিলেন—"আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এখন আপনার সেবার প্রয়োজন। আপনি এখন পুত্র পুত্রবধূর নিকটে গিয়ে থাকুন, আপনার হাতখরচ বাবদ মাসিক কিছু দেব।"

বংশীধরজী বলিলেন—"এমন কথা বলবেন না। যতদিন পর্য্যন্ত আপনাদের কাজের জন্য কলম ধরতে পারব ততদিনই যেন আপনাদের অন্ন খাই। যেদিন কলম ধরতে পারব না সেদিন যেন গুরুমহারাজ তাঁর চরণে স্থান দেন। আমার বোঝা আপনাদের উপরেও দিতে চাই না, ছেলেদের উপরেও দিতে চাই না। আমি মরে গেলে এই দেহ কাশীতে নিয়ে যাবেন না। আমি চাই না এরজন্য গুরুর ধন খরচ হয়। দেহটা জঙ্গলে ফেলে দেবেন জানোয়ারদের কাজে লেগে যাবে।"

কিছুকালপর জমিদারীতে কর্ম্মরত অবস্থায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে সুচিকিৎসার জন্য কাশীতে আনা হইল। সেদিন ছিল আশ্বিন শুক্লা চতুর্দ্দশী। পরদিন কোজাগরী পূর্ণিমার মধ্যাহ্নে যে ঘরে যোগিরাজ

থাকিতেন তাহার সামনে বারান্দায় শুইয়া আছেন অন্তিমযাত্রী বংশীধরজী। যোগিরাজপৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়, যোগিরাজের অন্যতম শিষ্য ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় সহ আরও বহু ভক্ত উপস্থিত আছেন। সান্যাল মহাশয় শিয়রে বসিয়া সুমধুর স্বরে গীতা পাঠ করিতেছেন। প্রাণাধিক গুরুকে স্মরণ করিতে করিতে বংশীধরজী চিরসমাধি লাভ করিলেন।

সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরুসেবায় উৎসৃষ্ট একটি উন্নত ক্রিয়াবানের জীবন গুরুচরণে লীন হইল।

গুরুপদাশ্রয়ের ঐহিক সুদূরপসারিতার প্রমাণরূপে রামমোহন দে এবং তাঁহার ভগিনী মনোমোহিনীর কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মনোমোহিনীর গুরুপদে যে কি অগাধ আস্থা ও নিষ্ঠা ছিল তাহা তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তে রূপায়িত হয়।

মনোমোহিনীর শিয়রে তাঁহার আরাধ্য গুরুদেবের একটি ছবি রাখা থাকিত। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া ঐ ছবিখানি সম্মুখে স্থাপন করিতে বলিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি গুরুদেবের কনিষ্ঠ পৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে স্মরণ করিলেন এবং স্বীয় গুরুদেবের পাদুকা ধৌত চরণামৃত আনিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। চরণামৃত আসিলে তিনি পরম শ্রদ্ধায় গুরুপৌত্র ও অন্যান্য প্রিয়জনের হাত হইতে তাহা পান করিলেন এবং তাঁহার আরাধ্যদেবতার ছবিখানি পরম ভক্তিভরে বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন। গুরুচরণে যুক্তকর স্থাপন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন এবং অনতিকালমধ্যেই একটি গুরুপদাশ্রিত প্রাণ গুরুপাদপদ্মে মিশিয়া গেল।

* * * *

যোগিরাজ চলিয়া গিয়াছেন অমৃতময় জ্যোতির্লোকে। কিন্তু তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন ও মুক্তিপথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন দিনই গৃহী মানুষ ভুলিবে না। তাঁহার প্রদর্শিত পথে আজও লক্ষ লক্ষ মানব নিভৃতে আপন গৃহকোণে সাধনা করিয়া মুক্তি পথের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন। আজও বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব তথা সমগ্র প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার অগণিত ভক্ত বর্ত্তমান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুবিদিত।

যোগিরাজের জীবনের বহু ঘটনার মত তাঁহার সাধন জীবনও জনসাধারণের অজ্ঞাত। তাঁহার অধিকাংশ সাধনাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। সাধারণ মানবদের সাধনা নিজের মুক্তির জন্য, কিন্তু এই ধরণের মহান্ পুরুষদের সাধনা ব্যষ্টি মুক্তি ও আদর্শ স্থাপনার জন্য। সাধনা হিসাবে দুইই এক, তবে উদ্দেশ্য পৃথক্।

তিনি বহু সাধনার ভিতর দিয়া সেই 'একের' দিকে অগ্রসর হন নাই, বরং একত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বহু সাধনার প্রতি প্রবাহিত হন। অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে কোন দেব-দেবী সাধনা না করিয়া মূল আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে সাধনা করিয়াছেন তাহাতে আপনা হইতেই তাঁহার সকল দেব-দেবীর দর্শন হইয়াছে। তাঁহার ইষ্ট ছিল আত্মময়, সর্ব্বভাবময়। সকল দেব-দেবীর ভিতর যিনি তিনিই তাঁহার ইষ্ট। তিনি ঈশ্বরকে মাতা পিতা সখা রূপে বা ভাবে দেখেন নাই। আত্মাকে আত্মারূপে বা স্বরূপে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"দিন থাকিলেই যেমন রাত্র থাকে, সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকে, তেমনি ইষ্ট থাকিলেই অনিষ্ট থাকে। প্রাণের সেবা কর, প্রাণের সেবা করিলেই ইষ্ট, সেবা না করিলেই অনিষ্ট। প্রাণকর্ম্ম করিলেই প্রাণের সেবা করা হয়। প্রাণের চঞ্চলতাই অনিষ্ট, স্থিরত্বই ইষ্ট।"

আত্মদর্শনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানব জীবন ধারণ করিয়া আত্মদর্শনই যদি না হইল তাহা হইলে মানব জীবন বৃথা। এই ছিল তাঁহার জীবন দর্শনের মূল কথা। তিনি বলিতেন—কত ভাল খাইলাম, কত ভাল থাকিলাম অর্থাৎ জাগতিক সুখ ভোগ কতখানি করিলাম ইহা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিতেন নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াই বা কি হইবে অথবা ধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়াই বা কি হইবে যদি না আত্মদর্শন হইল? তিনি বলিতেন জগতের উপকার করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? জগতের স্থায়ী উপকার কতটুকু করিতে পার? যাহা পার তাহা অস্থায়ী। আত্মানুসন্ধানের পথ দেখানই স্থায়ী উপকার। তাহা হইলে জীবের জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ ঘুচিয়া যায়, ভবরোগ চলিয়া যায়। জন্ম গ্রহণ না করিলে আর দুঃখ কোথায়? তাই তিনি অধিক কর্ম্মের ভিতর জড়িয়ে পড়িতে বারবার নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে মন সদা সর্ব্বদা আত্মধ্যানে তন্ময় থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সেই মন যদি সব সময় পরোপকার অথবা স্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মনের অপচয় হইতেছে, চাঞ্চল্য

বাড়িতেছে। যাঁহারা পরোপকার করেন তাঁহারা ভাল লোক ঠিকই, কিন্তু তাহাতে আত্মলাভ হয় না। ঐগুলি সাধনপথের বহিরঙ্গ মাত্র। আত্মলাভ যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া থাক তাহা হইলে সর্ব্বদা প্রাণের সেবা কর অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম কর, আত্মধ্যানে তন্ময় হইয়া থাক। প্রাণকর্ম্মে শৈথিল্য এবং প্রচেষ্টার অভাব থাকিলে সেই মূল্যবান মহারত্ন পাইবে না। এর জন্য চাই বিবেক-বৈরাগ্য ও দৃঢ়তা। তাই বলিয়া তিনি কখনও উৎকট বৈরাগ্যকে প্রশ্রয় দিতেন না। বলিতেন উৎকট বৈরাগ্য হঠকারিতার সমান। তিনি ভাষণ দিতে একেবারে নিষেধ করেন নাই, বলিতেন আগে নিজে আত্মসাক্ষাৎকার কর, স্থায়ী স্থিতিলাভ কর তারপর ভাষণ দাও বা অন্য কিছু কর। সাধন বিহীন ব্যক্তির দশ-বিশটা বই পড়িয়া পণ্ডিত সাজিয়া ধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়া বেড়ানকে তিনি একেবারে অপছন্দ করিতেন।

তিনি ছিলেন স্বভাব যোগী ও নির্ভেজাল যোগী। তাই তাঁহার কথা সকলের মনে ছোঁয়াচ লাগাত, আলোড়ন তুলিত। ধর্ম্ম নিয়া, ঈশ্বর সাধনা নিয়া কপটতা, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, ছলচাতুরি, গোঁড়ামি এ সবের প্রতি তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। এ সবকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। তাই তিনি সকলকে বলিতেন—চালাকির দ্বারায় দুনিয়ার সবকিছু পেতে পার, কিন্তু আত্মলাভ হয় না।

ভারতাকাশে তাঁহার আবির্ভাব মানুষের মনে তীব্র দীপ্তি ছড়াইয়া চমক লাগাইয়াছিল। তাই ভারতের মানুষ তাঁহাদের দুরন্ত ঈশ্বর পিপাসাকে পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া নিলেন। তিনি ছিলেন সত্যের খাঁটি উপাসক। তাই তিনি খাঁটি ভারতীয় যোগী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভেদাভেদ ছিল না। তিনি বলিতেন—সকল মানুষই একই ঈশ্বরের সন্তান, সকল মানুষই তাঁহার সাধনা করিতে পারে, সকল মানুষই এই যোগসাধনার অধিকারী। তাই তিনি ধরিত্রীর সকল পাপীকে অভয় দিয়া বলিলেন—কেহ পাপী নয়, কেহ পুণ্যাত্মাও নয়। কূটস্থে মন রাখিলে পাপ নাই, মন না রাখিলেই পাপ। এই ধরণের নিঃসঙ্কোচ কথা তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সকল ধর্ম্মের সাম্যের যোগী হইতে পারিয়াছিলেন। শুধু কথার কথা নহে—তিনি নিজে সাধনা করিয়া তাহা দেখাইলেন। তিনি হিন্দুর সকল দেব-দেবীকে দেখিলেন, খোদা আল্লা তাহাও দেখিলেন। এবং আরও অগ্রসর

হইয়া জানাইয়া গেলেন প্রকৃত ঈশ্বর কি, প্রকৃত খোদা বা আল্লা কি। এমন কথা কয়জন যোগী বলিতে পারিয়াছেন? তাই তাঁহার অমৃতময় বাণী সকল মানব হৃদয়ে ঈশ্বর সাধনার প্রতি অটুট অনড় বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে।

যোগিরাজ বলিতেন মানব সমাজে প্রচলিত সংস্কারগুলির পরিবর্ত্তন ঘটান উচিত। অনেকক্ষেত্রে ঐগুলি কুসংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলিকেই একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া তাহার ভিতর হইতে সাধনলব্ধ প্রকৃত গূঢ় তত্ত্ব সকল উদ্ধার করিতে হইবে। তিনি কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু বহু পুরাতন শাস্ত্র গ্রন্থগুলির গূঢ় সাধন তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যাহা সাধকদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা করিয়া তাহার কয়েক শত পুস্তক ছাপাইয়া ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি ধর্ম্মের গোঁড়ামি সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া ইহার সংস্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি ভারতভূমিতে ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া সকলকে প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং গৃহী জীবনের সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়গুলি প্রথমে নিজ জীবনে আচরণ করিয়া পরে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নূতন জগতের সন্ধান দিয়াছেন। প্রাচীন যোগশাস্ত্রগুলি এবং উচ্চ আদর্শগুলি কিভাবে সহজে জীবনে অনুসরণ করা যায় তাহা তিনি শিখাইয়াছেন। সংসারের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও কিরূপে অধ্যাত্ম জগতের উচ্চ আদর্শে মানুষ তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে পারা যায় তাঁহার জীবনই একটি জীবন্ত প্রমাণ। ভোগ লালসায় মত্ত অন্ধ মানবের সম্মুখে তিনি যে নূতন সাত্ত্বিক পথ দেখাইয়াছেন তাহা গৃহী নরনারী কোন দিনই ভুলিবে না। বর্ত্তমানে মানব সমাজে ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অবগত হইবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানের এই প্রচার সর্ব্বস্ব সময়ে, এই মহান্ অধ্যাত্মশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। পুরী, কাশী, হরিদ্বার, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাঁচী, মান্দার, ফয়জাবাদের মালিপুর, ঝাড়গ্রাম, দেওঘর, হাওড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁহার সমাধি ও স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার ভক্তগণ আজও সেই সব স্থানে নিত্য পূজা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পূত স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশে তাঁহার বাণী প্রচারিত হইতেছে।

কেবল হিন্দু বলিয়া যোগিরাজকে বিচার করিলে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। তিনি ছিলেন মানব ধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি বলিতেন এই অমর যোগসাধন করিতে হইলে চাই একটি মনুষ্য শরীর আর করিবার মত সদিচ্ছা। ইহা যাহার আছে সে অনায়াসেই এই সাধন করিতে পারে। যে ধর্ম্মেরই অন্তর্গত হোন না কেন, সকল ধর্ম্মের মানুষের মধ্যে যে সেই শাশ্বত আত্মা বিরাজমান, বেদ উপনিষদ্ গীতার সেই মহান বাণী পুনর্ঘোষণা করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাই দেখা যায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের ও বর্ণের মানুষ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেইজন্য আজকের এই হানাহানির দিনে একমাত্র তাঁহার আদর্শই মানুষের অবলম্বন।

এই জড়বাদের যুগে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞানের এক উচ্চ ও জীবন্ত আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছেন। বিষয়-বৈভব ছাড়াও মানুষের এক চরম ও পরম কামনার জিনিস আছে, সেই আত্মমুক্তিই যে মানুষের কাম্য এবং সংসারী মানুষ কেমন করিয়া সেই শাশ্বত অব্যয় পদ পাইতে পারে, এই চিরন্তন সত্যের দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাই ত তিনি **'গৃহীর ভগবান্।'**

অনেক বড় বড় আদর্শ আছে যাহা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় তেজস্বী মানুষ তাঁহাদের জীবনে কাজে লাগাইতে পারেন। ঐ আদর্শগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী নহে। আমরা বরং সেই আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলি যাহা সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের জীবনে রূপায়িত করিতে পারেন। শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তেমন আদর্শের কথাই বলিয়াছেন। তিনি শুধু তেমন আদর্শের কথা সকলকে বলিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, নিজ জীবনে পরিপূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন সঠিক কর্ম্মের মাধ্যমেই আপন আপন জীবন গঠন করিতে হইবে। পৃথিবী কর্ম্মের স্থল, কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই। সংসারে থাকিতে হইলে কোন কিছুই ত্যাগ করা যায় না। সংসারকে ত্যাগ করা উচিতও নহে। কারণ এইখানেই ত সকলের জন্ম হয় এবং বাঁচিয়া থাকে। অতএব সবকিছুর মাঝে থাকিয়া, কোন কিছু পরিত্যাগ না করিয়া সঠিক কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে ধীরে ধীরে জীবনকে গঠন করিয়া জীবনের যাহা চরম ও পরম

কাম্য তাহা লাভ করা যায় তাহার নির্দ্দিষ্ট, সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত পথ তিনি সকলকে দেখাইয়া গিয়াছেন ; যাহা আজ প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন।

যোগীর দেশ ভারতবর্ষ। সনাতন ধর্ম্মের মেরুদণ্ডই হইল যোগ। যোগ ব্যতিরেকে সনাতন ধর্ম্মকে জানা যায় না এবং সনাতন ধর্ম্মকে না জানিলে অধ্যাত্ম-ভারতকে জানা যায় না। তাই অধ্যাত্ম-ভারতকে জানিতে হইলে প্রথমে ভারতের যোগিদের জানিতে হইবে এবং যোগিদের জানিতে হইলে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে হইবে। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনের মাধ্যমে সকল মানবকে উপদেশ দিলেন যোগী হইবার জন্য। তিনি শুনাইলেন তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী সকলের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সেই সনাতন ভারতবর্ষের মানুষ যদি ভারতীয় যোগিদের না জানে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জন্মসূত্রে ভারতীয় হইলেও তাঁহাকে প্রকৃত ভারতীয় বলা যায় না। অই যোগ ছাড়া ভারত নাই, ভারত ছাড়া যোগ নাই।

প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব ভাবধারা আছে, উহাতে জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। ভারতবর্ষের ভাবধারা অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যা। ঋষি সেবিত ও প্রদর্শিত সেই আত্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যা আপাততঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও ভারতবাসীর ধমনীতে ফল্গুধারার মত চির প্রবহমাণ। সেই লুপ্তপ্রায় আত্মবিদ্যা কেবলমাত্র সীমিত যোগবিদদের অধিগম্য ছিল। যোগিরাজ জানিতেন এই আত্মবিদ্যারূপ মহান্ ও অমর যোগসাধন ছাড়া ভারতবাসীর জীবন পূর্ণ হইবে না। তাই তিনি এই জাতীয়-সম্পদকে গিরি-গুহা হইতে প্রকাশ্যে আনয়ন করিয়া জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। পূর্ব্বে এই আত্মবিদ্যা পাইবার আশায় অনেক মানুষকেই ঘর সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিরি কন্দরে সাধু-মহাত্মাদের পিছনে ছুটিতে হইত। সংসারী মানুষ, সমস্যায় জর্জরিত যাহাদের জীবন, তাহাদের মাঝে তিনিই প্রথম সেই ঋষি সেবিত আত্মতত্ত্বরূপ অমর যোগসাধনকে পৌঁছাইয়া দিয়া জাতির জীবনে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহারই দৌলতে আজ এই বিদ্যা সুলভ হইয়াছে। ভারতবাসী তাঁহারই মাধ্যমে আবার সেই ঋষি প্রদর্শিত পথকে ফিরিয়া পাইয়া ধন্য হইয়াছে। তিনি যে আধ্যাত্মিক দীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন তাহা আজ লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয়ে দীপ্যমান। অর্জ্জুনরূপী

এই মহান্ গৃহিযোগী কৃষ্ণরূপী বাবাজী মহারাজের প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ চিরদিন ত্রিতাপ দগ্ধ সংসারী জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। এই প্রয়োজনে সময়ে সময়ে নির্জ্জন সাধনকন্দর হইতে লোকালয়ে আসিয়া বদ্ধজীবকে মুক্তির পথ দেখান। প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাঁহারা সাধনার যথার্থ রূপরেখা নিরূপণ ও পথ প্রদর্শন করিবার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া সংসারীদের সঙ্গে মিশিয়া যান, ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, চিন্ময় আত্মসত্তা একদা শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সহযোগিরূপে হিমালয়ের নির্জ্জন গুহাগৃহে সমাধিমগ্ন ছিলেন; তিনিই লোক কল্যাণের জন্য ও লোক স্থিতি রক্ষার জন্য পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিয়া শ্যামাচরণরূপী দেহধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন। নবীন উদ্যমে বদ্ধ জীবকে জীবন্মুক্তির নিশ্চিত পথপ্রদর্শনের জন্য কালচক্রের আবর্ত্তনে ও যোগোক্ত নির্ভুল পথে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটে এবং তাঁহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অধ্যাত্ম পুনর্জ্জাগরণ ঘটে। সেই অতি মানব সাধারণ মানুষের বেশধারণ করিয়া সাধারণের মত জীবনযাপন করিয়া ভ্রান্ত মানবদের আবার একবার অমৃতত্বলাভের রাজপথ দেখাইয়া দেন। যখনই যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি দেখা যায় তখনই সেইখানে সেই সব মহাত্মার আবির্ভাব ঘটে এবং রাজপথ হইতে বাধা অপসারণ করেন। তিনি তাঁহার পদাঙ্কানুসারীদের আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন—"**জিসকা বোঝ বহ খুদ উতার লেগা। জো ভগবান কো হামেসা ধ্যান করে্ উসকো কাম উহ করতা হ্যায়।**"

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

পরিশিষ্ট (ক)

যোগিরাজের জন্মপত্রিকা
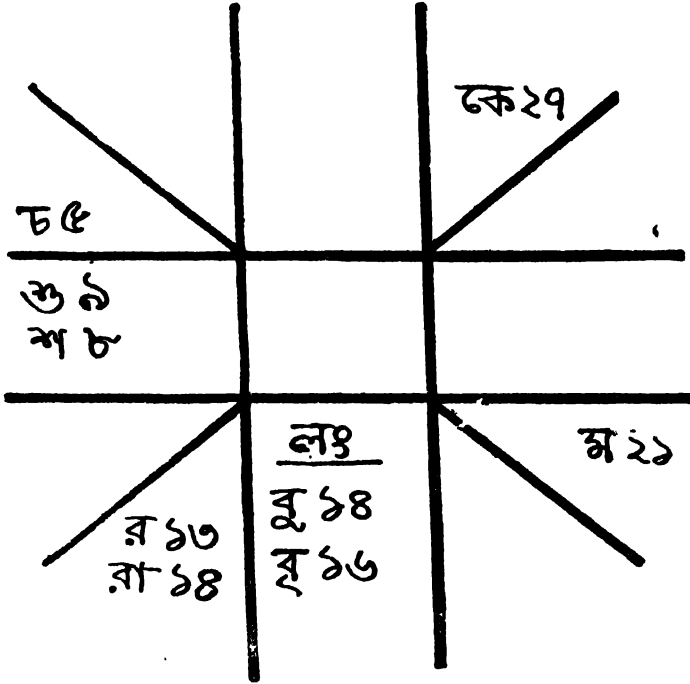
সৃষ্টির আদিযুগ থেকে শুরু করে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে একটা অদৃশ্যশক্তির লীলা আশ্চর্য্য নীরবতায় বাঙ্ময়। এই অদৃশ্য শক্তির নাম ধর্ম্মশক্তি, ধর্ম্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান বা বিরাট ঈশ্বরকে মানুষের ছোট্ট আঙিনায় নামিয়ে আনার প্রয়াস। তাই বোধহয় ভারতক্ষেত্রের অপর নাম ধর্ম্মক্ষেত্র। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চূড়ান্ত আশ্বাস—'সম্ভবামি যুগে যুগে'—তাই বোধহয় রূপ-পরিগ্রহ করে ভারতের আকাশে-বাতাসে রেণুতে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, ইতিহাস তার সাক্ষী।

ঠিক এমনি একজন মহামানব আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলার কৃষ্ণনগরের পাশে ঘুরণী গ্রামে ১২৩৫ বঙ্গাব্দের ১৬ই আশ্বিন (মঙ্গলবার) অপরপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের ঔরসে—মাতা

মুক্তকেশী দেবীর গর্ভে। আবার যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো শাশ্বত গীতার বাণী—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥

এই যোগসাধনার মন্ত্রেই দীক্ষিত হয়েছিলেন শ্যামাচরণ। এই সাধনার বেদীমূলেই উৎসর্গীকৃত হয়েছিল তাঁর তনু মন প্রাণ সব। তিনি হয়ে উঠেছিলেন যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী। জ্যোতিষশাস্ত্র বিচারেও তাঁর অধ্যাত্মজীবন ও জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপতার প্রকাশ দেখা যায়।

এই লোকোত্তর মহাপুরুষের রাশিচক্রের যথার্থ জ্যোতিষ বিচার (Astrological interpretation) আমার কাজ নয়। তাঁরই কৃপায় যা আসে, যেটুকু আসে সাহসে ভর করে লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের লগ্ন তুলা (Libra), রাশি মিথুন (Gemini), নক্ষত্র মৃগশিরা। এই মৃগশিরার ধর্ম্ম অন্বেষণ করা, খোঁজা। জাতক কাকে যেন খোঁজে, কাকে যেন চায়, কি যেন অন্বেষণ করে। আর মিথুনের আনন্দ তার সৃজনশীলতা ও প্রকাশধর্মিতার মধ্যে। একটা ভাব, একটা abstract idea সে অত্যন্ত concrete ভাবে প্রকাশ করতে চায়। Alan Leo-র ভাষায়—"Gemini, the synthesiser, manifests the combination of the two-adaptability and intellect......... So Gemini produces enthusiastic, impressionable, sympathetic and versatile men and women........ The Dharma of Gemini is Motive." একবার সে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে, আবার গুটিয়ে নিজের মধ্যেই ফিরে আসছে। পুরুষের সৃষ্টিশক্তি ও নারীর আধারশক্তির প্রকাশ এক সঙ্গেই সে নিরন্তর করে চলেছে। নিজের চারপাশের খুঁটিনাটির সম্বন্ধেও সে অতি সতর্ক। সদাজাগ্রত বিচারশক্তি, অনুভবক্ষমতা, মননশীলতা, ধ্যানধারণা ও সর্ব্বোপরি মানসিক ইচ্ছাশক্তির প্রতীক সে।

লগ্নটি হোলো তুলা। যার গতি বায়ুর গতির কথা স্মরণ করায়, যা কালের ক্ষণবিন্দুর মধ্যেও অনন্তগামী। তার মধ্যে আবার শীতলতা আছে, কমনীয়তা আছে, পেলবতা আছে, আর আছে যুক্তিবাদ (rationalism)। সব সময়ে যুক্তির নিকষে যাচাই করে যার যাত্রা হয় শুরু। লগ্নাধিপ গ্রহটি কিন্তু শুক্র—সঞ্জীবনী মন্ত্রের উদ্‌গাতা,—যার সংস্পর্শে অচেতন জড়ও পায় প্রাণ।

কঠিন কঠোর শাস্ত্রজ্ঞানকে এবং দুর্লভ অনুভূতিকে বাস্তবানুগ সহজ সরল প্রয়োগকুশলতায় ফুটিয়ে তুলতে যিনি সক্ষম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বস্তুর উপর যিনি সচেতন, বিশ্বস্ত এবং সস্পৃহ'ও বটে, সেই ভার্গবের প্রভাবেই যোগিরাজ ছিলেন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ, চাকুরিজীবী, পূর্ণ-কাম। নবমস্থ তথা ভাগ্যস্থ চন্দ্রের উপর লগ্নস্থ বৃহস্পতির নবমদৃষ্টি তাঁকে করে তুলেছে সংসারী অথচ সন্ন্যাসী, সকাম অথচ নিষ্কাম, ভোগী অথচ ত্যাগী, পার্থিব অথচ অপার্থিব আনন্দের অধিকারী। লগ্নের চতুর্থ পঞ্চমাধিপতি শনৈশ্চর হলেন সর্ব্বপ্রধান গ্রহ, যা আবার জলরাশি কর্কটে অবস্থিত এবং লগ্নাধিপতি শুক্রযুক্ত। শনি মৃত্যুকারক, দুঃখবাদী, কঠোর তপোব্রতী (symbol of austerity) 'তপসা-দগ্ধদেহায়'। তীব্রতম একাগ্রতা, পবিত্রতা, সততা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান (wisdom), মেধা, আত্মারাম অবস্থা, নিয়মশৃঙ্খলা (strictest discipline), সবই শনির দান। শনির কৃপা ছাড়া রাঙাচরণ দর্শন অসম্ভব। এ হেন শনিমহারাজ শুক্রযুক্ত হয়ে দশমস্থানে (কেন্দ্রে) চন্দ্রের ঘরে অবস্থিত হয়ে স্বঘরে চতুর্থস্থানে তথা মকরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। তাঁর আর দুটি দৃষ্টি পড়ছে কন্যায় ও মেষে, যথাক্রমে লগ্নের দ্বাদশে ও সপ্তমে (কেন্দ্রে) এবং উক্ত দশমপতিটিও আবার নবমে বুধের ঘরে (কোনে) অবস্থিত। উক্ত বুধ আবার লগ্নে (কেন্দ্রে) বৃহস্পতিযুক্ত অবস্থায় শুক্রের ঘরে। কেন্দ্র ও কোনের এই যোগাযোগের নামই রাজযোগ। শুক্র ও শনির অবস্থান এবং তৎসঙ্গে বৃহস্পতি, বুধ ও চন্দ্রের সম্বন্ধসূত্রই বা যোগই জাতককে যোগসাধনার ক্ষেত্রে উত্তুঙ্গশিখরে সিংহাসন দান করেছে এবং সেই সিংহাসন দৃঢ়ীকৃতও করে দিয়েছে। শুক্র কাম, শনিও কাম, তাই তিনি আজীবন নেশার বস্তুই খুঁজেছেন; সুখ তিনিও চেয়েছেন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শের নাগালের বাইরে, উর্দ্ধে যে একটা অমর্ত্যলোক আছে, যেই আনন্দলোকে ভক্ত-ভগবানের নিরন্তর মিলন হয় মানসে, সেই আনন্দঘন দিব্যলোকে তাই শ্যামাচরণ নিরন্তর সন্তরণশীল।

শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী
১৫৩, মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ)
কলিকাতা-৭০০০৩৬

অন্যান্য বই

১। শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ ও অদ্বৈতবাদ—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। যোগিরাজ শ্যামাচরণ গ্রন্থাবলী, পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৩। প্রাণময়ং জগৎ—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪। সত্যলোকে সত্যচরণ—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্থান

১ মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—৭৩

২ সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮, বিধান সরনী, কলি—৬

৩ নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

৪ দে বুক ষ্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি—৭৩

৫ গ্লোব লাইব্রেরী, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—৭৩

৬ জয়গুরু পুস্তকালয়, ১২/১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি—৭৩

৭। বিশ্বাস বুক ষ্টল, ৪৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি—৯

৮। সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া রেল ষ্টেশন,

৯। শ্যামাচরণ প্রকাশনী, ৬৫/৬, কলেজ স্ট্রীট, কলি—৭৩

ও অন্যান্য বইয়ের দোকান,